তোমার পড়ার কোন ক্ষতি হবে না। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

নরেশ বলিল, কি কথা, বল ?

ধীরেন বলিল, তুমি কলেজ ছাড়বে না কেন ?

নরেশ বলিল, দেশের স্বাধীনতা আনতে হলে সবাইকে লেখা পড়া ছাড়তে হবে, তার কোন মানে নেই। এ-সবে আমি বিশ্বাস করি না।

ধীরেন চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর কহিল, তর্ক করে তোমাতে আমাতে এর কোন মীমাংসা করতে পারবো না। বেশ, চলো কাল্‌কে যাই, গিয়ে এর মীমাংসা করে আসি। যদি তুমি জেতো, আমি তোমার সঙ্গে আছি, কিন্তু যদি হারো, মনে থাকে, কলেজ ছাড়তে হবে।

নরেশ একটু হাসিয়া বলিল, বেশ, তা হবে। কিন্তু কোথায় মীমাংসা করতে যেতে হবে শুনি ?

বিদেশ হইতে একজন নেতা আসিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আছেন। তাঁহার নাম দেশজোড়া। ধীরেন তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া কহিল, তাঁর কাছ থেকেই আমি আসছি। তুমিও কাল চলো।

নরেশ একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা যাবো। কখন যাবে ?

ধীরেন বলিল, কেন, সকালেই যাবো।

পরদিন উক্ত দেশনেতার নিকট হইতে ফিরিবার পথে ধীরেন বলিল, কেমন, তোমার সন্দেহ মিটলো ত' ?

নরেশ বলিল, না।

ধীরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, না মানে?

নরেশ বলিল, না মানে না। ব্যক্তি মহৎ, সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্যও মহৎ। তর্কেও হেরেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস ভাঙ্গে নি।

ধীরেন বলিল, অর্থাৎ, তুমি আজ কলেজে যাচ্ছো?

নরেশ বলিল, হ্যাঁ।

পরদিন নরেশ আবার নেতাটির সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তৎপরদিনও করিল। তারপর সে কলেজ পরিত্যাগ করিল।

দিন সাতেক বসিয়া থাকার পর নরেশ একদিন বলিল, এমনি হুজুগে মেতে থাকবার জন্যেই কি কলেজ ছেড়েছো, ধীরেন?

কোনটা হুজুগ, ধীরেন ঠিক বুঝিতে পারিল না। কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভীড় বাড়ানো, সভা-সমিতিতে কাজ করা, চাঁদার বাক্স লইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, ইত্যাদি সবটাকেই সে দেশ-সেবার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ইহারই উত্তেজনায় সে অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। নরেশের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তবে কি করতে চাও?

নরেশ এ-বিষয়ে ভাবিয়াছে, বলিল, এসব অকাজের কাজ করার জন্যে লেখা পড়া ছাড়িনি। যদি কোন কাজ না থাকে, তবে আবার কলেজে ঢোকা ভাল। এ-সব কি কাজ? এতে কি উপকার হবে?

ধীরেন অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, বেশ ত' নরেশ, কোনটা কাজ বল' না? চলো, সেই কাজই করি!

নরেশ বলিল, তবে চলো গ্রামে যাই। মিটিংএ ভোলান্-টিয়ারি করার চেয়ে সেখানে ভোলানটিয়ারি করলে ঢের কাজ হবে। অন্ততঃ আমাদেরও দেশ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হবে। তাই চল' না?

ধীরেনের আপত্তি ছিল না; কিন্তু বাধা অনেক। কে তাহাদের টাকা দিবে, কোন প্রণালীতে কোনখানে কাজ আরম্ভ করিবে, সঙ্গে আরও লোক দরকার হইবে কিনা ইত্যাদি অনেক ভাবিবার আছে।

নরেশ বলিল, আমি ইতিমধ্যে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছি, আবার কাল যাবো। এবার যারা প্রচার কর্ত্তে গ্রামে যাবে, আমরা তাদের সঙ্গে যাবো। তারপর, দেখি, সেখানে কতদূর কি হয়।

সহরের অপরিসীম উত্তেজনা ছাড়িয়া কোন অজ্ঞাত গ্রামে যাইতে ধীরেনের তত মন সরিল না। কিন্তু বিশেষ আপত্তি করিল না, বলিল, বেশ, আফিসে ব'লে ক'য়ে যদি বন্দোবস্ত করতে পারো, চলো যাই।

গ্রামে যাইয়া কাজ করিবার লোকের একান্তই অভাব। সুতরাং নরেশ ও ধীরেনের প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না। স্থির হইল আগামী সপ্তাহেই ইহারা যাত্রা করিবে। সঙ্গে অন্য লোকও থাকিবে।

নরেশ বলিল, একবার বাড়ীতে দেখা দিয়ে আসবে না, ধীরেন ?

ধীরেন শুষ্কমুখে বলিল, না ভাই, তা হয় না।

কেন হয় না, নরেশ তাহা জানিত। ধীরেনের পিতা এক জন বড় জমিদার। মফঃস্বলের কোন সহরে থাকেন। নরেশের পিতাও সেইখানেই থাকিয়া চাকুরী করেন। উভয় পরিবারে আলাপ পরিচয়ও আছে। ছেলেবেলা হইতেই সে ধীরেনের পিতাকে চেনে। তাঁহার মত রাগী লোক সে আজ অবধি খুব কমই দেখিয়াছে। প্রতাপও তাঁহার কম নয়। রাজসরকারেও খাতির যথেষ্ট।

ধীরেনের কলেজ ত্যাগের সঙ্কল্প শুনিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, সে যেন সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-ত্যাগের জন্যও প্রস্তুত হয়। ওই একটি আদেশ। কিন্তু ইহার গুরুত্ব কত বেশী, নরেশ ধীরেন উভয়েই জানিত। তারপর ধীরেন পিতাকে না জানাইয়াই কলেজ ছাড়িয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লিখাইয়াছে, সভায় বক্তৃতাও করিয়াছে। এখন অম্বিকা বাবু একবার পুত্রকে পাইলে কি যে করিবেন, তাড়াইয়া দিবেন কি বাঁধিয়া রাখিবেন, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

এই কারণেই নরেশ ইতিপূর্ব্বে বহুবার ধীরেনকে সতর্ক করিয়াছে, কিন্তু সে শুনে নাই। আজও বলিল, ধীরেন, আমার মনে হয় তোমার একবার বাড়ী যাওয়া উচিত। বুঝিয়ে কিছু করতে না পারো, বেশ, বাড়ীতে ব'সে থাকো। চলো, আমিও

বাড়ীতে ব'সে থাকি। আমাদের দুজনের সেবা না পেলেও দেশের সদ্গতির অভাব হবে না।

ধীরেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, না নরেশ, আমি প্রস্তুত হয়েই এ-কাজে নেমেছি। আর বাড়ী ফিরবো না। একবার গেলে আর আসতে পারবো না। কিন্তু আমার আসা চাই-ই।

নরেশ চুপ করিয়া রহিল। ধীরেন পুনরায় কহিল, তুমি কি বাড়ী যাবে?

নরেশ বলিল, হ্যাঁ, একবার যেতে হবে। সঙ্গে কিছু টাকা-কড়ি নেওয়া আবশ্যক নয় কি? ওরা ত' বেশী টাকা দেবে না! তা ছাড়া একবার ব'লে আসাও দরকার। কিন্তু তুমি কি কোন রকমে যেতে পারো না, ধীরেন?

ধীরেন বলিল, না।

তিনদিন পরে নরেশ পিতার নিকট চলিয়া গেল। স্থির রহিল, ধীরেন এখান হইতেই গ্রামে যাইবে, নরেশ বাড়ী হইয়া যাইবে।

ধীরেন নরেশকে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। নরেশ বলিল, তোমার বাবাকে কিছু বলবো, ধীরেন?

ধীরেন অন্য একদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, না।

২

নরেশের পিতা সরকারী ব্যাঙ্কের একজন বড় কর্ম্মচারী। সরকার হইতে বড় বাড়ী পাইয়াছেন এবং বেশ মোটা মাহিনাও পান। সংসারে বেশী লোক নাই, ছেলে, মেয়ে ও দূর-সম্পর্কের একটি বোন। স্ত্রী বহুদিন হইল স্বর্গগত হইয়াছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া এম্‌-এ পড়ে। মেয়েটি স্থানীয় স্কুল হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া উপস্থিত কোন এক নারীমন্দির প্রতিষ্ঠানে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছে। ইচ্ছা আছে কলিকাতায় যাইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইবে, কিন্তু পিতাকে একা ফেলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আজও সেটা হইয়া উঠে নাই।

নরেশ এইবার এম্‌-এ পাশ করিলে তাহার বিবাহ দিয়া ঘরে লক্ষ্মী বাঁধিবেন, পিতার এইরূপ মনোভাব ছিল। নরেশ ভাল করিয়াই পাশ করিবে, ইহাতে তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি শুধু দিন গণিতেছিলেন।

যেদিন নরেশের পত্র পাইলেন সে কলেজ ছাড়িয়াছে, সেদিন তাঁহার বড় সাধে বাদ পড়িল। কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে বেলা, তোর দাদা কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, আর পড়বে না।

বেলা বিস্মিত হইয়া বলিল, কে ব'লেছে, বাবা?

সুশীলবাবু বলিলেন, এই যে চিঠি লিখেছে।

বেলা চিঠিটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পিতার মনোভাব তাহার অবিদিত ছিল না। তাঁহার মনের দুঃখও তাহার অজ্ঞাত রহিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, এ হুজুগ বেশীদিন থাকবে না, বাবা। দেখো দু'দিনেই আবার সকলে সুড়সুড় ক'রে কলেজে ঢুকবে। দাদাকে আসতে লিখে দাও না?

সুশীলবাবু বলিলেন, লিখতে হবে না আপনিই আসবে। কি করবে শুধু শুধু সেখানে ব'সে থেকে?

বেলা বলিল, আমি কিন্তু এবার কলেজে ভর্ত্তি হবো, বাবা!

সুশীলবাবু তাহার পিঠে হাত দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, বেশ ত' মা, যখন ইচ্ছে হ'য়ো।

নরেশের সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। তাহার কলেজ ত্যাগ করার বিরুদ্ধে কাহাকেও কিছু তিনি বলিলেন না। এমন কি পুত্রকেও যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে আদেশ উপদেশের বাষ্পও রহিল না।

কিন্তু গোলমালের সৃষ্টি হইল আর একজনকে লইয়া। তিনি স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। এই কলেজ হইতেই নরেশ

বি-এ পাশ করে। লোক-মুখে শুনিয়া এবং খোঁজ লইয়া যখন স্থির জানিলেন নরেশ কলেজ ছাড়িয়াছে তখন একদিন তিনি সুশীলবাবুর কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

ছুটিয়া আসিবার কারণ ছিল। কলেজে পড়িবার সময় নরেশকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং সে ভালবাসা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যাতায়াতের মধ্য দিয়া নরেশ এক সময়ে তাঁহার বাড়ীর ছেলের মত হইয়া গিয়াছিল। এই ভিত্তিহীন সম্পর্কটাকে পাকা করিয়া লইবার কল্পনা অনেকদিন হইতে তাঁহার ও তাঁহার বাড়ীর সকলের মনে স্থায়ী হইয়া আছে। তাঁহার মেয়েও কোন অংশে নরেশের অযোগ্য নয়। কথাবার্তাও এক প্রকার পাকা। এরূপ অবস্থায় নরেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি বড় কম বিচলিত হইলেন না।

সুশীলবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, নরেশ নাকি লেখা-পড়া ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?

সুশীলবাবু তাঁহার উষ্মাপ্রকাশে একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে কেন?

মহেশবাবু লজ্জা পাইয়া কহিলেন, না, তা' বলছি না। শুনলুম, ও নাকি কলেজ ছেড়েছে?

সুশীলবাবু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন সংবাদটা সত্য।

মহেশবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি নরেশকে কিছু বলেন নি?

সুশীলবাবু বলিলেন, কি আর বলবো ?

মহেশবাবু বলিলেন, কিন্তু এবার ওর ফার্ষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল, সেটা ও ভেবে দেখেছে কি ?

সুশীলবাবু বলিলেন, সে কথা আমি কি ক'রে বলবো, মহেশ-বাবু ? তবে আমার বোধ হয় নরেশ ভেবে-চিন্তেই এ-কাজ করেছে।

মহেশবাবু বলিলেন, ভেবে-চিন্তে ? ভেবে-চিন্তে এক পাগল ছাড়া কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে ?

সুশীলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মহেশবাবু পুনরায় বলিলেন, না, সুশীলবাবু, আমি নরেশকে চিনি। আপনার আদেশ ও কোনদিন অমান্য করতে পারে না। আপনি ভাল করে বুঝিয়ে লিখুন, নয় ত' ওকে আসতে লিখে দিন, আমি নিজে বুঝিয়ে বলবো।

সুশীলবাবু বলিলেন, শীগগীরই ও এসে পড়বে। বোধ হয় কাল-পরশুই আসবে।

অধ্যক্ষ কথাটা এখনকার মত চাপিয়া গেলেন। খানিক পরে মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু তাঁহার মন আশা-ভঙ্গে একেবারে বিরস হইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে অনেক কথাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার রাগ হইল সুশীলবাবুর উপর। কেন, পিতা হইয়া পুত্রকে দু'টো উপদেশ দিতে পারেন না ? তা' হইলেই ত' সব গোল মিটিয়া যায়। ইহাতে এত কুন্ঠিত হইবার কি আছে ? ছেলেমানুষ

হুজুগে পড়িয়া এক কাজ করিয়াছে, তাই বলিয়া পিতা কি তাহাকে সুপথে পরিচালনা করিতে পারিবে না? ক্রমে তিনি একমাত্র নরেশকে লইয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার মত চিন্তাশীল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক খুব কমই দেখা যায়। সে কেন এমন উন্মাদনায় মাতিতে গেল? নরেশকে তিনি কত ভালবাসেন, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি মনে-মনে কত বড় সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, এসকল কোনটাই নরেশের অবিদিত নয়। সব জানিয়া শুনিয়াই একাজ সে করিয়াছে। তাঁহার আশা ও স্নেহের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই সে রাখে না। যদি রাখিত তবে অকস্মাৎ এমন অকাজ করিয়া বসিত না!

ভাবনার মধ্যে তিনি বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলেন.। মুখ তুলিয়াই দেখিলেন, নরেশ দাঁড়াইয়া আছে। বাকী পথটুকু তিন লাফে শেষ করিয়া নিকটে আসিয়া কহিলেন, কোথা থেকে আসছো, নরেশ? ভাল আছো ত'? এসো, ভেতরে এসো।

ভিতরে লইয়া গিয়া বলিলেন, কলকাতা থেকেই আসছো ত'?

নরেশ বলিল, হ্যাঁ, এইমাত্র আসছি। বাড়ী যাচ্ছিলুম, আপনাকে দেখে দাঁড়ালুম।

অধ্যক্ষ বলিলেন, বেশ ক'রেছো। আমিও এই তোমার বাবার কাছ থেকে আসছি।

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

অধ্যক্ষ পুনরায় কহিলেন, তোমার নামে যা' শুনছি, শুনছি

কেন,—তোমার বাবাই ত' বল্‌লেন, সত্যিই কি লেখা-পড়া ছাড়লে, নরেশ ?

নরেশ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, লেখা-পড়া ছাড়ি নি, তবে এ বছরে আর কলেজে যাবো না।

মহেশবাবু বলিলেন,তার মানে এবছরে পরীক্ষা দেবে না ত' ?

নরেশ বলিল, না।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মহেশ বাবু যেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া এরূপ কার্য্যের তিনি একান্ত বিরোধী। ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার অনেক তর্ক-বাণ মজুৎ আছে। কিন্তু নরেশকে তিনি চিনিতেন। ইহার সহিত তিনি তর্ক করিলেন না, শুধু কহিলেন কাজটা কি ভাল করলে, নরেশ ?

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

মহেশবাবু আর একবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে কথা দাও, বেশ করে ভেবে দেখবে, নয় আমার সঙ্গে আলোচনা করবে। তারপর যা উচিত বিবেচনা করো, ক'রো। যদি কলেজ ছাড়া উচিত বিবেচনা করো, ক'রো, বারণ করবো না। কিন্তু বুঝে সুঝে ক'রো।

নরেশ শুধু বলিল, আমি ভেবে-চিন্তেই কলেজ ছেড়েছি।

মহেশবাবু বলিলেন, কেন, ওটা গোলামখানা ব'লে ? ওখানে শিক্ষা হয় না ব'লে ?

নরেশ বলিল, না, সে কারণে নয়।

মহেশবাবু বলিলেন, তবে ?

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে মহেশবাবু পুনরায় কহিলেন, তোমার বাবা যদি বলেন তা' হলেও এবারে তোমার পরীক্ষা দেওয়া হয় না?

নরেশ একটু চকিত হইয়া বলিল, কেন, বাবা কিছু বলেছেন?

মহেশবাবু বলিলেন, না বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু ধর আমিই তাঁর হয়ে বলছি?

নরেশ নীরব হইয়া রহিল।

এ-নীরবতার অর্থ অধ্যক্ষ মর্ম্ম দিয়াই বুঝিলেন। আরও কিছুক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর আর কোন কথা না বলিয়া এক সময়ে উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ একা বসিয়া থাকিবার পর নরেশও উঠিল। সহসা তাহার অন্তর এই ভাবিয়া পীড়িত হইয়া উঠিল, যে একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। এখানকার সম্বন্ধ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইল। আর একটা বিষয়ও তেমনি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এ সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় অধ্যক্ষ যতই দুঃখিত হন্, তাহার দুঃখের তুলনায় সে অতি তুচ্ছ। ইহার মধ্যে এত দুঃখের মাধুর্য্য লুকাইয়া থাকিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে কোনদিন সে এত ভাল করিয়া টের পায় নাই। আজ তাহার মনের মধ্যে নিমেষে যে বিদ্যুৎটি খেলিয়া গেল, তাহার তীব্র আলোকে সেখানকার অন্ধ রন্ধ্রগুলি পর্য্যন্ত তাহার চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সেইদিকে চাহিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর এক পা' এক পা' করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

৩

মহেশবাবুর বাড়ী হইতে সুশীলবাবুর বাড়ী বেশী দূর নয়, সামান্যই পথ। যাইতে অধিক সময় লাগে না। কিন্তু নরেশের যেন এইটুকু পথ আর ফুরায় না! তাহার অন্তর যেমন এক বেদনার আকস্মিক আবির্ভাবে সহসা অভিভূত হইয়া পড়িল, দেহটাও তেমনি যেন এক নিষ্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্লান্তির সীমায় আসিয়া মানুষ যখন হাঁটে, তখন সে হাঁটায় যেমন কোনই ছন্দ থাকে না, নরেশও ঠিক তেমনি করিয়া চলিতে লাগিল। পথ ফুরায় নাই বলিয়াই যেন চলা!

যখন সে বাড়ী পৌঁছিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। সুশীলবাবু আফিসে চলিয়া গিয়াছেন। এই কাণ্ডের পর পিতার সম্মুখে যাওয়ার যে একটা লজ্জা নরেশের মনে ছিল, আপাততঃ সেটা কাটিয়া গেল। পিসীর সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, বলিল, বেলাও নেই, না পিসীমা?

পিসী বলিলেন, হ্যাঁ, সে আছে। আজ যে তার ইস্কুল বন্ধ। বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বেলা, অ' বেলা—

অন্তরাল হইতে বেলা সাড়া দিয়া ক্ষণকাল পরে আসিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল, দাদা, হঠাৎ চ'লে এলে?

নরেশ একটু হাসিয়া বলিল, আমি ত' বাবাকে লিখেছিলুম।

বেলা বলিল, কিন্তু আজই আসবে বলে লেখো নি।

নরেশ বলিব, তা লিখি নি। কিন্তু বড্ড দরকার হ'য়ে পড়লো।

ক্ষান্তমণি নরেশের শুষ্কমুখ অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। একটু তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, লেখাপড়া ছেড়ে কত দরকার হবে এইবার দেখো না! নে, যা তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়, তারপর খেয়ে-দেয়ে, যত পারিস দরকার করিস। আর ত' পড়াশুনোর ভাবনা নেই! যা বেলি, তোর দাদার একটা ঠাঁই ক'রে দিগে যা'।

ক্ষান্তমণির আজ সকালে আহ্নিক করা হয় নাই, নরেশকে খাইতে দিয়া নিজে আর সম্মুখে বসিতে পারিলেন না, বেলাকে বসাইয়া পূজা-ঘরে চলিয়া গেলেন।

নরেশ আহার করিতে করিতে বোনের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

বেলা বলিল, দাদা, আজ মহেশবাবু এসেছিলেন।

নরেশ মুখ না তুলিয়াই বলিল, জানি।

বেলা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কি ক'রে জানলে?

নরেশ বলিল, এখান থেকে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়। তারপর বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যান।

বেলা একটু থামিয়া বলিল, কি বল্লেন তিনি?

নরেশ বলিল, বল্লেন অনেক কথাই। মোট-মাট বুঝিয়ে দিলেন, কলেজে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। জানো ত' উনি এসবের কত বিপক্ষে?

বেলা বলিল, তা জানি। কিন্তু অন্য কিছু বলেন নি?

নরেশ প্রত্যুত্তরে একটু হাসিয়া আহার করিতে লাগিল।

বেলা কিছুক্ষণ দাদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আশার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল?

নরেশ বলিল, না। একটু পরে বলিল, আশা আমাদের বাড়ী কতদিন আসে নি?

বেলা বলিল, অনেকদিন। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কোথাও কিছু একটা হইয়াছে। কিন্তু ঠিক আন্দাজ করিতে না পারিয়া বলিল, খুলেই বল' না, দাদা, কি হয়েছে?

নরেশের আহার শেষ হইয়াছিল। জলের গেলাসটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিল, হয়নি বিশেষ কিছু। কিন্তু লোকের মনটা ত' বোঝা যায়? মহেশবাবুর মনও আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি।

বেলা বলিল, আর আশার?

নরেশ একটু ভাবিল। তারপর ঠিক বেলার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, এর আগে যখন একবার আসি তখনও খুব

আন্দোলন চলছিল। আমি তখনও কলেজ ছাড়ি নি। আশার সঙ্গে একদিন এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ও' শেষে বল্লে, আপনিও কি কলেজ ছাড়বেন নাকি? বলেছিলুম, বলা যায় না, হয় ত' ছাড়তে পারি। তখন সে কি ব'লেছিল, জানো? ব'লেছিল, আদর্শের দোহাই দিয়ে এমনি ক'রে কর্ত্তব্য থেকে সরে পড়াকে আমি শুধু ভীরুতা বলি না, কাপুরুষতা বলি। ঝড়ের আগে এঁটো পাতার সঙ্গে তুলনা দিয়ে ব'লেছিল, যারা এমনি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, আসল কথা তাদের হুজুগের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। এখন যে আমাকে এঁটো পাতা ছাড়া আর কিছু ভাবছে, কি ক'রে বলি বল'? বলিয়া সে একটু হাসিল।

এই মেয়েটির প্রতি নরেশের ভালবাসা কত অসীম, বেলার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। পরে একসময়ে বলিল, দাদা, তোমার কি আর কোনমতেই কলেজে ফিরে যাওয়া চলে না?

নরেশ শুধু বলিল, না।

বেলা আর কিছু বলিল না। একটা কাজের নাম করিয়া উঠিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে নরেশের একটু লজ্জা হইল। ভাই-বোন সম্পর্কে সাধারণতঃ যে সঙ্কোচ থাকে, এ দুজনের মধ্যে তাহা খুব কমই ছিল। বাল্যকালে মা'কে হারানোর বেদনা উভয়কে অতি নিকটে আনিয়া অনেকটা বন্ধুত্বের পদে দাঁড় করাইয়াছিল।

সুতরাং এই দুই ভাই-ভগিনীর মধ্যে গল্প পরিহাসে ছোট-বড়র ব্যবধান খুব কমই থাকিত। তথাপি বেলা চলিয়া গেলে নরেশের একটু লজ্জা-বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল এতটা বলিয়া নিজের দুর্ব্বলতাকে এতখানি উন্মুক্ত করা ঠিক হয় নাই। কে জানে সবই তাহার কল্পনা নয়, আসলে হয়ত সব কিছুই ঠিক আছে!

সুশীলবাবু কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকক্ষণ পুত্রের সহিত কথা কহিলেন। সে এখন কি করিবে, গ্রামে যাইয়া কোথায় থাকিবে, সেখানে কি ধরণেরই বা কাজ হইবে, ইত্যাদি সমস্ত জানিয়া লইলেন। পিতাকে অনুকূল বুঝিয়া নরেশও উৎসাহের সহিত সেখানকার ভাল-মন্দ সব তাঁহাকে কহিতে লাগিল। কিন্তু আসলে সে পিতার মনের ইচ্ছা বুঝিল না।

গল্প করিতে রাত্র হইয়াছিল। উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল বেলা বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়াই বেলা বলিল, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলুম, দাদা।

নরেশ বলিল, কেন রে?

বেলা বলিল, আশার সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম। তোমার কথাই ঠিক, দাদা।

নরেশের বুকের ভিতর যেন কাঁপিয়া উঠিল। একান্ত স্পষ্টতার অভাবে সে নিজের মনকে এই বলিয়াই বুঝাইয়া রাখিয়াছিল, এ-সকল তাহার অনুমান মাত্র। সত্য ইহাতে

কিছুই নাই। যেটা সত্য, আশার ভালবাসা, সেটা তাহার ভাল করিয়াই চেনা আছে।

বেলা আবার বলিল, আমিও তাকে সাদা কথায় ব'লে এসেছি, মেয়ে-মানুষের অতটা অহঙ্কার ভাল নয়।

নরেশ বলিল, অহঙ্কার?

বেলা বলিল, অহঙ্কার বৈকি! নইলে তোমার কাজের সমালোচনা করতে যাবে কেন?

নরেশ বলিল, কিন্তু সে ত'—

বেলা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, খুবই নম্র এবং ধীর। বোধ হয় বিনয়ীও বটে! কিন্তু না দাদা, তোমরা দেখতে পাও না, ওরই ভেতরে অহঙ্কার লুকিয়ে থাকে। সেইজন্যেই তাকে সাবধান ক'রে দিয়ে এসেছি, ভবিষ্যতে যাতে বেশী কষ্ট না পায়।

নরেশ শুধু এইটুকুই বুঝিল, আশা তাহার কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছে, হয় ত' অযথা কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু সে কি বলিয়াছে না বলিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বেলা নিজের চিন্তাসূত্র ধরিয়াই পুনরায় কহিল, তোমাকে কিছু বলা ধৃষ্টতা, কিন্তু তবু বলছি, দাদা, তোমার সম্মান কিছুতে নষ্ট হ'তে দিও না। যতদিন না পায়ে ধ'রে ক্ষমা না চাইবে, ততদিন ওকে ক্ষমা ক'রো না। কি ব'লে জ্ঞানো? ব'লেছে,অমন লোকের সঙ্গে সংস্রব রাখতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

শুনিয়া নরেশ স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া বেলা একপ্রকার দম্ভভরেই প্রস্থান করিল।

৪

যে দলটির সঙ্গে নরেশ ও ধীরেন গিয়াছিল, সেই দলটি গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া জাতীয়তা, বিদেশীদ্রব্য বর্জ্জন প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া অনেকদিন কাটিল। তাহাদের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল, গ্রামবাসীরা জাত্যাভিমান, ইংরেজের মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে কতদূর কি শিখিল অন্তর্য্যামীই জানেন, কিন্তু এই লইয়া আন্দোলন ও আলোচনা হইল। যথেষ্ট বিশেষ সংবাদদাতারা এবং পত্র-প্রেরকেরা খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ভরিয়া তুলিতে লাগিলেন।

তারপর কেমন করিয়া কি ঘটিল, এই দলটি যেখানে যাইতে লাগিল, পুলিশ, রিপোর্টার প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গ লইতে লাগিল। হয় ত' ইহাই স্বাভাবিক এবং সরকারের কর্ত্তব্যবিশেষ। কিন্তু গ্রামবাসীদের চোখে ইহা অভিনব ঠেকিতে লাগিল। তাহাদের

মধ্যে নানা আলোচনার সৃষ্টি হইল। এমনও খবর তাহাদের নিকট পৌছিল, শীঘ্রই একটা গোরার দল আসিয়া পৌছিবে। ফলে দেখা গেল, গ্রামবাসীরা বিদেশী-বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে স্বদেশী-সভা বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এমন দাঁড়াইল, যে কেহই সভায় আসিতে চায় না। অতঃপর কি করা যায়, এই কয়জন কর্ম্মী মিলিয়া তাহাই আলোচনা করিতে বসিল।

দেখা গেল গ্রামে বসবাস আরম্ভ না করিলে কিছুই কাজ হইবে না। এমনি উপর উপর তাপ ছোঁয়াইলে চলিবে না, জাতীয়তার অগ্নিদীপ একেবারে সর্ব্বনিম্নপ্রদেশে ধরিতে হইবে। তবেই ইহার অগ্নি একদিন আকাশে লেলিহান জিহ্বা মেলিয়া ধরিবে। একাজ করিতে হইলে ইহাদেরই মধ্যে বসবাস করিয়া, ইহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া, বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে।

নরেশ ঠিক ইহাই চাহিয়াছিল। তাহারই পরামর্শমত কর্ম্মী কয়জন আশে-পাশের গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। যতদিন অন্য ব্যবস্থা না হয়, ততদিন এইরূপই চলিবে।

নরেশ ও ধীরেন একটা ছোট গ্রামে রহিল। গ্রামে চাষী ও নিম্নশ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। ইহাদের মধ্যে থাকিয়া দেশ-সেবার নেশায় এই দুইটি যুবক একেবারে মাতিয়া উঠিল।

কিন্তু হাতের টাকা ফুরাইয়া গিয়া এক নূতন সমস্যা দাঁড়াইল। কলিকাতায় লেখালেখির পর যাহা আসিল, তাহা যৎসামান্য। অবশেষে নরেশ পিতার নিকট হইতে কিছু টাকা আনাইয়া এ-সমস্যার আপাততঃ একটা সমাধান করিল।

সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন বিপদ জুটিল তাহাদের থাকিবার স্থান লইয়া। যে কয়ঘর ভদ্রব্যক্তি ছিলেন, সকলের গৃহেই কিছুদিন করিয়া অতিথি হইয়া ইহারা দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু পুলিশের ভয়ে ক্রমেই তাঁহারা গা আলগা দিতে লাগিলেন। তা ছাড়া এমনি করিয়া বরাবর চলে না।

অবশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া চাষা-ভূষোদের মধ্যে আশ্রয় লইল। কিন্তু ভদ্রসন্তানের পদরজঃ গৃহে পড়ায় তাহারা এতই সঙ্কুচিত ও অপরাধগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল, যে বিব্রত হইয়া ধীরেন বলিল, হয় একটা থাকবার বন্দোবস্ত করো, নইলে চলো কলকাতায় ফিরে যাই। পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিলে তাহারা সযত্ন-মার্জ্জিত ঘটি ও অদূরে পুষ্করিণী দেখাইয়া বলে, দয়া করে নিয়ে আসতে হবে। আপনারা দেবতা-মানুষ, আমাদের তোলা জল ত' আর খেতে পারেন না?

অবশেষে আশ্রয় মিলিল। কলিকাতা-প্রবাসী এ-গ্রামের এক ভদ্রলোক দেশে ফিরিয়াছেন। উদ্দেশ্য বাড়ী-ঘর সব বিক্রয় করিয়া আবার ফিরিয়া যাইবেন। সঙ্গে পাচক ও চাকর. আর কেহ নাই। তিনি সাদরে ইহাদের স্থান দিলেন, বলিলেন, জায়গা-জমি যখন এক দিনেই বিক্রয় হইয়া যাইতেছে না, তখন তাহারা কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত মনে এখানে বসবাস করিতে পারে।

ঠিক পরদিনই নরেশ ধীরেনকে একান্তে ডাকিয়া কহিল, রাজেনবাবুর নামে বড় অপবাদ শুনেছি, ধীরেন।

রাজেনবাবু তাহাদের আশ্রয়দাতার নাম। ইহার সম্বন্ধে ধীরেনও শুনিয়াছিল। তথাপি বলিল, কি অপবাদ?

নরেশ বলিল, রাজেনবাবুর চরিত্র নাকি জঘন্য। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের লোক। মদের খরচের অকুলান হয়েছে ব'লেই বাড়ী বিক্রী করছেন।

ধীরেন বলিল, আমি আরও শুনেছি। এঁর অত্যাচারে স্ত্রীটি বহুদিন আগে আত্মহত্যা ক'রে মরেছেন। একটি মেয়ে আছে, তাকে বোর্ডিংএ রেখে, কলকাতায় মেয়েমানুষ নিয়ে থাকেন। সেখানে এঁর দু'তিনখানা বাড়ীও আছে শুনেছি।

নরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, রাজেনবাবু যাই হ'ন, আমাদের তাতে ক্ষতি কি?

ধীরেন বলিল, বাঃ, তাতে ক্ষতি কি? দু'দিন থাকলেই খুব সুনাম কিনবে। ইতিমধ্যেই লোকে নাক সিঁটকুতে আরম্ভ ক'রেছে, বলে, চোরের বাড়ীতে সাধু আশ্রয় নেয় না।

নরেশ বলিল, তা না নিক, আমরাও আর সাধুদের মধ্যে যাচ্ছি না। চাষাদের নিয়ে আমাদের কাজ, তারা কোনদিন রাজেনবাবুর চরিত্র নিয়ে কুৎসা করবে না।

ধীরেন বলিল, আজ না করে, কাল করবে। ওই বাবুরাই ওদের কান ভাঙ্গাবে। তখন এরা আর আমাদের বিশ্বাস করবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো না?

নরেশ বলিল, কি?

ধীরেন বলিল, কর্ত্তাদের চিঠি লিখে দাও, তাঁরা এখানে

আশ্রম-ফাশ্রম যা হ'ক একটা কিছু খুলে আমাদের থাকবার জায়গা ক'রে দিন। আর কিছু লোকও পাঠান। নইলে এমনি ক'রে দেশসেবা চলতে পারে না।

সেই দিনই চিঠি লেখা লইল; এবং অন্য ভাবেও নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল।

দিন সাতেক পরে গ্রামের মধ্যে একটা সেবাশ্রম খোলা হইল। একটা আটচালা অমনি পড়িয়াছিল। এককালে ইহা পাঠশালা ছিল। সেইটেকেই কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া মেরামত করিয়া গোটা আট-দশ চরকা আনিয়া, এবং আরও দু'চারজন লোক মিলিয়া এই পরিত্যক্ত জীর্ণ স্থানটি কোলাহল-মুখর করিয়া তুলিল। দিনমানে চরকা এবং উপদেশ চলিতে লাগিল, সন্ধ্যার পর নাইট-স্কুল বসিল, এবং রাত্রে গোটাকতক শয্যা পাতিয়া শয়ন ঘর প্রস্তুত হইল। একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সম্প্রতি গ্রামে আসিয়াছেন, কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনিও দলে মিশিয়া গেলেন। ফলে ঔষধালয়ও স্থাপিত হইল।

নরেশ আগেই এখানে আসিয়াছিল। ধীরেনকে বলিতে সে বলিল, রাজেনবাবুর কাছেই বেশ আছি। কাজ নিয়ে কথা ত'? আর কি করতে হবে বল' করবো।

নরেশ সবিস্ময়ে বলিল, তুমিই ত' রাজেন বাবুর বাড়ীতে থাকতে আপত্তি ক'রেছিলে।

ধীরেন বলিল, সে ঐ লোকগুলোর কথা শুনে।

নরেশ বলিল,সে যাক্, কিন্তু ওখানেও বরাবর থাকা চলবে না।

ধীরেন বলিল, তখন ঐ আশ্রমেই জুটবো, কিন্তু এখন আর জটলা পাকিয়ে লাভ কি ?

নরেশ আর তর্ক করিল না। কহিল, তা হয় না, ধীরেন। যে ক জন আমরা কাজ করছি, সকলেই একজায়গায় র'য়েছি, হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছি, তুমি আর এক জায়গায় আরামে থাকবে, তা ভাল দেখায় না। একসঙ্গে থাকাই ভাল।

ধীরেন বলিল, আরাম বিশেষ নয়, এ-পিঠ আর ও-পিঠ। তবে,—আচ্ছা তবে তাই হবে। কাল থেকেই আমি ক্লাবের রেগুলার মেম্বার হব।

সন্ধ্যার সময় রাজেনবাবু দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে ধীরেনকে বলিলেন, দুপুরেই বিছানাটা রেখে এসেছো ?

ধীরেন বলিল, হ্যাঁ। আপনি তখন কোথায় গিছলেন।

রাজেনবাবু পুনশ্চ কহিলেন, ওখানে একটু কষ্ট হবে ত' ?

ধীরেন বলিল, তা হবে বৈকি !

রাজেনবাবু কিছুক্ষণ আর কোন কথা কহিলেন না। পরে ধূমাচ্ছন্ন মুখ তুলিয়া বলিলেন, চাষাদের একটু বর্ণ-পরিচয় শিখিয়ে কিম্বা দু'টো ভাল কথা শুনিয়ে কি উপকার করবে ?

ধীরেন বলিল, উপকার ? কিচ্ছু না।

রাজেনবাবু বলিলেন, তবে ?

ধীরেন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, আমার এই সব চাষা-ভূষোদের সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় আছে। বাবার নায়েবের কাছে এরা আস্‌তো। এদের কি করলে ঠিক উপকার করা

হবে না জানলেও, এটুকু জানি, একটু-আধটু লেখা-পড়া শিখিয়ে কিছুই হবে না। যদি ভাল ক'রে শেখানো হয়, সে অন্য কথা। কিন্তু তা ত' হবে না।

রাজেনবাবু বলিলেন, কি করলে এদের ঠিক উপকার করা হবে জানো? খেতে দিতে পারলে। কি করলে এদের তু'বেলা আহার জুটবে, তার বন্দোবস্ত করতে পারো? নইলে পিপে-শুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ঢাললেও কোন উপকার হবে না, আর সহরশুদ্ধ মাষ্টার এলেও বিদ্যাদান করা হবে না। তবে তোমরা ছেলেমানুষ, একটা কাজ করছো, কর'।

ধীরেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি কিছুই করছি না। এ বিষয়ে আমার ধারণাও নেই। তবে নরেশের কিছু জ্ঞান আছে। এ কথা সে নিশ্চয়ই বোঝে, শুধু প্রথমভাগ পড়িয়ে কিছুই হবে না। কিন্তু বোঝা এক, আর কাজ করা এক। একটু থামিয়া কহিল, ওর ধারণা, এমন একদিন আসবে যখন এই চাষা-মজুরদের সঙ্গে সমানভাবে আমাদেরও পেটের ভাবনা আসবে। তখন সকলকে একসঙ্গে চলতে হবে। সে সময়ের জন্যে নাকি এখন থেকেই এদের প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে। আচ্ছা আমি উঠি, আজ নাইট-স্কুলে আমার ডিউটি।

রাজেনবাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, আচ্ছা। তারপর ধীরেনকে ডাকিয়া কহিলেন, বলা যায় না, বিদেশে অসুখ-বিসুখ হ'লে এখানেই এসো। ঐ হাতুড়ে-ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আশ্রমে প'ড়ে থেকো না।

এই স্নেহ-আহ্বানে ধীরেনের চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে কোমল-কণ্ঠে কহিল, আসবো বই কি! অসুখ না হ'লেও দিনান্তে একবার অন্ততঃ আপনার সঙ্গে গল্প করতে আসবো।

ধীরেন চলিয়া গেল। রাজেনবাবু সেইদিকে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। পরে একসময়ে আপন মনেই অস্ফুটে কহিলেন, মন্দ কি? জমিদারের ছেলে,—বলা যায় না!

কোন এক পর্ব্বোপলক্ষে আজ নাইট স্কুল বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার পর নরেশের কোন কাজ ছিল না। শরীরটাও ভাল লাগিতে-ছিল না, কেমন একটা অবসাদে শরীর ও মন উভয়ই আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। পাশের ঘনান্ধকার বনটার দিকে চাহিয়া সে এমনি অন্যমনস্কমন লইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ধীরেন কোথা হইতে আসিয়া তাহার পাশটায় বসিল।

নরেশ কোন কথা কহিল না দেখিয়া ধীরেন বলিল, কি ভাবছো?

নরেশ কিছুই ভাবিতেছিল না, বলিল, কিচ্ছু নয়।

ধীরেন একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, তা' হ'তে পারে না। কিছু একটা ভাবছো। আশার কথা ভাবছো, না?

নরেশও হাসিল। কহিল, আশার আর আশা নেই। আর যদিই বা আশা থাকে, ভাববার সময় এতদিন পাই নি।

ধীরেন কহিল, তাই আজ সময় পেয়ে ভাবছো বুঝি?

নরেশ বলিল, মনে ছিল না, এইবার ভাবতে স্নুরু করবো।

ধীরেন বলিল, করো, কিন্তু তুমি এতদিন রাজেনবাবুর সঙ্গে

দেখা ক'রো নি কেন? ভদ্রলোক তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

নরেশ আস্তে আস্তে বলিল, কাল পরশু একবার যাবো।

ধীরেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর দেওয়ালের কোণে ভাল করিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া কহিল, আজ রাজেনবাবুর মেয়ে এসেছেন।

নরেশ কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলিল, রাজেনবাবু আমাকে বলেছিলেন বটে, তাঁর মেয়েকে শীগ্‌গীর আনবেন।

ধীরেন পুনরায় কহিল, এই উপলক্ষে তিনি কাল আমাদের নিমন্ত্রণ করতে চান।

নরেশ বলিল, কাল? কিন্তু জান ত', কাল আমাদের কত কাজ?

ধীরেন বলিল, আমিও তাঁকে ঐ কথাই ব'লেছিলুম। উনি বল্লেন, রাত্রে খেতে আপত্তি কি?

নরেশ বলিল, কাল কত রাত্তির হবে কোন্ ঠিক আছে কি? একদিন খেলেই ত' হ'ল—অন্য একদিন্ আয়োজন করতে ব'লো।

এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। কিছুক্ষণ পরে ধীরেন উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে নরেশ বলিল, কোথা যাচ্ছো?

ধীরেন দরজা পার হইয়া কহিল, রাজেনবাবুকে আয়োজন করতে নিষেধ ক'রে দিইগে'। একটু পরেই আসছি। বলিয়া

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আশ্রমের দাওয়ায় একটা খোঁড়া কুকুর আসিয়া জুটিয়াছিল, সেটা বার দুয়েক ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল।

কিছুদিন পরে ঠিক এমনিই এক সন্ধ্যায় দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল।

ধীরেন বলিল, তোমার আপত্তির কারণটা কি, তাও ত ত' সুস্পষ্ট বলছো না।

নরেশ বলিল, বলা-কওয়া কিছুই নেই, হঠাৎ নিমন্ত্রণ খাওয়া,— এ আমি পারবো না।

ধীরেন বলিল, আর যখন থাকবার অভাবে এ-দোর ও-দোর ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, তখনই বা পূর্ব্বে থেকে কে নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিল বল'?

নরেশ বলিল, তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা সমান নয়। রাজেনবাবু সে সময়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নি, আর আমরাও অন্য সম্বন্ধে গিছলুম।

ধীরেন বলিল, সম্বন্ধটা এখনও কিছু বদলায় নি, নরেশ। যদি কিছু বদলে থাকে, ত সে তোমার মন।

নরেশ চুপ করিয়া রহিল। রাজেনবাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে না যাইতে চাওয়ার কারণ অন্য। সে এখানকার প্রতিষ্ঠানটির কর্ত্তৃপদ অধিকার করিয়া আছে। অন্য সকলে কষ্টে-স্থষ্টে রাঁধিয়া খাইবে, আর সে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইবে, ইহা অতিশয় বিসদৃশ ঠেকে। অথচ কয়েকদিন যাবৎ এমনিই

হইয়া আসিতেছে। রাজেনবাবু প্রায়ই কোন-না-কোন ওজুহাতে এই দু'জনকে আহার করাইতেছেন। এই লইয়া ইতিমধ্যেই একটা কথার সৃষ্টি হইয়াছে, নরেশ তাহা আভাসে টের পাইয়াছিল। তাই সে স্থির করিয়াছিল, এমনি কারণে-অকারণে আর রাজেন-বাবুর বাড়ী যাইবে না।

এই কথা ধীরেনকে সে বলিতে পারে না। কারণ তাহার এই অবুঝ বন্ধুটি ইহার অর্থ বুঝিবে না। যদিই বা এই কথা-সৃষ্টির ইঙ্গিত বোঝে, সে অমনি বুঝিয়া ক্ষান্ত হইবে না, যা হ'ক একটা হেস্ত-নেস্ত করিবেই; এবং তাহাতে ব্যাপারটা কতদূরে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কল্পনা করা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে।

নরেশকে নীরব দেখিয়া ধীরেন একটু অসহিষ্ণু-কণ্ঠেই কহিল, তা হ'লে যাবে না?

নরেশ একটু আহত হইয়া বলিল, না ভাই, আমি যাবো না।

ধীরেন আর কিছু বলিল না। দেওয়ালের গা'য়ে টাঙানো কোটটি তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

ধীরেন চলিয়া যাইবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একজন ছেলে একটা চিঠি আনিয়া কহিল, এই নিন, নরেশ-দা'।

নরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, রাত্রে চিঠি এলো কেমন ক'রে?

ছেলেটি একটু হাসিয়া কহিল, মাষ্টার-বাবু ডেকে দিলেন। পত্রটির ওপর থানার একটু দৃষ্টি প'ড়েছিল তাই দেরী হ'ল, নইলে সকালেই পেতেন।

নরেশ পত্র খুলিয়া দেখিল কলিকাতা হইতে আসিয়াছে।

পত্রপাঠ তাহার তথায় রওনা হইবার উপদেশ আছে, কারণ একদিন পরেই কর্ম্মীসঙ্ঘের একটা সভা বসিবে, সেখানে তাহার উপস্থিত একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বাক্ষরকারীর নাম দেখিয়া নরেশ বুঝিল, এ আদেশ অমান্য করা চলে না। যাইতে হইলে এখনিই রওনা হইতে হয়। আর এক ঘণ্টা পরেই গাড়ী। ভাবিবার বিশেষ সময় ছিল না। যাইবার জন্য তখনই প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সহসা মনে পড়িল এখানকার একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হইবে। যথা সময়ে পত্র আসিলে ব্যবস্থার কোনই ত্রুটী হইত না, কিন্তু এখন তাড়াতাড়িতে এক ধীরেনের কথাই তাহার মনে পড়িল। তখনই সে রাজেনবাবুর বাড়ীতে ছুটিল।

রাজেনবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে হইল না, পথেই ধীরেনের সহিত দেখা হইল। বলিল, তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম। আমি এখুনিই কলকাতা যাচ্ছি।

ধীরেন সবিস্ময়ে বলিল, কেন ?

পত্রের কথা বলিয়া নরেশ কহিল, যতদিন আমি না ফিরি এখানকার ভার তোমার ওপর রইল। বোধ হয় পাঁচ-সাত দিনের বেশী দেরী হবে না।

দুই বন্ধু অন্ধকার-পথে চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল। এক সময়ে সব কথা শেষ হইয়া গেল। মেঠো পথে জুতার খট্ খট্ শব্দ হইতে লাগিল।

দূরে ষ্টেসনের মিটমিটে আলো দেখা গেল। নরেশ ধীরেনের

একটা হাত টানিয়া লইয়া বলিল, একটা কথা বলবো, কিছু মনে ক'রো না।

ধীরেন শুধু বলিল, বলো।

নরেশ বলিল, যা করবে, তুমি না ভেবে ক'রো না। এখানে তোমার কেউ সহায় নেই, বিপদে দুর্দ্দিনে কেউ একটা উপদেশও দেবে না। জানো ত', তুমি সেন্টিমেন্টের মাথায় কি করতে এবং না করতে পারো? বলিয়া সে ধীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া থামিল।

ধীরেন নীরব হইয়া রহিল।

নরেশ পুনশ্চ কহিল, আমাকে কথা দিচ্ছো? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারি?

নরেশ কি ভাবিয়া কথাগুলো বলিতেছে, ধীরেন বুঝিল না। কিন্তু ইহা সে বুঝিল: নরেশ যাহাই ভাবুক, তাহার কল্যাণ কামনা করিয়াই বলিতেছে। মনে পড়িল, কেবলমাত্র খেয়ালের বশেই এমন অনেক কাজ সে করিয়াছে, যাহার সমস্ত দায়িত্ব এই বন্ধুটিকেই কাঁধ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। তাই সে নরেশের প্রশ্নের উত্তরে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্তমনে যাও। আমি না ভেবে কোন কাজ করবো না।

নরেশকে তুলিয়া দিতে ষ্টেসনে আরও দু'একজন আসিয়াছে। নরেশকে দেখিয়া তাহারা কাছে আসিল।

নরেশ ধীরেনের ধৃত হাতটায় একটু চাপ দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আমার আসতে যদি দেরী হয়, বা যদি এমন হয় যে আর না আসি,—তাই তোমাকে প্রতিজ্ঞাটা করিয়ে নিলুম

নরেশ কি ভাবিয়া আর না আসার কথা কহিল, এবারেও ধীরেন তাহা বুঝিল না। কিন্তু অন্য সকলে আসিয়া পড়ার দরুণই হ'ক, বা অন্য কোন কারণেই হ'ক, এ-সম্বন্ধে সে কোন প্রশ্ন করিল না।

নরেশ চলিয়া গেলে ধীরেন অন্য সকলের সহিত আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল নরেশ কিছুই খাইয়া যায় নাই। খাইবার সময় ছিল না।

নরেশের সহিত যখন পথে তাহার দেখা হয়, তখন সেও নরেশের নিকটই আসিতেছিল। নরেশকে আর একবার বলিয়া কহিয়া নিমন্ত্রণে ধরিয়া লইয়া যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে রান্নার পরিপাটি ব্যবস্থা দেখিয়া একা আহার করিতে তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। এই কারণে রাজেনবাবুর কন্যার নিকট আধঘণ্টা ছুটী লইয়া আসিয়াছিল।

যখন শুনিল নরেশ অভুক্ত অবস্থাতেই কলিকাতা রওনা হইয়াছে, তখন আর সে রাজেনবাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া গেল না। আহার হইয়া গিয়াছে বলিয়া আলোটা কমাইয়া শুইয়া পড়িল।

৫

বেলা তিনটে আন্দাজ ধীরেনের ঘুম ভাঙ্গিতে তাহার মনে পড়িল, আজ কোন কাজ নাই, কোথাও যাইতেও হইবে না। তখন ভাল করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আর একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম আসিল না, চোখ বুঁজিয়া শুইয়া রহিল। এক সময়ে ঘরের মধ্যে পদশব্দে শুনিয়া চোখ না খুলিয়াই বলিল, কে, চন্দ্রা বুঝি ?

চন্দ্রা রাজেনবাবুর মেয়ের নাম। বলিল, খুব ঘুমুচ্ছেন ত' ?

ধীরেন চোখ মেলিয়া বলিল, অনভ্যাসের দরুণ বারবার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারপর উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া কহিল, পুলিশ যখন আমাদের আটচালা থেকে তাড়িয়ে দিলে, তখন আমার ভারি রাগ হ'য়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভালই হ'য়েছে, নইলে অন্ততঃ একটি দিনের দিবানিদ্রার সুখ থেকে বঞ্চিত হতুম।

চন্দ্রা একটু হাসিয়া কহিল, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে ত'—এখন উঠুন। কোথায় ডিউটি-টিউটি কি আছে সেরে আসুন গে' যান।

ধীরেন বলিল, নাঃ, আজ কিচ্ছু কাজ নেই।

চন্দ্রা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, কিচ্ছু কাজ নেই মানে?

ধীরেন বলিল, মানে অতি অতি সংক্ষেপ। যতদিন না নতুন-বাড়ী পাওয়া যায় ততদিন নাইট-স্কুল বন্ধ। হাটে যে পিকেটিং চলছিল সেটাও বন্ধ থাকবে, কারণ সকলেই চ'লে গেছে। আমি একা কি করবো?

চন্দ্রা বলিল, কেন, আপনাদের ডাক্তার? বলিয়াই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বেতের মোড়াটা টানিয়া বসিয়া কহিল, আপনার গুরুদেবকে একটা চিঠি লিখতে হবে দেখছি,—আপনি এখানে কাজ-কর্ম্ম কিছু করছেন না, শুধু ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন।

চন্দ্রা নরেশকে ধীরেনের গুরুদেব বলিত।

ধীরেন বলিল, ঠিকানা জানলে ত'! নইলে আমিই কি চুপ ক'রে থাকতুম? সেই যে একটা চিঠি দিলে, বল্লে, ঠিকানা পরে দেবে, ব্যস, আর কোন খোঁজ নেই।

চন্দ্রা বলিল, বাড়ী যেতে পারেন ত'?

ধীরেন বলিল, না বাড়ী যায় নি। বেলা চিঠি দিয়েছে, সেও নরেশের ঠিকানা জানে না। একটু পরে বলিল, কলকাতায় কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত আছে বোধ হয়। যা ছেলে, যেখানে কোন কাজ

আমরা খুঁজে পাই না, সেখানে ওর কাজের অন্ত থাকে না। কিন্তু যতই কাজ থাক, বাড়ীতে একটা চিঠি দেওয়া উচিত ছিল, কি বল? বলিয়া সে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিল।

চন্দ্রা প্রত্যুত্তরে কহিল, তা ছিল। কিন্তু উচিতটা কি আপনি পালন করেন?

ধীরেন বলিল, পালন ত' ক'রেছিলুম, কিন্তু তার ফলটা জানো ত'?

চন্দ্রা বলিল, পত্র পাঠ না গেলে আপনার বাবা আপনাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন,—এই ত? তাঁর দোষ কি? অবাধ্য হ'য়ে লেখা-পড়া ছাড়লেন, তারপর বাড়ীও ছাড়লেন। আপনি নিজেই ত' সব ছাড়ছেন।

ধীরেন অন্যমনস্কভাবে বলিল, তাই যেন পারি,—এক এক ক'রে সব যেন ছাড়ি।

চন্দ্রা সকৌতুকে কহিল, সব?

ধীরেন কহিল, নিজে কষ্ট করতে হবে না, সব আপনা থেকেই আমাকে ছেড়ে যাবে।

চন্দ্রা সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনার মা কি বলেন?

ধীরেন বলিল, মা? বিশেষ কিছু বলেন না। তারপর বালিসটায় আর একবার আরাম করিয়া শুইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার নিজের মা নেই, বিমাতা আছেন।

কিছুক্ষণের জন্য কেহই কোন কথা কহিল না। পরে চন্দ্রা

বলিল, উঠুন, আর শোবেন না। কাজ যখন নেই তখন আর কি করবেন? চা আন্‌ছি, খেতে খেতে গল্প করুন।

চা পান করিতে করিতে ধীরেন চন্দ্রাকে প্রশ্ন করিল, তুমি বোর্ডিংএ আবার কবে যাবে?

চন্দ্রা কহিল, কবে আবার,—একদিন গেলেই হ'ল।

ধীরেন বলিল, শীগ্‌গীর যাবে কি?

চন্দ্রা বলিল, যেতেও পারি। কেন বলুন ত'?

ধীরেন বলিল, তা হলে আর আমার থাকা চলবে না।

চন্দ্রার মুখ প্রচ্ছন্ন হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, কোথায় থাকা হবে না? গ্রামে, না আমাদের বাড়ীতে?

ধীরেন বলিল, তোমাদের বাড়ীতে। এবং তোমাদের বাড়ীতে থাকা না হ'লে গ্রামেও থাকা হবে না।

চন্দ্রা বলিল, আমাদের বাড়ী থাকা না হ'লে যে গ্রাম ছাড়তে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু সে যাক্, আমি চলে গেলে আমাদের বাড়ীতে আপনার থাকা হবে না কেন? আমি আসবার আগেও ত' আপনি ছিলেন।

ধীরেন বলিল, তা ছিলুম, কারণ তখন তোমার অস্তিত্বই জানতুম না।

চন্দ্রা বলিল, আর এখন জেনেছেন, তাই আমি চ'লে গেলে এখানে আর থাকবেন না। কেন বলুন ত'?

ধীরেন কোন উত্তর করিল না। নীরবে চা পান করিতে লাগিল।

চন্দ্রা কি বলিতে গিয়া থামিয়া কহিল, আমাকেও কি আপনা-দের মত লেখা-পড়া ছাড়তে উপদেশ দেন নাকি ?

ধীরেন কাপটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, আমি উপদেশ দেবার কে ?

এবারেও চন্দ্রা একটা কথা চাপিয়া গেল। একটু হাসিয়া বলিল, আপনার বুঝি উপদেশ দেওয়া চলে না ? ওটা আপনার গুরুদেবই একচেটে করে রেখেছেন ?

ধীরেন বলিল, নরেশের সম্বন্ধে তোমার ভারী ভুল ধারণা। ওকে তুমি একটুও চিনলে না। অথচ, আশ্চর্য্য, যে তিন দিন ওর সংস্পর্শে এসেছে, সেই ওকে চিনেছে।

চন্দ্রা বলিল, অর্থাৎ আপনার গুরুদেব উপদেশ দেন না, এই ত' ?

ধীরেন বলিল, না, ও কোনদিন উপদেশ দেয় না। কিন্তু আদেশ করে। কেন, তুমি কি জানো না ?

চন্দ্রা বলিল, গুরুদেবের আদেশ-বাণী আপনিই জানুন, আমার সে সৌভাগ্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর আদেশ বাণীর যদি এতই জোর, তবে তাঁর বোনটি যে শুনছিলুম কলেজে ভর্ত্তি হবে, তাকে তিনি কিছু আদেশ দেন নি কেন ?

ধীরেন বলিল, ওদের বাড়ীতে প্রথাই হয়ে গেছে, কেউ কারুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। তা ছাড়া বেলাকে উপদেশ দেবে, এমন ক্ষমতাবান লোক আমি আজও দেখি নি। ওই যে রাশ-ভারী নরেশ, সেও এই ছোট বোনটির কাছে ছোট হ'য়ে থাকে।

চন্দ্রা সরলকণ্ঠে কহিল, আপনার গুরুদেবের ছোট-বোনটি তা হলে তস্য গুরুদেব ?

ধীরেন চন্দ্রার পরিহাস কানে না তুলিয়া কহিল, তস্য গুরুদেব বল্লে কথাটা নেহাৎ ভুল বলা হয় না। মানুষ যা নয়, তাকে তাই বুঝিয়ে দেয়।

চন্দ্রা হাসিয়া কহিল, যেমন মানুষকে গাধা বুঝিয়ে দেয়। একি কামরূপের মায়াবিনী নাকি, ধীরেনবাবু ?

ধীরেন বলিল, বিচিত্র নয়।

এই প্রকার মেয়েদের যাহা হয়, চন্দ্রার বুদ্ধি ও দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। সে তাহার এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া ধীরেনের মনের মধ্যে কি খুঁজিয়া পাইল, সেই জানে, সহসা গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, বেলার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ট পরিচয় আছে ?

ধীরেন চন্দ্রার মুখের দিকে লক্ষ্য করিল না, বলিল, ঘনিষ্টতা বলতে ঠিক কতখানি বোঝায় জানি না, তবে ওর সঙ্গে মেলা-মেশা খুবই ক'রেছি। একটু থামিয়া বলিল, এখনও কিন্তু ওর মন বুঝলুম না।

চন্দ্রা হাসিয়া কহিল, মন বোঝা কি এতই সহজ কথা, ধীরেন-বাবু।

ধীরেন বলিল, খুব সহজ নয়। কিন্তু মেলামেশার মধ্যে বোঝা যায় বৈকি !

চন্দ্রা বলিল, বেলার সঙ্গে আপনার ত' খুবই মেলা-মেশা ছিল।

ধীরেন বলিল, ছিল। তার কারণ, আমি অধিকাংশ সময় ওদের বাড়ীতেই কাটাতুম।

চন্দ্রা বলিল, সেই সূত্রেই আলাপ? তবুও ওর মনের পরিচয় পান নি?

ধীরেন বলিল, আগে ভেবেছিলুম, এই মেয়েটির মন আমি জলের মত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পরে দেখলুম সে জলের তল নেই।

চন্দ্রা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তল পেতে গেলে বড় ডুবুরির প্রয়োজন। কিন্তু ও জল যে এত অতলস্পর্শ, তা আপনি কি ক'রে জানলেন?

চন্দ্রা ধীরেনকে কোন পথে ঠেলিতেছিল গল্প-প্রসঙ্গে তাহা সে মোটেই লক্ষ্য করিল না। কহিল, বেলার সঙ্গে আমার একবার বিয়ের কথা হয়।

চন্দ্রা বলিল, তারপর?

ধীরেন বলিল, কথা তেমন ভাবে উঠলে বিয়ে হয় ত' হতেও পারতো। কিন্তু সে যাক, একটা কথা মাত্র, শেষ পর্য্যন্ত নাও দাঁড়াতে পারে, তবু সেইটেই ভিত্তি ক'রে মনে হয়েছিল বেলাকে আমি ভালবাসি।

চন্দ্রা সহসা প্রশ্ন করিল, এখন কি আপনি তাকে ভালবাসেন না?

ধীরেন নিজের মনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য ডুবিয়া গেল। পরে বলিল, কখনও বেসেছিলুম কি না, মধ্যে মধ্যে তাই ভাবি। আবার এক-একবার মনে হয়, হয় ত' এখনও ভালবাসি।

চন্দ্রার মুখের উপর দিয়া প্রচ্ছন্ন হাসি খেলিয়া গেল। সে বলিল, আপনি ত' বেলাকে ভালবাসলেন; তারপর কি হ'ল?

ধীরেন বলিল, আমার মনের কথাটা বোধ হয় কোন রকমে প্রকাশই হয়ে প'ড়েছিল। একদিন চুপ ক'রে ব'সে আছি, হঠাৎ বেলা এসে আমাকে ডাকলে, দাদা! আমি বললুম, আমি তোমার দাদা নই। কাছে এসে বল্‌লে, বাঃ, তুমি আমার দাদা নও কি রকম? তোমারা দু'জনেই আমার দাদা, বুঝলে? এই প্রথম বেলা আমাকে তুমি ব'লে ডাক্‌লে। আমার বিস্ময় দেখে একটু হেসে আবার বল্লে, দাদাকে দাদা বল্লে এত অবাক্ হবার কি আছে? আমি আর কি বলি? একটু হেসে বললুম, না, অবাক কি জন্যে হ'তে যাবো? কিন্তু সত্যি কথা, এত অবাক আমি আর কোন-দিন হই নি।

চন্দ্রা বলিল, কেন?

ধীরেন উত্তর করিল, এমনি অবলীলা-ক্রমে কথাটা বললে, এমনি ভাব প্রকাশ করলে, আমার মনে আর সন্দেহ-মাত্র রইল না, যে সত্যিই আমি তার দাদা।

চন্দ্রা হাসি গোপন করিয়া কহিল, এখন বুঝি সন্দেহ আছে?

ধীরেন সে-কথার উত্তর না দিয়া পুনঃ কহিল, এ-ঘটনার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল, ওই মেয়েটি আমাকে ভালবাসে। হয় ত, নরেশও তাই মনে করেছিল। কিন্তু আমাদের ধারণা যে কত বড় ভুল, এক মুহূর্ত্তে সে তা প্রমাণ ক'রে দিলে।

চন্দ্রা কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না। তারপর বলিল, আচ্ছা,

আপনারা মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলে থাকেন।

বাধা দিয়া ধীরেন আহতকণ্ঠে কহিল, সে গর্ব্ব আর নেই, চন্দ্রা, আমি শুধু বলছিলুম, মেলামেশাতে মানুষের মন অনেকটা বোঝা যায়।

চন্দ্রা এবার পরিহাস সকৌতুক করিল না। সলজ্জ দৃষ্টিতে ধীরেনের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা ধীরেনবাবু, আমার মনের কিছু বুঝতে পেরেছেন কি ?

ধীরেন সচকিত হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই তাহার মুখ কর্ণমূল অবধি রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু চন্দ্রা তাহা দেখিল না সে অন্যদিকে মুখ করিয়া ছিল, পুনরায় কহিল, কৈ, উত্তর দিলেন না ?

এই মেয়েটির অন্তরের ইতিহাস এক নিমেষেই ধীরেন আদ্যো-পান্ত দেখিয়া লইল এবং সেখানে সে যাহা পাঠ করিল, তাহাতে লজ্জায় কোন উত্তরই করিতে পারিল না। এই ভাবিয়া তাহার অনুশোচনা হইল, ইহার ইঙ্গিত সে পূর্ব্বে বহুবার টের পাইয়াছে। ইহার কথা বাদ দিয়া তাহার নিজের দিক হইতেও বটে, বেলাকে লইয়া অতীতে যে কাহিনী হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবৃতি করা মোটেই উচিত হয় নাই। এই গল্পের প্রতি অক্ষরটি আর একজনকে কত তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিয়াছে তাহা কে জানে ?

চন্দ্রা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, আমার মনের ভেতর তা হ'লে আপনি প্রবেশ করতে পারেন নি ?

ধীরেন মুগ্ধদৃষ্টিতে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু চন্দ্রা বলিতে দিল না, বাধা দিয়া কহিল, আর গল্প নয়, খুব হ'য়েছে, যান এইবারে একটু বেড়িয়ে আসুন। সন্ধ্যে হ'য়ে এলো ব'লে। বলিয়া সে কাপটা লইয়া চলিয়া গেল।

ধীরেন একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, জীবনে আবার এক সমস্যা সমাধানের সময় আসিয়াছে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জামাটা গা'য়ে দিয়া বাহিরে আসিতেই দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, রাজেন বাবু দরজার একটু দূরেই ভাঙ্গা টুলটায় বসিয়া আছেন। এখনই আসিয়া বসিলেন, না আগে হইতেই বসিয়া আছেন, কিছুই বোঝা গেল না। তাহারা নেহাৎ মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল না, রাজেনবাবু যদি পূর্ব্বেই আসিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের কথার কিছু কিছু শুনিয়াছেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া রাজেনবাবু কহিলেন, বেড়াতে যাচ্ছো?

ধীরেন নিদারুণ লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

রাজেনবাবু বলিলেন, চলো আমিও যাই। একসঙ্গেই একটু ঘুরে আসি। কোন কাজ নেই ত'?

ধীরেন বলিল, না।

৬

সন্ধ্যার তখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু গ্রামে ইহারই মধ্যে আলোর শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া গিয়াছে। বন জঙ্গল হইতে ধীরে ধীরে অন্ধকার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা বড় পুকুর আছে, তাহার ধারে প্রকাণ্ড একটা বট গাছের শাখায় নানা পক্ষী আশ্রয় লাভের আশায় কোলাহল করিতেছিল। উভয়ে নীরবে এই স্থানটা পার হইয়া আসিলে রাজেনবাবু প্রথম কথা কহিলেন, বলিলেন, পুলিশ যা' কাণ্ড-কারখানা করছে, তাতে এ গ্রামে তোমাদের বেশীদিন কাজ করতে দেবে ব'লে ত' মনে হয় না।

ধীরেন বলিল, পুলিশ এ-রকম কাণ্ড-কারখানা করবে, এ ত' জানা কথা। শুধু এই কারণেই যদি কাজ বন্ধ করতে হয়, তবে দেশে কোথাও কাজ চলে না। একটু থামিয়া বলিল, কত জায়গায় পুলিশ কত কি করে। কিন্তু তাই ব'লে ত' কাজ বন্ধ হয় না।

রাজেনবাবু বলিলেন, তা হয় না। দেশের সব কাজ ত' আর নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। পুলিশের বাধা দেওয়াটা এ সব কাজে খুবই স্বাভাবিক। সব দেশেই হয়ে থাকে।

ধীরেন বলিল, সব দেশেই হ'য়ে থাকে?

রাজেনবাবু বলিলেন, হ'য়ে থাকে বৈকি! স্বাধীন দেশের লোকদের এত স্বাধীনতা আমরা দেখতে পাই, কিন্তু এ-সব কি অমনি পেয়েছে তারা? কত বিবাদ, কত সংঘর্ষ করতে হ'য়েছে। কত শত লোক জেলে গিয়ে মরেছে। তবু তাদের নিজেদের দেশের লোকই রাজা ছিল। আসল কথা কি জানো? ইংরেজীতে যাকে বলে রাইট, অর্থাৎ অধিকার, এই অধিকার জ্ঞানটিই আসল। এইটেই জাগাতে হবে। নইলে পুলিশ এ করছে, ও করছে; বললে কিছুই হবে না। পুলিশ আর কি? ওরাই ত' রাজা নয়!

ধীরেন বলিল, কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে ত' আমাদের তুলনা চলে না? তারা পরাধীন নয়। তাদের নিয়ম-কানুন বদলাতে বেশী সময় লাগে না। রাজ্য-শাসন করতে তাদের নিজেদের লোকই যায়।

রাজেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, আসল গলদ ওইখানেই। কিন্তু এ গলদ হ'য়েছে বহু পাপের ফলে। এক কথাতেই কি এটা মিটতে পারে? অনেক বাকী।

ধীরেন একটু ভাবিয়া বলিল, আসল গলদ যে ওইখানেই তা কেউ অস্বীকার করবে না। পাপও হয় ত' আছে। কিন্তু এর প্রতীকার কবে হবে?

রাজেনবাবু বলিলেন, ঐ যে বললুম, ধীরেন, এখনও বাকী আছে। এসব বহু পাপের ফল। সমাজে, আচারে, ব্যবহারে কত পাপ লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা আছে? লোকে মানুষ হ'ক্, দেখবে সব আসবে। নইলে শুধু চীৎকার করলে কিছু হবে না।

ধীরেন একটু আহত হইয়া বলিল, তা হ'লে এখন যা কিছু হচ্ছে, সবই কি বৃথা? এর কি কোনই উপকার নেই।

রাজেনবাবু বলিলেন, আছে বৈ কি! এতে মোহ না কাটুক, একটা চটক্ লাগবে ত' নিশ্চয়ই। বলিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, দেশের একজন লোক আর একজনের ওপুর শাসন করছে কেন জানো? মোহে পড়ে। বাঁদর নাচ দেখেছো ত'? একটা বুড়ো সাজে, একটা বুড়ী সাজে। বুড়ো বুড়ীকে কত মারই না মারে! কিন্তু কেন এমন করে জানো? ঐ পোষ মানানোর কায়দা! দড়ি টানলেই একটা বুড়ো হয়, আর একটা বুড়ী হয়। একটুও ইতস্ততঃ করে না। এও তাই। একদল লোক দেশের শাসক সেজেছে, আর একদলকে শাসন ক'রে ভাবছে, ওঃ, কি শাসনটাই না করছি! কতই ক্ষমতা! কিন্তু নাকে যে দড়ি আছে, মোটেই টের পায় না। মনের ভুল আর কি! বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ধীরেন সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আপনি কতদূর পড়েছেন?

রাজেনবাবু সকৌতুকে প্রশ্ন করিলেন, কেন বল ত'?

ধীরেন কোন উত্তর করিল না, নিজের এই অনধিকার প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজেনবাবু কি ভাবিয়া একটু হাসিলেন, কহিলেন, পড়া বেশীদূর নয়, বি, এ, পর্য্যন্ত। কিছুদিন এম, এ,ও প'ড়েছিলুম কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যেতে, তাঁর সঞ্চিত টাকাগুলো ব'সে ব'সে খাবার জন্যে লেখাপড়া ছেড়ে পথ সুগম ক'রে রাখলুম। আর টাকাগুলোরও যেন হাত-পা বেরুল,—তারা সুড় সুড় ক'রে সিন্ধুক, ব্যাঙ্ক, সব জায়গা থেকে যে কেমন করে বেরিয়ে যেতে লাগলো, বলতে পারি না।

ধীরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, গ্রামের লোকের কাছে আপনার নামে কত কথা শুনেছি, বলবার নয়। কিন্তু আপনি যে একজন গ্র্যাজুয়েট, তা এই প্রথম শুনলুম। ছিঃ ছিঃ লোকগুলো এমনি নিন্দে করতে পারে।

রাজেনবাবুর মুখের ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু অন্ধকারে ধীরেন তাহা লক্ষ্য করিল না। সে বলিয়াই চলিল, যখন আমরা প্রথম আপনার আশ্রয়ে যাই, লোকেরা সকলে নিষেধ করলে; বললে, আপনার মত খারাপ লোক এ অঞ্চলে আর দু'টী পাওয়া যাবে না। অথচ আশ্রয় দেবার ক্ষমতা কারুর নেই,—শুধু কথা বলার ক্ষমতা প্রচুর।

রাজেনবাবু সহসা বলিলেন, চলো, ফিরি।

রাজেনবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধীরেনের কানে বাজিল। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভাবিল, ইঁহার চরিত্র আলোচনা করায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাই সে কুণ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, হ্যাঁ, চলুন।

উভয়ে সেই পথ ধরিয়া যখন বড় পুকুরটার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, রাজেনবাবু সহসা প্রশ্ন করিলেন, এখন তুমি কি ক'রবে ?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধীরেন বলিল, এখন ত' বাড়ী ফিরছি। আপনার কি কোথাও কাজ আছে ?

রাজেন বাবু বলিলেন, না, আমি তা ব'লছি না। তোমাদের আশ্রম ত' ভেঙ্গে গেল, কাজও নেই বল্লেই হয়, এখন গ্রামেই থাকবে, না বাড়ী ফিরে যাবে ?

ধীরেন বলিল, কি যে ক'রবো, কিছু ঠিক ক'রে উঠতে পারছি না। নরেশের একটা চিঠির অপেক্ষা করছি, কিম্বা সে যদি নিজে আসে, সব সমস্যা মিটে যায়। আর বাড়ী যাওয়ার কথা বলছেন, আমিও একবার যাবো ব'লে ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনাকে ব'লতে বাধা নেই,—একবার সেখানে গেলে মধুচক্রে ঢিল পড়বে। আর কোনদিন যে ফিরে আসতে পারবো, তার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই চুপ করে প'ড়ে আছি।

রাজেন বাবু স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, যতদিন ইচ্ছে তুমি আমার কাছে থাকো। এত' তোমার নিজেরই বাড়ী। নয় কি ?

ধীরেন কোন উত্তর করিল না, কিন্তু তাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আরও কিছুদূর অতিক্রম করার পর রাজেন বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্রার সম্বন্ধে কি করা যায় বল ত' ?

ধীরেন এ প্রশ্নেরও কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না।

আন্দাজে একটা কিছু ভাবিয়া লইয়া বলিল, বোর্ডিংএ পাঠানো নিয়ে বলেছেন ত' ?

রাজেন বাবু বলিলেন, কতকটা তাই বৈকি ! তা ছাড়াও কথা আছে। ওর বয়েস ত' হচ্ছে, বিয়ে-থা'র জোগাড়-সোগাড় করতে হবে ত'। আর বোর্ডিংএ পাঠানোটা কি উচিত হবে ?

প্রশ্ন অতি সাধারণ এবং অর্থও অতি সরল। কিন্তু এই সাধারণ ও সরল প্রশ্নে ধীরেনের কর্ণমূল অবধি লাল হইয়া উঠিল। অন্ধকার সত্ত্বেও সে রাজেনবাবুর দৃষ্টি হইতে মুখটা একদিকে ফিরাইয়া রাখিল, নিদারুণ লজ্জায় একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

রাজেনবাবু পুনরায় কহিলেন, বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা যা লেখা-পড়া শেখে, তা ওরং যথেষ্টই হ'য়েছে। রূপও একটু-আধটু আছে, গান বাজনাও মন্দ জানে না। সাধারণ মেয়ের পক্ষে আর কি দরকার বল' ?

ধীরেন এবারেও কোন উত্তর করিতে পারিল না।

রাজেনবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার চুপ ক'রে থাকলে চলবে কেন ? আমার কথার উত্তর দাও ! ব্যাটাছেলের আবার লজ্জা কি ?

ধীরেন কোনমতে বলিল, আপনার মেয়ে খুবই ভাল।

রাজেনবাবু বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, আমার মেয়ের বয়েস হ'য়েছে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমাকে মেনে চলতে হবে। তার মনের ভাব ত' তোমার কাছে

অস্পষ্ট নয়, এখন বল ত', সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কিছু করা উচিত?

রাজেনবাবু যে কি ইঙ্গিত করিয়া কথাগুলো কহিতেছেন ধীরেন তাহা বুঝিল না, শুধু চুপ করিয়া থাকার অপরাধে অপরাধী হইবার ভয়ে বলিল, না, তা ত' নয়ই।

রাজেনবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, কিন্তু এ ত' শুধু একা আমার ওপরই নির্ভর করছে না। ধীরেন আন্দাজ করিয়াও উত্তর দিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইল না।

ক্ষণকাল পরে রাজেনবাবুই স্পষ্ট করিয়া কহিলেন, তার মনের ভাব তুমি নিশ্চয়ই জানো। আর তোমারও মনোভাব আমার কাছে একেবারে অবিদিত নয়। এখন ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝে একটা উপায় ঠিক করতে হবে। জান ত' ইচ্ছা থাকলেই উপায়ের ভাবনা থাকে না? সব নির্ভর করছে তোমার মনের জোরের ওপর। যে দেশের কাজ করতে বাড়ী ঘর ত্যাগ ক'রে এসেছে, তার যে এইটুকু মনের জোর আছে, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বলিয়া তিনি পরিপূর্ণ ইঙ্গিতের সহিত ধীরেনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন।

ইহার চেয়ে স্পষ্টতর আর কিছুই হইতে পারে না। ধীরেনের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সহসা একটা পর্দ্দা উঠিয়া গেল। বুঝিতে তাহার কিছুই বাকী রহিল না। কিন্তু একমুহূর্ত্তে কেমন বিহ্বল হইয়া গেল, কিছুই ভাবিতে পারিল না। এই একই নিমেষে অদ্য বৈকালের চিত্র তাহার মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে

পড়িল, রাজেনবাবু অদূরেই বসিয়াছিলেন, তাহাদের সমস্ত কথাই হয় ত' শুনিয়াছেন। লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর আর একবার কাঁটা দিয়া উঠিল।

রাজেনবাবু বলিলেন, আমার একটু কাজ আছে, সেরে মিনিট দশেক পরেই যাচ্ছি। তুমি যাও।—বলিয়া তিনি বাঁ দিকের সঙ্কীর্ণ পথটা ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ধীরেন সেই স্থানেই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

৭

চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার লইয়া ধীরেন বহুক্ষণ একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ের মধ্যে কত কি সে ভাবিল, তাহার কোনই নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু যে প্রশ্নগুলি তাহার মাথায় আসিল, সেগুলি যেমন নির্দ্দিষ্ট, তেমনই সংক্ষেপ।

সব চেয়ে বড় প্রশ্ন তাহার মনে হইল, ইহার পর কি করা যায়? এতদিন যেমন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, রাজেন বাবুর এই স্পষ্টোক্তির পর আর তেমনভাবে চলিতে পারে না। এমনি আর নিশ্চিন্ত-আয়াসে চন্দ্রাকে সম্মুখে রাখিয়া দিন কাটিতে পারে না। হয় রাজেন বাবুকে স্পষ্টভাবে নিজের কথা বলিতে হইবে, নয় একদিন নিঃশব্দে সরিয়া পড়িতে হইবে। এই নিঃশব্দে সরিয়া পড়ার ঘৃণিত কল্পনাকে সে মুহূর্ত্তেই বিদায় দিল। কিন্তু নিজের কথা কি আছে যে রাজেন বাবুকে তাহা বলিবে? ধীরেন

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের অন্তরের কথা পড়িবার চেষ্টা করিল। নিজেকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল, সে কি চন্দ্রাকে ভালবাসে?

স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না। কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। রাজেনবাবুর দ্বারা এই অতর্কিত আলোক-পাত না ঘটিলে ইহার উত্তর হয়ত' আপনই মন হইতে বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু আজ মনের কোন হিসাবই যেন পাওয়া গেল না। তাই বলিয়া ব্যাপারটাকে ফেলিয়া রাখাও চলে না। কিন্তু করিবারই বা কি আছে? যদি সে চন্দ্রাকে ভালই বাসে, তা হইলেই বা কি করা যায়? চন্দ্রাকে বিবাহ!

এই বিবাহের কল্পনায় ধীরেনের চিন্তা-ধারা যেন কেমন হইয়া গেল। সমস্ত ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়া আনন্দের এক ক্ষীণ ফল্গুধারা তাহার মনের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। ইহার প্রবাহ সে অনুভব করিল, এবং একটু বিস্মিতও হইল। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিল না। শুধু বাহিরের দিক হইতে যে সমস্ত সমস্যা জড়াইয়া থাকিতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। পিতার ঘোরতর আপত্তি, স্বদেশ-সেবা করিতে আসিয়া প্রণয় করার জন্য বন্ধুদের টিট্‌কারি, সর্ব্বোপরি বিমাতার প্ররোচনায় পিতা কর্ত্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়া, কোনটাই তাহার চিন্তা হইতে বাদ পড়িল না। এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ওই একটি জিনিষই দেখিতে হয়, সত্যই সে চন্দ্রাকে ভালবাসে কিনা,—এবং ভালবাসিলে সে ভালবাসার পরিমাণ

এতখানি কিনা, যে এত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তাহা অটল হইয়া থাকিবে।

চিন্তা করিতে করিতে ধীরেন কখন হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাজেনবাবুর গৃহের কাছাকাছি আর একটা রাস্তা আছে, সেই পথ ধরিয়া একজন লোক আলো-হাতে এই দিকেই আসিতেছিল, ধীরেনকে দেখিয়া থামিয়া বলিল, কে, দাদা-বাবু নাকি?

ধীরেন বলিল, হ্যাঁ, কেন?

লোকটা বলিল, প্রণাম হই, দাদাবাবু, একটু কাজ আছে—তাই আপনার কাছে আসছিলুম।

ধীরেন বলিল, কি কাজ?

লোকটা বলিল, আজ আমাদের একটা মিটিং বসবে ঠিক ছিল কিনা,—তা দিনে সময় হয় না, তাই রাত্তিরেই সেটা হ'চ্ছে। মোড়লের ওখানে সকলেই জুটেছে, শুধু দীনুর ছেলের অসুখ ব'লে আসতে পারলে না, আর গয়লা পাড়ার দু'শালা,—মেধো আর রেমো মদ খেয়ে প'ড়ে আছে। ওরাও আসবে না। এখন আপনাকে সকলে ডাকছে,—আজ ভারী জরুরী কথা আছে সব।

এইরূপ সভা-সমিতি মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে এবং ধীরেন তাহাতে যোগও দেয়। কিন্তু ইহাতে কাজ কিছুই হয় না। তাহার ইচ্ছা হইল, বলে, সে যাইবে না। কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

বাহিরে যাইবার সময় সে র‍্যাপারটা লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল,

তাই শীত অনুভব করিতেছিল। এখন সেটা আনিতে যাইয়া ভাবিল, ভালই হইয়াছে, এই সভার দরুণ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও চন্দ্রার সহিত মুখোমুখী হওয়ার সমস্যা হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

ভাবিয়াছিল ঘরের মধ্য হইতে আলোয়ানটা লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিবে। কিন্তু যাহার জন্য এত ভাবনা, ঘর হইতে বাহির হইবার সময় ঠিক তাহারই সম্মুখে পড়িয়া গেল। চন্দ্রা বলিল, একি, আবার চল্লেন কোথায়?

ধীরেন মুখ তুলিল না, কোনমতে বলিল, একটা মিটিং আছে।

চন্দ্রা বলিল, কখন ফিরবেন?

ধীরেন বলিল, শীগ্‌গীরই।

ধীরেনের এই কুণ্ঠা চন্দ্রার দৃষ্টি এড়াইল না। ইহার কারণ সম্বন্ধে কি ভাবিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, কতদূর গিছলেন? ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বসুন না, মিটিং ত ঘোড়ায় চ'ড়ে ব'সে নেই!

ধীরেন বসিল না, কহিল, বেশীদূর যাইনি।

চন্দ্রা তেমনি মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, বাবার সঙ্গে গল্প করছিলেন বুঝি? কি গল্প হ'ল?

ধীরেন টানিয়া টানিয়া বলিল, ও বিশেষ কিছু না।

চন্দ্রা বলিল, আচ্ছা যান, কিন্তু শীগ্‌গীর ফিরবেন।

আচ্ছা, বলিয়া ধীরেন বাহির হইয়া গেল।

ধীরেন উক্ত সভাস্থলে গিয়া দেখিল, সভায় লোক ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছে। এত লোক-সমাগম দেখিয়া সে একটু আনন্দিত হইল, এবং এও বুঝিল, অদ্যকার সভায় একটা কিছু জরুরী প্রশ্নেরই আলোচনা হইবে। কিন্তু সভার কারণ সম্বন্ধে যাহা শুনিল, তাহাতে সে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল।

সহর হইতে আগত ভদ্র সন্তানদের সংস্পর্শে আসিয়াই হ'ক, বা অন্য কারণেই হ'ক, ইদানীং গ্রামের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু একটু আলোক প্রবেশ করিতেছিল। ফলে তাহাদের মধ্যে তাহাদের শক্তির পরিমাণ লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনাও চলিত। এরূপ আলোচনার কারণও ছিল। নমঃশূদ্র ও মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ই গ্রামে চাষ করে। বার দুই এই দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ ও মারামারি ঘটে এবং প্রতিবারই মুসলমানেরা সংখ্যাধিক ও শক্তিশালী নমঃশূদ্রের কাছে হারিয়া যায়। বাবুরা এই পতিত সমাজটিকে উন্নত করিবার আশায় যখন-তখন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, তোমাদের শক্তি কত, ইহা হইতেই বুঝিতে পারো। তারপর দেশ-বিদেশের নানা কাহিনীও তাহারা শুনিত।

এমনি সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। এই গ্রামেরই জনৈক নমঃশূদ্রের সন্তান সহর হইতে আই-এ পাশ করিয়া, গ্রামে আসিয়া হিন্দু-সমাজ শিরোমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পথে দেখিয়াও সরিয়া দাঁড়ায় নাই, পাশ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন স্নানান্তে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। নমঃশূদ্র সন্তানের এবম্বিধ অপরাধে, সেইদিনই

অশ্বত্থ-তলায় এক সভা বসে এবং অপরাধীকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। কিন্তু অপরাধী আসিল না, উপরন্তু সকলের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। রসাতল-গমনোন্মুখ সমাজটিকে রক্ষা করিবার জন্য সমাজ-পতিদের ভাবনার অন্ত রহিল না। তাঁহারা বিধিমতে সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কোন্ মতেই এই দুর্ব্বিনীত বালকটিকে জব্দ করিতে পারিলেন না।

অবশেষে তাঁহারা শেষ অস্ত্র ছুঁড়িলেন। সহসা একদিন দেখা গেল, নমঃশূদ্র পুঙ্গবটির নামে আদালত হইতে পরওয়ানা আসিয়াছে। মোকদ্দমা চলিল, গ্রামের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই হলপ্ করিয়া কহিলেন, এরূপ ছেলে গ্রামে থাকিলে গ্রামে শান্তি-রক্ষা চলিতেই পারে না। মোকদ্দমায় সমাজ-পতিরাই জিতিলেন। ছেলেটির আর গ্রামে থাকা চলিল না, চাকরী করিবার ওজুহাতে সে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু পলাইবার আগে সম্প্রদায়ের সবকে একেবারে জ্বালাইয়া দিয়া গেল।

তাহারই ফলে অদ্যকার সভার আহ্বান হইয়াছে। নমঃশূদ্রেরা মুসলমানদের সহিত মিলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে, ইহারা কেহই ভদ্র বাবুদের কাজ করিবে না। তাঁহারা নিজেদের চাষ নিজেরাই করুন, নিজেদের কাজকর্ম্ম নিজেরাই দেখুন। যদি তাহা তাঁহারা না পারেন, তবে একমাত্র এই সর্ত্তে সন্ধি হইতে পারে, নমঃশূদ্রকে সমাজে তুলিয়া লইতে হইবে, ইহাদের জল আচরণীয় করিতে হইবে এবং উপরন্তু একই নাপিত ভদ্র ও নমঃশূদ্র সকলকেই কামাইতে পারিবে। এখন এই স্থিরীকৃত

বিষয়গুলি সভায় পাকা-পাকি করিয়া লইতে হইবে। জন-তিনেক মুসলমানও তাহাদের সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ সভায় যোগ দিয়াছে।

ধীরেনকে সভাপতি করা হইল এবং অভাব-অভিযোগ তাহার কর্ণগোচর করিয়া, এ সম্বন্ধে তাহার মত কি জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া রহিল। ধীরেনকে এই অধঃপতিত জাতিটি শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত। তাহার মতামতের মূল্যও ইহাদের নিকট কম নয়। কিন্তু আজকের সত্যকার সমস্যার দিনে সে কি মত প্রকাশ করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ইহাদের নিকট সে বহুবার সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু এত শীঘ্রই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিবে, তাহা মোটেই ভাবে নাই। একতাবদ্ধ হইলে ইহাদের উৎসাহ ও শক্তি যে কতখানি বাড়িয়া উঠিতে পারে, আজকের গতিধারা দেখিয়া সে এই প্রথম অনুভব করিল। ইহারা কিছু একটা করিবেই, সে যদি বিপক্ষে মত দেয়, তাহা হইলেও ইহারা নিরস্ত হইবে না, ইহাও সে নিঃসংশয়ে বুঝিল। মনে মনে সে আনন্দিতই হইল এবং একপ্রকার গর্ব্বও অনুভব করিল; কিন্তু প্রকাশ্যে এই বিদ্রোহে মত প্রকাশ করিতে সাহস করিল না,—বলিল, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। যদি তাহারা বাস্তবিকই একতাবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে নিজেদের অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহারা অগ্রসর হউক,—ইহাতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

এমনি করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, হাঁ, না, কোনটাই না বলিয়া সে তাহার মত প্রকাশ করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে বার বার সাবধান করিয়া দিল, যেন তাহারা উত্তেজিত হইয়া কোনরূপ বে-আইনী কাজ না করে। এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে অশিক্ষিত লোকগুলি তাহাদের সপক্ষে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গেল, অবিলম্বেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ কাল হইতেই এই বৈশ্যজাতি আর কাহারও দাস থাকিবে না।

সভা যখন শেষ হইল তখন রাত্রি অনেক। একজন লোক বলিল, লণ্ঠনটা নিয়ে আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি, দাদাবাবু?

বাহিরে নিবিড় অন্ধকার ও অদূরের মসীময় ঝোপ-ঝাপ-গুলোর প্রতি চাহিয়া সে শুধু বলিল, হ্যাঁ, চলো।

ভাবিয়াছিল, বাড়ীর দোরে ডাকা-ডাকি করিয়া না জানি কত হাঙ্গামাই করিতে হইবে। সমস্ত পথটা সে শুধু ইহাই ভাবিয়াছে। কিন্তু দোরে সমান্য একটু ধাক্কা দিতে দেখিল তাহা খোলাই আছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লোকটিকে বলিল, এবারে তুমি যাও।

লোকটা চলিয়া গেল।

ধীরেন দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া জুতার শব্দ হইবার ভয়ে পা টিপিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল! কিন্তু কিছুদূর গিয়াই বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল।

দেখিল, চন্দ্রা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া মোড়াটার উপর বসিয়া আছে। সম্মুখে আলোটা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে।

পদশব্দে চন্দ্রা মুখ তুলিয়া চাহিল এবং ধীরেনকে দেখিয়া বলিল, এসেছেন? রাত্তির কত হ'ল জানেন? বারোটা বেজে গেছে। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন আবার?

ধীরেন নিকটে আসিয়া বলিল, তোমার বাবা কোথায়, চন্দ্রা?

চন্দ্রা বলিল, বাবা ঘুমুচ্ছেন। নিন, আর দেরী করবেন না, খেতে বসুন।

চন্দ্রা উঠিয়া ভাতের ঢাকা খুলিয়া আহার্য্য সাজাইয়া দিল।

ধীরেন র্যাপারটা শয্যার উপর ফেলিয়া আসনে বসিতেই চন্দ্রা বলিয়া উঠিল, নাঃ, আপনাকে নিয়ে আমার চলবে না দেখছি। রাত-দুপুর পর্য্যন্ত ত' চাষাদের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, হাত-মুখটা যে ধুয়ে খেতে হয় তাও কি আমাকে ব'লে দিতে হবে? থাক্, আর বাইরে যেতে হবে না, আমি জল এনে দিচ্ছি।

আহারে বসিয়া ধীরেন বলিল, তুমি এত রাত্তির পর্য্যন্ত আমার জন্যে জেগে ব'সে আছো?

চন্দ্রা বলিল, অতিথি-মানুষ, সৎকার করতে হবে ত'?

কিছুক্ষণ পরে ধীরেন বলিল, তোমার খাওয়া হ'য়েছে ত' চন্দ্রা?

চন্দ্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ধীরেন সবিস্ময়ে বলিল, এখনও পর্য্যন্ত খাওনি?

চন্দ্রা বলিল, পাতে দুটী প্রসাদ পাবো ব'লে ব'সেছিলুম। বলিয়া সে আলোর দিক হইতে হাস্যোজ্জ্বল মুখটা ফিরাইয়া রহিল।

ড়—

ধীরেন লজ্জায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

চন্দ্রা বেশ সহজভাবেই বলিল, হাত গুটুলেন কেন? শীগ্‌গীর শেষ করুন, আর কত রাত্তির পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখবেন?

ধীরেন আরও কিছু আহার করিয়া বলিল, রাত্তির হ'য়েছে, আর খাবো না।

বাহির হইতে মুখ-হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, চন্দ্রা এঁটো বাসনগুলো পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া লইতেছে। আহতকণ্ঠে কহিল, এসবগুলো কাল সকালে ঝী এসে করতে পারতো না?

চন্দ্রা বাসনসমেত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, পারতো, কিন্তু রাত্রে এর থেকে দুর্গন্ধ উঠতো।

ধীরেন বলিল, তা ব'লে তোমাকেই এ-সব করতে হবে?

চন্দ্রা বলিল, একদিন করতে হবে বৈকি! এখন থেকে অভ্যেস ক'রে রাখছি। এইবার শুয়ে প'ড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। বলিয়া চন্দ্রা হস্তস্থিত বাসনগুলোর শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৮

সকাল-বেলাটা প্রায় প্রত্যহই সুশীলবাবু বেলাকে সঙ্গে লইয়া আহারে বসিতেন। আজও উভয়কে খাইতে দিয়া ক্ষান্তমণি অদূরে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

সুশীলবাবু এক সময়ে বলিলেন, বেলা শুনেছিস্?

বেলা বলিল, কি বাবা?

সুশীলবাবু বলিলেন, নরেশের জেল হ'য়েছে।

ক্ষান্তমণি একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু অন্যের আহারের সময় এবম্বিধ শোক-প্রকাশটা মোটেই শোভনীয় নয় মনে পড়ায় তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

এক মুহূর্ত্তে যেন কি একটা ঘটিয়া গেল।

বেলা স্তব্ধ হইয়া নির্ব্বিকার আহার-লিপ্ত পিতার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল, কি কারণে জেল হ'ল?

সুশীলবাবু বলিলেন, পিকেটিং কর্‌ছিল।

বেলা কাগজে দেখিয়াছিল এবং শুনিয়াওছিল, পিকেটিং করার অপরাধে যাহারা অপরাধী হইয়া আদালতে অভিযুক্ত হয়, তাহাদের সাত-আট দিন, কি বড় বেশী পনের দিন, কারাবাস হইতেছিল। একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, কদিনের জন্যে জেল হ'ল?

সুশীলবাবু বলিলেন, দশ দিন।

আর কোন কথা হইল না। বেলার গলা দিয়া আর এক গ্রাস ভাতও যেন গলিতে চাহিল না। কিন্তু পিতার সম্মুখে বসিয়া আহার ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যাইতেও পারিল না।

এমনি করিয়া আহার শেষ হইলে বেলা উপরে গিয়া বসিল। শিক্ষা-মন্দিরে যাইবার কোন উপক্রমই করিল না। চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, গাড়ী আসিলে সে যেন বলিয়া দেয় আজ সে যাইতে পারিবে'না।

সুশীলবাবু যথারীতি আফিসের সাজ-সজ্জা করিলেন। মোটর আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতে লাগিল। তিনি পকেট হইতে নরেশের সংবাদবাহী পত্রখানি বাহির করিয়া একবার আদ্য-পান্ত পড়িলেন, পরে সেটাকে ভাঁজ করিয়া পুনরায় পকেটে রাখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

শীতের অপরাহ্ন বেলায় রৌদ্র গড়াইয়া পড়িতেছিল। বেলা জানালায় মাথা রাখিয়া বাহিরের মাঠটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এই মাঠটায় লোক চলাচল খুব কম, বিশেষ এই সময়টায় কেহই এ পথে আসে না। একটা গরু ইতস্ততঃ চরিতেছিল, তাহার অলস-দৃষ্টি ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ফিরিতেছিল।

ভাবনারও কোন নির্দ্দেশ ছিল না। কিন্তু অন্তকার দুঃসংবাদে তাহার সর্ব্ব মন ব্যাপিয়া যে একটা ভার চাপিয়াছিল, দৃষ্টির অনুরূপ তাহার মনও এই দুর্ভারটির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

সহসা তাহার দৃষ্টি যেন আহত হইয়া একজনের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। দেখিল, আশা মাঠটা কোণাকোণি পার হইয়া তাহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে। কাছাকাছি আসিয়া আশা মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর আরও নিকটে আসিয়া অদৃশ্য হইল। বেলা নিজেকে গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছু পরেই আশা ঘরে ঢুকিল। বেলা মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু কিছুই বলিল না। আশা বোধ হয় এইরূপই আশা করিয়াছিল। সে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না, বেলার পাশে বসিয়া কহিল, আজ সেলাই শিখতে যাও নি, না?

বেলা সংক্ষেপে বলিল, না।

তারপর বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। কিন্তু নীরবে পাশা-পাশি বসিয়া থাকাও চলে না। বেলাই প্রথম নীরবতা ভাঙ্গিল, বলিল, দাদার জেল হ'য়েছে, শুনেছো?

আশা বলিল, শুনেছি।

বেলা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কার কাছে শুনলে?

আশা বলিল, কাগজে বেরিয়েছে, বাবা পড়ে বলেছেন।

এ-আলোচনা আর চলিল না এবং অন্য আলোচনাও কেহ আরম্ভ করিল না। একটা দুশ্ছেদ্য নীরবতা উভয়কে ঘেরিয়া রাখিল।

বেলা সহসা এক সময়ে যেন দুঃস্বপ্ন ঝাড়িয়া ফেলিল, একটু উচ্চকণ্ঠেই কহিল, তোমাদের এত সকাল-সকাল ছুটী হ'ল ?

আশা বলিল, আজ স্কুলে যাই নি।

বেলা বলিল, কেন, স্কুল বন্ধ নাকি ?

আশা বলিল, না।

এ-মেয়েটি একান্ত অপারগ না হইলে স্কুল কামাই করে না, তাহা বেলা ভাল করিয়াই জানিত। তাই একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তবে ?

আশা কোন উত্তর করিল না।

বেলা এতক্ষণ ভাল করিয়া আশার দিকে চাহিয়া দেখে নাই, এইবার তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বলিয়া উঠিল, কি হ'য়েছে, আশা ? স্কুলে গেলে না কেন ? বাড়ীতে কিছু হয় নি ত' ?

বেলার এই উৎকণ্ঠাকুল প্রশ্নের উত্তরে আশা সংক্ষেপে নম্রকণ্ঠে কহিল, স্কুলে আর যাবো না।

বেলা বলিল, পড়া ছেড়ে দিলে নাকি ?

আশা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

বেলা ক্ষণকাল আশার আনত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কি হ'য়েছে খুলেই বল্ না, আশা ?

আশা তথাপি কোন উত্তর করিল না।

বেলা দুই-হাতে আশার মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আশা এতক্ষণ যাহা সংযত করিয়া

রাখিয়াছিল এইবার তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অকস্মাৎ তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বেলা গম্ভীর হইয়া বলিল, সেদিন তবে অমন কথা বল্‌লি কেন?

আশা উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসকে দমন করিবার চেষ্টা করিল না। বলিল, তিনি আজ অনেক দূরে, তাঁর বদলে আজ তোমার কাছেই ক্ষমা চাইতে এসেছি, ভাই।

বেলা সমস্ত রাগ-অভিমান ভুলিয়া গেল। মুহূর্ত্তে আশাকে প্রবল বেষ্টনে চাপিয়া বলিল, সেদিন তুই কেন এমন ছেলেমানুষী করলি, আশা? দাদা আজ জেলে ব'সেও কি সে-কথা ভুলতে পারছেন?

বক্ষের মধ্যে আর একজনের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়া আশাকে ছাড়িয়া দিয়া অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বেলা কহিল, আচ্ছা প্যান্‌প্যানে মেয়ে ত' তুই! সেদিন ভাবলুম, তোর মনে বুঝি একটু-আধটু তেজও আছে। আজ দেখছি, তুই এমনি ক'রেই মরবি। আর ভারি ত' দশ দিনের জেল! তার জন্যে আবার অমুক আর তমুক! নে, ওঠ্‌, চল্‌,—চুল-টুল বেঁধে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।

কাজ-কর্ম্ম এবং গল্প-গুজবের মধ্যে বাহিরের বিমর্ষতাটুকু কাটিতে বেশীক্ষণ সময় লাগিল না। কিন্তু এ-সকলের মধ্যে অন্তরের যে প্রচ্ছন্ন বেদনা উভয়কেই স্বাভাবিকতার পথে যাইতে বাধা দিতেছিল, দু'জনেই তাহা অনুক্ষণ অনুভব করিতে লাগিল।

বেড়াইতে বাহির হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই প্রসঙ্গই ফিরিয়া আসিল। বেলা বলিল, আয় পাগ্‌লামী করিস নি আশা, যা বলি শোন। তুই স্কুল ছেড়ে কি করবি? গাঁয়ে গিয়ে লেকচারও দিতে পারবি না, রাস্তায় বেরিয়ে পিকেটিংও করতে পারবি না।

আশা বলিল, আবার নিশ্চিন্ত-মনে লেখাপড়াও করতে পারবো না।

বেলা বলিল, তা না পারিস, করবি না। চিন্তাগ্রস্থ মন নিয়ে রোজ স্কুলের গাড়ীটায় চ'ড়ে যাতায়াত করতে পারবি ত'?

আশা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, না তাও পারবো না।

বেলা রাগিয়া বলিল, তবে কি পারবি?

আশা চুপ করিয়া রহিল।

বেলা বলিল, তুই যদি এমনি করিস, তোর বাবা কি বলবেন বল ত'? হাটের মাঝখানে এমনি ক'রে হাঁড়ি ভাঙ্গার কোন দরকার আছে কি?

আশা এবারেও কোন কথা কহিল না।

বেলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনোভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ যে পড়তে গেলি না, বাড়ীতে কি বললি?

আশা বলিল, তোমাকে যা বলেছি বাড়ীতেও ঠিক তাই বলেছিলুম।

বেলা সবিস্ময়ে বলিল, বাড়ীতে বলেছিস্ তুই আর স্কুলে যাবি না?

আশা বলিল, হ্যাঁ। কি, অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে?

মহেশ বাবু স্কুল-কলেজ ছাড়ার একান্ত বিরোধী এবং তাঁহারই নিকট আশার স্কুল-পরিত্যাগ করার প্রস্তাব করা কতখানি দুঃসাহসের কাজ হইয়াছে, বেলার বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার দাদার প্রতি এই মেয়েটির ভালবাসা কত গভীর, তাহাও তাহার অবিদিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া সামান্য অজুহাতে বড় বড় কথা টানিয়া এমনি একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করা বেলা কোন মতে সমর্থন করিতে পারিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া আশা পুনরায় কহিল, কি, রাগ করলে নাকি, ভাই?

বেলা বলিল, না রাগ করি নি, কিন্তু তুমি কাজটা ভাল কর' নি।

আশা বলিল, কোন কাজটা?

বেলা বলিল, কোন কাজ আবার? স্কুলে যাবো না, অমুক করবো না,—এসব ব'লে কেলেঙ্কারী করবার কি দরকার ছিল? যা হ'য়েছে, হ'য়েছে, কাল থেকে এ-সব পাগলামী আর করিস্ নি, বুঝ্‌লি?

আশা কি বুঝিল, ভাবে বা ভাষায় কিছুই বোঝা গেল না।

বেলা পুনরায় কহিল, কেমন কাল স্কুলে যাবি ত'?

আশা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

না? বেলা এইবার সত্যই বিরক্ত হইল, বলিল, তবে তুই যা

খুসী করিস ; আমার কাছে কিছু বলতে আসিস নি। রাত্তির হচ্ছে, চল ফিরি।

আশা খপ্ করিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, রাগ ক'রো না, ভাই, আমি কিছুতেই স্কুলে যেতে পারছি না। বাড়ীতেও এ-জন্যে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি, তবুও পারি নি। অন্ততঃ এই দশটা দিন আমাকে মাপ করো।

বেলা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আশার কণ্ঠস্বর তখনও তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। সহসা সে বেলার একটা হাত নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, তুই-ই আমাকে ক্ষমা কর, আশা। তোকে আমি ভুল বুঝেছিলুম।

আশা নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, কি যে বল, তার ঠিক নেই। এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে, চল' যাই।

ফিরিবার পথ একপ্রকার নীরবেই কটিল। নিতান্ত অসংলগ্ন ব্যতীত কোন কথাই হইল না। আশা সম্মুখে চাহিয়াই চলিল, কিন্তু বেলা এই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া বার বার আশার মুখটা দেখিয়া লইতে লাগিল।

পথে আশাদের বাড়ী প্রথমে পড়ে। সে বলিল, যাবে আমাদের বাড়ী ?

বেলা বলিল, তুই যা কাণ্ড ক'রে ব'সে আছিস, আমি গেলে মাসীমা ভাববেন, এসব বুঝি আমারই বুদ্ধিতে হচ্ছে।

আশারও ঠিক ইহাই ভয় ছিল। সে আর পেড়াপিড়ি করিল না।

৯

বাড়ী ফিরিয়া বেলার মনে আশার কথা বার বার জাগিতে লাগিল। ইহারই চিন্তায় অতকার দুঃসংবাদটা মনের একেবারে তলায় চাপা পড়িয়া গেল।

আশার সহিত তাহার পরিচয় বহুকালের। বাল্যকাল হইতে এই দুইজন সখিত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং উভয়কে উভয়ই অতি অন্তরঙ্গ-ভাবে চিনিয়াছিল। কিন্তু আজ বেলা নিজের মনে বলিতে লাগিল, সে আশাকে ঠিক চিনিতে পারে নাই। বাল্য-কৈশোরে মানুষকে চিনিবার কিছু থাকে না। সকলের অলক্ষ্যে যখন তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিন্দু বিন্দু করিয়া অনন্ত রহস্যের বারি সিঞ্চিত হইতে থাকে, তাহারই এক সময়ে অতি সরল লোকটি সহসা রহস্যময় হইয়া উঠে। এই সময়ই তাহাকে চিনিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই চেনা-পরিচয়ে মানুষের কত ভুলই না হয়! মন পদার্থটি যে

কত বড় দুর্জ্ঞেয়, ইহার ভিতর দৃষ্টিপাত করিতে গেলে কতখানি অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, কেবল এই সময়েই বুঝা যায়।

বেলা ভাবিয়াছিল, সে আশাকে চিনিয়াছে। তাহার দাদাকে আশা ভালবাসে, হয় ত' একটু বেশী করিয়াই ভালবাসে, ইহাও সে জানিত। যেদিন আশা নরেশের কলেজ পরিত্যাগের ব্যাপার লইয়া এই ভালবাসার অপমান করিল, সেদিনও সে খুব বেশী বিস্মিত হয় নাই। বয়স হইলেও আশার মধ্যে যথেষ্টই ছেলে-মানুষী আছে, অনভিজ্ঞতার দম্ভও আছে, সুতরাং এরূপ কাজ সে করিয়া বসিতে পারে। যেদিন বুঝিতে পারিবে, অনুতপ্তচিত্তে সেদিন সে নিজেই ফিরিয়া আসিবে। আজ দুপুরে বেলা ঠিক তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু ইহারই কয়েক ঘণ্টা পরে আশার যে মূর্ত্তি সহসা তাহার সম্মুখে প্রকটিত হইয়া পড়িল, তাহাতে তাহার ধরণা ও চিন্তা আমূল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। আশার এ-ভাব সে কোনদিন দেখে নাই, কোনদিন দেখিবে বলিয়া কল্পনাও করে নাই। আবেগের বা উচ্ছ্বাসের অতিরিক্ততা নাই, অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ব্যাকুল-ঐকান্তিকতার এক অনাবিল মূর্ত্তি তখনও সে যেন মনশ্চক্ষুতে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল।

আশার নিজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে-যে ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা লইয়া বেলা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িল। ভবিষ্যত এখনও অনাগত, তাহার চিন্তা পরে চলিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমানে আশার ব্যবহারে তাহার মা-বাপ কি ভাবিতেছেন, তাহা ভাবিয়া

দেখিতে হয়। ইহা শুধু আশার দিক হইতে নয়, তাহার দাদার দিক হইতেও বটে। আশা কি কারণে ঠিক এই দিন হইতে স্কুল ছাড়িতে সঙ্কল্প করিল, তাহা তাঁহাদের নিকট জলের মত স্পষ্ট হইয়া আছে। এ ব্যবহার তাঁহারা কোনদিনই অনুমোদন করিবেন না। নরেশের সহিত আশার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই কথাটা এক প্রকার ঠিকই হইয়া ছিল। কিন্তু তখন হয় ত' তাঁহারা নরেশ সম্বন্ধে অন্য ধারণা করিয়াছিলেন। হয় ত' ভাবিয়াছিলেন, নরেশ পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আরও বেশী পড়িবে; তারপর এককালে সম্মানের সু-উচ্চ শিখরে উঠিয়া তাঁহাদের কন্যাকে সেই শিখর-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত করিবে। আজ হয়ত' তাঁহাদের সে ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নরেশের জেল হওয়াটা বোধহয় [illegible] বলিয়াই ভাবিয়াছেন। ইহার পর নরেশের হাতে মেয়ে দিতে সম্মত না হইতে পারেন। আশার রূপ-গুণ কোনটারই অভাব নাই, চেষ্টা করিলে আরও ভাল পাত্রই পাইবেন।

কিন্তু আশার দিকে কি ঘটিতে পারে? আজ সন্ধ্যায় সে তাহার সুদৃঢ় চিত্তের যে পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া এবং ইহারই ভবিষ্যত কতদূর গিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া বেলা শিহরিয়া উঠিল। তারপর একসময়ে সমস্ত চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া নিজেই কহিতে লাগিল, এতখানি হইতে পারে না; সে যত জটিল করিয়া

ব্যাপারটা দেখিতেছে,—আসলে হয় ত' জলের মত সব মিটিয়া যাইবে।

এমনি করিয়াই বেলা সেদিন নিজের মনে সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিল।

সাতদিন পরে তেমনি একদিন আহারে বসিয়া সুশীলবাবু বেলাকে কহিলেন, নরেশ কাল ছাড়া পেয়েছে, বেলা।

ক্ষান্তমণি সংবাদটা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখ আনন্দে আরক্তিম হইয়া উঠিল।

প্রথম যেদিন বেলা দাদার জেল সংবাদ শোনে, সেদিন যেমন অসহ্য বেদনায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অন্নের গ্রাস কিছুতেই মুখে তুলিতে পারে নাই, আজও আনন্দের আতিশয্যে ঠিক তেমনই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

এই আতিশয্যটা কমিয়া গেলে বলিল, দাদার দশ দিন জেল হ'য়েছিল না?

সুশীলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু তিন দিন আগেই ছেড়েছে। কি করবে এত লোককে জেলে পুরে? কম লোক ত' ঢোকেনি! একটু থামিয়া বলিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের খাতায় যে নাম র'য়ে গেল, এ-নাম কোনদিন মুছবে না।

বেলা বলিল, দাদা এখন কোথায় আছে?

সুশীলবাবু বলিলেন, কিশোরীর কাছে।

কিশোরী সুশীলবাবুর ছোট ভাই। কলিকাতায় থাকিয়া

ব্যারিষ্টারী করেন। নাম-ডাক এবং অর্থও বেশ রোজগার করেন।

সুশীলবাবু নিম্নকণ্ঠে পুনশ্চ কহিলেন, কিশোরী লিখেছে, নরেশ জেল থেকে জ্বর নিয়ে এসেছে।

উৎকণ্ঠায় বেলার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। জেলে গেলে নানাবিধ কষ্টে লোকের নানারূপ রোগ হয়, তাহা সে শুনিয়াছিল, এবং সে-রোগ সময়-সময় কিরূপ দুশ্চিকিৎস্য হয়, তাহাও তাহার অজানা ছিল না।

সুশীলবাবু বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার উৎকণ্ঠা বুঝিলেন, কহিলেন, সামান্য জ্বর, দু'দিনেই সেরে যাবে। ও-জন্যে ভাবনার কিছু নেই।

বেলার মন প্রবোধ মানিল না। কিন্তু সে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না, অন্তরে উদ্বেগ লইয়া নীরবে আহার করিতে লাগিল।

দাদার মুক্তি-সংবাদের আনন্দ দুশ্চিন্তায় কোথায় মুছিয়া গেল। আহারের পর বেলা বসিয়া এই কথাই চিন্তা করিতেছিল, পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, সুশীলবাবু আসিয়াছেন। তাঁহার এই আগমন অতিশয় অপ্রত্যাশিত। দরকার হইলে তিনি সাধারণতঃ নীচে ডাকিয়া পাঠান। বেলা ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, কি বাবা?

সুশীলবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, কিছু নয়, ব'স।

বেলা বসিলে সুশীল বাবু অন্যত্র বসিয়া কহিলেন, নরেশের জ্বর, ভাবছি একবার দেখতে যাবো।

বেলা বলিল, হাঁ বাবা, কালই যান। বলা যায় না, জেল-খানার ব্যাপার, কি না কি রোগ,—বলিয়া বেলা সহসা থামিয়া গেল। যে রোগের কথা ভাবিয়া সে ভয় পাইতেছে, তাহা জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সুশীলবাবু বুঝিলেন। বলিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, তা' হ'লে কিশোরী লিখতো। রোদ্দুরে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, তা'র ওপর জেলের এই কষ্ট,—তাই জ্বর হ'য়েছে। একবার দেখে আসা ভাল, কি বলিস? তেমন বেশী হলে নিয়েই আসবো।

বেলা বলিয়া উঠিল, আমিও আপনার সঙ্গে যাই না কেন, বাবা?

সুশীলবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা যেতে চাস্, চল্।

বেলা বলিল, আমি এইবার কলেজে ভর্ত্তি হ'ব। আর বেশীদিন ত' নেই, এই ক'দিন না হয় থেকে যাবো।

সুশীলবাবুরও ইচ্ছা ছিল, বেলাকে এইবার কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। এই লইয়া কিশোরীর সহিত পত্র লেখা-লেখিও চলিতেছিল।—বলিলেন, আচ্ছা তাই হবে।

ক্ষান্তমণিকে কয়দিন একলা থাকিতে হইবে। এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য সুশীলবাবু নীচে চলিয়া গেলেন।

বেলা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে গেল।

এই আট দিনের মধ্যে বেলা একবারও আশাদের বাড়ী যায় নাই। আশার মুখেই সে সমস্ত সংবাদ পাইতেছিল। আশার স্কুল-ত্যাগ লইয়া এ-বাড়ীতে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

আশার মা বাপ কেহই তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট নন। একমাত্র মেয়ে, তাই বিশেষ কিছু কটু কথা উঠে নাই; কিন্তু ভালমন্দ অনেক কিছু ইঙ্গিতই তাঁহারা করিতেছিলেন।

আজ সকালে উঠিয়াই বেলা আশাদের বাড়ী গেল। আশার মা ঘরের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন, বেলাকে দেখিয়া বলিলেন, এতদিন আস' নি যে?

আসল কথা গোপন করিয়া বেলা বলিল, বাড়ীতে ভারী অশান্তি চলছে। দাদার জেল হ'য়েছে শুনেছেন ত'?

করুণাময়ী দুঃখিতকণ্ঠে কহিলেন, শুনেছি বৈকি! শুনে অবধি মন খারাপ হ'য়ে আছে।

বেলা বলিল, তার ওপর আবার দাদার জ্বর হয়েছে। কাল খবর এসেছে।

করুণাময়ী নরেশকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন। তাহার অসুখের সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, খুব বেশী জ্বর কি?

বেলা বলিল, না, খুব বেশী নয়, কিন্তু তা হ'লেও ভয়ের কারণ ত'!

করুণাময়ী বলিলেন, ভয়ের কারণ বৈকি! আহা দেখ ত',—কেমন ছেলে, কপালে শেষ পর্য্যন্ত এও লেখা ছিল।

বেলা বলিল, আশা কোথায় মাসীমা?

করুণাময়ী বলিলেন, ওপরে আছে। ও ত স্কুল যাবে না ব'লে জিদ্ ধরেছে। উনি যা রাগারাগী করছেন, কি বলবো। আমার ত' এখানে আর একদণ্ডও ভাল লাগছে না। নরেশের

এই দশা, মেয়েটার এই কাণ্ড, এই সব দেখে-শুনে মনে হ'চ্ছে পালাতে পারলে বাঁচি।

বেলা বলিল, আশার জন্যে আপনারা এত ভাবছেন কেন, মাসীমা? ওর ছেলেমানুষী দু'দিনে চ'লে যাবে।

করুণাময়ী বলিলেন, না মা, নিজের মেয়েকে আমি ভাল ক'রেই চিনি। বাইরে যতই নিরীহ্ দেখাক, ভেতরে-ভেতরে ও ভারী জিদি।

বেলা সুযোগ বুঝিয়া আসল কথা তুলিল, বলিল, এক কাজ করুন না মাসীমা, ও'কে কলকাতার কোন বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দিন না? সেখানে ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকবে, এ-সব খেয়াল মাথায় চাপতে পারবে না।

কথাটা করুণাময়ীর মনে লাগিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত গিয়া কোথায় উঠিবে, কে সব বন্দোবস্ত করিবে, স্বামীর মত হইবে কিনা, ইত্যাদি ভাবিয়া বলিলেন, বোডিংএ দিলে ত' ভালই হয়। আমার এক ছোট বোন্‌পো ঐখানে থেকেই লেখা-পড়া করে। কিন্তু ওঁর সময় কোথায়? একবার সঙ্গে ক'রে না নিয়ে গেলে ত' হবে না!

বেলা বলিল, সেজন্যে ভাববেন না, মাসীমা। আমিও কলেজে ভর্ত্তি হ'তে যাচ্ছি, বোধ হয় বোর্ডিংএ থাকবো। কাকার কাছে আমরা দু'দিন থেকে তারপর যে-যার গোয়ালে ঢুকবো। তাতে আর আপনার আপত্তি কি?

এ-মেয়েটীর সঙ্গে করুণাময়ী মনে মনে নিজের মেয়ের তুলনা

না করিয়া পারিলেন না। এ মেয়েটি যেমন সুপ্রতিভ, তেমনই চালাক। এক বৎসর বাড়ীতে বসিয়া না থাকিলে এইবার আর একটা পড়া শেষ করিত। ইহারই পাশে তাঁহার নিজের মেয়েকে কত জড়, কত লাজুক দেখায়! এইবার একটা পাশ দিবে, তারই মাঝে পর্ব্বত-প্রমাণ এক অহেতুক জিদ্ তুলিয়া ধরিয়াছে। থাকার মধ্যে একটি জিনিষ আছে, তাহা রূপ। কিন্তু শুধু রূপ লইয়া কি হয়?

বলিলেন, তুমি কবে যাবে?

বেলা বলিল, আজই রাত্রের গাড়ীতে।

করুণাময়ী বলিল, আজই?

বেলা বলিল, হ্যাঁ। আপনার এতে ভাববার কি আছে, মাসীমা? এখানে রেখে কেন মিছিমিছি ওর একটা বছর নষ্ট করবেন? আমি ও'কে ঠিক স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেবো। সেখানে পড়াও ভাল হবে।

করুণাময়ী মন হইতে সমস্ত দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, সেই ভাল। তুমি ওকে নিয়ে যাও। ওঁর কোন আপত্তি হবে না, আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি। কিন্তু ও-মেয়ে যাবে ত'?

বেলা বলিল, সে ভার আমার। আপনি মেসোমশায়কে ব'লে-ক'য়ে মত করান। এই বলিয়া সে এক-প্রকার ছুটিয়াই আশার নিকট চলিল।

আশা রৌদ্রে পিঠ করিয়া বসিয়াছিল, বেলা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিল, দাদা তোকে ডেকে পাঠিয়েছে, চল।

আশা কেমন এক প্রকার লজ্জায় প্রথমে কথা কহিল না, প
বলিল, তোমার দাদা এসেছেন নাকি ?

বেলা বলিল, আসবে কি রে ? সে ত' এখন জেলে !

আশা বলিল, আমি সব খবর পেয়েছি। কেমন আছেন ?

বেলা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কি খবর পেয়েছিস ?

আশা বলিল, পরশু-দিন মুক্তি পেয়েছেন।

বেলা বলিল, কা'র কাছে শুনলি ? তোর বাবা-মা এ-ক
জানেন নাকি ?

আশা বলিল, ওঁরা কেউ জানেন না। কাগজের এক কো
বেরিয়েছে, বাবার চোখে পড়ে নি।

বেলা বলিল, কিন্তু তোর চোখে প'ড়েছে। যাক্—এখ
একথা তোর বাবা-মা কাউকে জানাস নি। আমি কথাটা চাপ
দিয়ে এসেছি; জানিস ত',—দাদার জ্বর হয়েছে ?

আশা বলিল, না, তা ত' জানি না।

বেলা বলিল, জ্বর নিয়েই জেল থেকে বেরিয়েছে। কলকাতায়
কাকার কাছে আছে। আমি আজ কলকাতায় যাচ্ছি, তুইও
সঙ্গে যাবি। ঠিক হ'য়ে থাকিস।

আশা কথাটা পরিহাস বলিয়া ভাবিয়াছিল, কিন্তু বেলার মুখ
দেখিয়া তাহার সে-ধারণা রহিল না। বিস্ময়ের সহিত বলিল,
আমি কলকাতা যাবো কি ক'রে ?

বেলা বলিল, কি ক'রে আর ? গাড়ী ক'রে। আমি
মাসীমাকে ব'লে তাঁর মত করিয়েছি। মেসোমশায়ের জন্যে

ভাবতে হবে না, মাসীমার মতই তাঁর মত। কিন্তু এই সর্ত্তে যে তুই সেখানে গিয়েই বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হবি এবং লেখাপড়া করবি। কেমন রাজী ত' ?

আশা এ-বিষয়ে কিছুই ভাবে নাই এবং প্রস্তাবটাও তাহার নিকট অতি আকস্মিক। সুতরাং তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বেলা তাহাকে নীরব দেখিয়া অনুনয়-কণ্ঠে কহিল, লক্ষ্মীটি ভাই, অমত করিস নি। আমি তোদের ভালর জন্যেই বলছি। দাদার অসুখ শুনে হাঁপিয়ে মরতিস, দাদাকেও দেখতে পাবি, আবার বোর্ডিংএ থাকার জন্যে এককালে লাফিয়েছিলি, সে-ইচ্ছেও পূর্ণহবে। তা ছাড়া আমাকে কথাও দিয়েছিলি, দাদা জেল থেকে বেরুলে তুই আবার স্কুলে যাবি। কেমন, দিস নি ? বেশ হবে, দু'জনে কলকাতায় থাকবো। আমিও এইবার কলেজে ভর্ত্তি হবো কিনা!

আশা আর আপত্তি করিল না। বলিল, আচ্ছা, আমি যাবো।

বেলার অনেক কাজ ছিল। সে আর অপেক্ষা করিল না। এখানে যে মতলবে আসিয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

আশা আনন্দ ও ভয়ের যুগপৎ মিশ্রণে একরূপ বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল। নূতন স্থানের নানাবিধ চিত্র, নূতন অবস্থার নানারূপ সমস্যা এবং সর্ব্বোপরি নরেশের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা,—এই সমস্তর একত্রিভূত কল্পনা কিছুকালের জন্য তাহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখিল।

১০

গ্রামে ভদ্র সম্প্রদায়ের সহিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের যে বিবাদ লাগিয়াছিল, এত শীঘ্র যে তাহা এত ভীষণ আকার ধারণ করিবে, কেহই ভাবে নাই। যে কয় ঘর ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন, তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইল। ইঁহাদের সকলেরই অল্প-বিস্তর জমি-জমা ছিল, এবং অনেককে শুদ্ধ ইহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। এই সকল জমি তাঁহারা নমঃশূদ্রদের দিয়াই চাষ করাইয়া লইতেন। কিন্তু এখন নমঃশূদ্ররা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অধীনে কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিল। ফলে কতক জমি অমনি পড়িয়া রহিল, যাঁহাদের কোন গত্যন্তর নাই, তাঁহারা নিজেরাই হাল ধরিলেন। আবাদের মুখেই এই সংঘর্ষ ঘটিল; সুতরাং গণ্ডগোল এবং উত্তেজনার সীমা রহিল না। যাঁহাদের দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিবার সংস্থান আছে, তাঁহারা কিছু দিনের মত দেশত্যাগী হইলেন। নমঃশূদ্রদের মধ্যে যাহারা একান্ত নিঃস্ব, খাটিয়া খাইতে হইত,

তাহাদেরও কষ্টের পরিসীমা রহিল না। বেকার হইয়া চিরদিন তাহাদের বসিয়া থাকা চলে না। তাহারাও এ-দিক ও-দিক চলিয়া যাইতে লাগিল।

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হইলেও এক প্রকারে দিন চলিয়া যাইত। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে এক নূতন উপদ্রব ঘটিল। ভদ্রব্যক্তিরা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের জমিতে ফসল বুনিয়াছিলেন, একদিন দেখা গেল, প্রায় অর্দ্ধেক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। এতখানি কেহ আশা করেন নাই। দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া একটা মীমাংসার কথা ইঁহাদের মনে উঠিয়াছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে ক্রোধের উত্তাপে তাহা কোথায় বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল। সেইদিনই চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে এক সভা বসিল। সকলেই বিদেশাগত স্বদেশী যুবকদের দোষ দিতে লাগিলেন। স্বদেশ-জাত দ্রব্য কেনা ত' দূরের কথা, এরূপ কোন লোক আসিলে তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে, ইহাও স্থির হইয়া গেল। কিন্তু আসল ব্যাপারে কি করা যায়, কিছুই ভাবিয়া পাওয়া গেল না। নমঃশূদ্রদের সহিত মারামারি করা অসম্ভব। তাহার উপর মুসলমানরা ইহাদের সহিত জুটিয়াছে। এই অবস্থায় ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে তাঁহারা চিরন্তন উপায়ই অবলম্বন করিলেন। সেই সভায় বসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত লেখা হইল, এবং স্থির হইল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ কয়েক জন ব্যক্তি জমিদারের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত কথা বলিবেন।

গ্রামের বাঁ দিকে একটা শীর্ণকায় নদী বহিয়া গিয়াছে। বর্ষা-কালে ইহার জল দু'কূলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অন্য সময়ে বিস্তীর্ণ বালুশয্যার মধ্য দিয়া ক্ষীণস্রোতে বহিয়া চলে। এ সময়টা নদীর জল কমিলেও হাঁটিয়া পারাপার হওয়া যায় না। একটা নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকিত, মাঝি এক পয়সা ভাড়া লইয়া পারাপার করিত। নদীর ওপারে হাট বসে, সুতরাং সপ্তাহে একবার অন্ততঃ সকলকেই নদী পার হইতে হইত। মাঝি নমঃশূদ্র জাতীয়, ইহাকে জব্দ করিবার জন্য গ্রামের সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া এক নৌকা প্রস্তুত করাইলেন এবং তাঁহারা সেই নৌকাতেই কাজ চালাইতে লাগিলেন। এই সভা এবং সঙ্কল্প হইবার পরদিনই দেখা গেল, নব-নির্মিত নৌকাটির কোন চিহ্নই নাই। গোলাপ-মাঝি একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া সকলকেই হাটের পথে নামাইয়া দিতেছে, কিন্তু ভদ্রলোক দেখিলেই হাঁকিতেছে, চার-পয়সা, একটি পয়সা কম দিলে চলিবে না।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর দেরী করিলেন না। সেইদিনই সদলে জমিদারের নিকট চলিলেন। গ্রামের লোক আশায় তাঁহাদের পথ চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে-রাত্রে তাঁহারা ফিরিলেন না।

শীতের মধ্য-রাত্রে সহসা একটা হৈ হৈ শব্দে লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পল্লীগ্রামের এই দারুণ শীতে অনেকে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে চাহিল না, যাহারা উঠিল, দেখিল দিঙ্মণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং কোথা হইতে অবিশ্রাম শব্দ ও কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

খবর আসিল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।

জমীদার বাড়ী হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকালেই ফিরিলেন। লোকমুখে গৃহদাহের বার্ত্তা শুনিয়া সারা পথ ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গ্রামের ছোট-বড় সকলেই আসিয়া জুটিলেন, যাঁহারা তখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই, তাঁহারাও একে একে আসিতে-ছিলেন। কি করিয়া আগুন লাগিল, তাহাতে কাহারও মতভেদ রহিল না। আক্রোশবশে নমঃশূদ্ররাই এ কাজ করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের আক্রোশের পরিসমাপ্তি কোথায় হইবে, ভাবিয়া উপস্থিত সকলে পাংশুমুখে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই নিম্নশ্রেণীর জাতির নিকট তাঁহারা কতখানি বলহীন, পুলিশের সাহায্য না পাইলে ধন ও প্রাণ ইহাদের হাতে কতখানি খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইতে পারে, এই প্রথম তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন।

দগ্ধ স্তূপের মধ্যে কোথায় কি জিনিষ-পত্র ছিল, কয়েকজন যুবক সে সকল উদ্ধার করিতেছিল। গোয়ালে একটা বাছুর পলাইতে না পারিয়া মরিয়াছিল, সেটা বাহির করিতেই সকলে আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। জনার্দ্দন ঠাকুর ছেলেপুলে লইয়া বাস করেন, গোয়ালে গরু এবং মরাইএ ধানের অভাব নাই। তিনিও নমঃশূদ্রের পিছনে কম লাগেন নাই। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভয়ে একবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। গ্রামে যে

জাগ্রত চণ্ডীদেবী আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া জনার্দ্দন ঠাকুর বার বার কহিতে লাগিলেন, হে ঠাকুর, আমি কোন অপরাধ করি নাই, ইহাদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিও!

বেলা বাড়িয়া উঠিলে, যাহার যাহা বলিবার ও দেখিবার, শেষ করিয়া একে একে সকলে উঠিতে লাগিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শোকোচ্ছ্বাস কমিয়া গিয়াছিল, তিনি দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ভস্মস্তূপ সম্মুখে লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। সকলে যখন চলিয়া গেল, তখনও তিনি ঠিক তেমনি করিয়াই বসিয়া রহিলেন।

সেইদিনই চন্দ্রা তাহার পিতাকে বলিল, বাবা, এখানে বাস করা আর নিরাপদ নয়।

রাজেনবাবু তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু অনেক কারণে তাঁহার এখান হইতে নড়া চলে না। তাই বলিলেন, তবুও লোকে থাকবে ত'! সকলেই ত' দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে না।

চন্দ্রা বলিল, তাঁরা চিরকাল দেশে বাস করেন, তাঁদের দেশ ছেড়ে গেলে চলে না। আমাদের ত' ত না নয়, আমরা বরং কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছি।

রাজেনবাবু মনে মনে কন্যার উপর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, চলো বল্লেই ত' যাওয়া হয় না। এখানে দু'একটা যে কাজ আছে, সেগুলো সারতে হবে ত'!

চন্দ্রা বলিল, এখানে আর কাজ কি, বাবা?

রাজেনবাবু বাড়ী জমী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলেন,

কিনিবার লোক ঠিক হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার বাড়ীতে দলিল-পত্র পড়িয়া আছে, গিয়া সে সব পাঠাইয়া দিবেন, এরূপ কথা আছে। কিন্তু এখানকার এই কাজটা একপ্রকার স্থির হইয়া গেলেও, আর একটা ইহা অপেক্ষা আবশ্যকীয় যে কাজের জন্য তিনি বসিয়া আছেন, তাহা তাঁহার কন্যারই সব চেয়ে বেশী জানা উচিত। অথচ সেই সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে।

রাজেনবাবু মনের বিরক্তি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কটুকণ্ঠে কহিলেন, এত বয়স হ'ল, তবুও কি মাথায় একটু বুদ্ধি হ'ল না? ধীরেন না এলে কি ক'রে যাওয়া হবে?

চন্দ্রার মাথায় বুদ্ধির অভাব ছিল না এবং পিতা কি উদ্দেশ্যে এখানে অপেক্ষা করিয়া আছেন তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। এই লইয়া সে এই কয়দিন অনেক ভাবিয়াছে এবং আজ সে মন স্থির করিয়াই আসিয়াছে। সংক্ষেপে কহিল, এখানে আমার আর মোটে ভাল লাগছে না।

রাজেনবাবু এই নির্ব্বোধ মেয়েটার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তবে কোথায় ভাল লাগবে?

চন্দ্রার মুখ লজ্জা ও অপমানে লাল হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়াই সে ভাবিতেছিল, পিতাকে আসল কথাটা শুনাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু আজও সে কথাটা জিহ্বাগ্র অবধি আনিয়া আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

রাজেনবাবু কন্যার প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, ধীরেনের বাবা মত দেবেন না, এটা

নিশ্চয়ই। তিনি মত দিন, বা না দিন, ধীরেন একবার এখানে আসবে, এও আমি নিশ্চয় জানি। আত্মগোপন করার মত ছেলে সে নয়। তারপর সব নির্ভর করে ধীরেনের মনের ওপর।

পিতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে চন্দ্রার সমস্ত লজ্জা সহসা মুছিয়া গেল। এতদিন সে যাহা বলিতে পারে নাই, ঝোঁকের উপর এইবার তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল, বলিল, আপনি যা ভাবছেন তা হ'তে পারে না।

রাজেনবাবু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কেন?

চন্দ্রা কোন উত্তর করিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজেনবাবু পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, ধীরেনকে কিছু ব'লেছো?

চন্দ্রা শুধু বলিল, না।

রাজেনবাবুর মন হইতে একটা দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল।

পরমুহূর্তে আবার কি ভাবিয়া বলিলেন, ধীরেন কিছু ব'লেছে নিশ্চয়ই?

চন্দ্রা ঠিক তেমনি করিয়াই বলিল, না।

রাজেনবাবু বলিলেন, তবে? হ'তে পারে না কেন?

চন্দ্রা প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া বলিল, না বাবা, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব' না। আজও আমি ধীরেনবাবুকে বলি নি, কিন্তু তিনি যে দিন ফিরে আসবেন, সেদিন স্পষ্টই তাঁকে বলবো, বিয়েতে আমার মত নেই। তিনি জোর করবেন না, আমিও এ-কথা নিশ্চয়ই জানি। বলিয়া সে

বিস্ময়ে-স্তব্ধ পিতাকে একটি কথা বলিবারও অবকাশ না দিয়া ত্বরিত-পদে চলিয়া গেল।

কিন্তু কিছুদূর গিয়া সেও ঠিক তাহার পিতারই মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, ধীরেন এক পা ধূলা মাখিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছে দাঁড়াইয়াছে। একবার সে আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল পিতা দেখিতে পাইয়াছেন কিনা, তারপর অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ধীরেনকে বলিল, এদিকে আসুন।

১১

ধীরেন বসিয়াই বলিল তোমার বাবা কোথায়, চন্দ্রা?

চন্দ্রা বলিল, বারান্দায় ব'সে আছেন। আপনাকে এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?

ধীরেন বলিল, অনেক দুর্ভাবনা পোয়াতে হ'য়েছে।

চন্দ্রা বলিল, দুর্ভাবনা কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়ে পোহাতে ব'লেছিল?

চন্দ্রার কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি ছিল, তাহা ধীরেনকে আঘাত করিল। কিন্তু সে মুখে কিছু বলিল না, নীরব হইয়া রহিল।

চন্দ্রা বুঝিল, এবং নিজের এই অনাবশ্যক রূঢ়তায় একটু লজ্জিতও হইল। সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া তুলিবার জন্য পরিহাসের আকার দিয়া পুনরায় কহিল, এখন আপনার দুর্ভাবনা কেটেছে ত'?

ধীরেন বলিল, দুর্ভাবনাই হ'ক আর সুভাবনাই হ'ক,—কোন ভাবনাই এত শীগ্‌গীর কাটে না। সেটাকে জোর ক'রে কাটাতে হয়।

চন্দ্রা একটু হাসিয়া কহিল, আপনি কি করবেন?

ধীরেন বলিল, সেই কথাই তোমার বাবাকে বলতে এসেছি। ভাবনার পালা এখনকার মত শেষ ক'রে এসেছি।

ধীরেনের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চন্দ্রা বিস্মিত হইল। তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, পরে যে আরও বেশী দুর্ভাবনা পোয়াতে হবে না, কি ক'রে জানছেন?

ধীরেন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, পরে যা হবে তার ভাবনা এখন থেকে ভেবে ত' কোন লাভ নেই!

চন্দ্রা বলিল, তবুও মানুষ ভেবে চিন্তে কাজ করে ত'?

ধীরেন বলিল, তা করে, এবং আমিও যে করি নি, তা নয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ভবিষ্যতের কথা মানুষ কতখানি ভাবতে পারে বল'? যা সে ভাবে, তার প্রায় সবটুকুই কল্পনা, আসলে হয় ত' সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ দাঁড়ায়।

চন্দ্রার উত্তরোত্তর বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। এই মানুষটিকে সে অত্যন্ত নিরীহ এবং গোবেচারা দেখিয়াছে। প্রশ্ন করিলে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে জানিত না। কিন্তু চক্র ও চিন্তার পাকে ইহারই মধ্য হইতে অন্য মানুষ বাহির হইয়া পড়িতে পারে, চন্দ্রা এই প্রথম দেখিল। এই কারণেই তাহার ভয় কম হইল না। যাহাকে এতদিন স্নেহ ও পরিহাস করিয়াছে, এ যেন সে লোকই

নয়। ইহাকে সে এখন কি বুঝাইবে এবং কি করিয়াই বা বুঝাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

ধীরেন চন্দ্রার এই চিন্তা-ভাব লক্ষ্য করিল না। সে নিজেই কি ভাবিতেছিল, এক সময়ে মুখ তুলিয়া বলিল, তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে, চন্দ্রা।

চন্দ্রা অন্যমনস্কভাবে বলিল, বলুন।

ধীরেন বলিল, এখন নয়, আগে তোমার বাবার সঙ্গে আমার যা বলবার ব'লে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা কইব।

চন্দ্রার মন আজ নানা কারণে ভাল ছিল না। ধীরেনের এই আত্মম্ভরিতায় সহসা সে জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল ধীরেনের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় একটা মস্ত বড় ত্যাগ-স্বীকার করতে চাইছেন। সেজন্য বোধ হয় আত্মপ্রসাদও পাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ, এত বড় ত্যাগস্বীকারে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার বদান্যতার আশ্রয় না নিয়েও আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। বলিয়া চন্দ্রা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিমেষে কি যেন ঘটিয়া গেল। এমন যে ঘটিতে পারে, ধীরেন কোনদিন ভাবে নাই। তাই কিছুকালের জন্য সে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। পরে যখন ভাবিতে চেষ্টা করিল, ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, চন্দ্রার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, তাহার মনে এমন কি সন্দেহ উঠিতে পারে, যাহাতে এমন অদ্ভুত আচরণ করিয়া বসিল?

নিজের দিক হইতে সে কোন দোষ-ত্রুটিই দেখিল না এবং চন্দ্রার দিক হইতে দেখিতে গিয়া সহসা ভাবিল, চন্দ্রা তাহাকে ভালবাসে না, হয় ত' অবাঞ্ছিতের মতই দেখে। তাই তাহার অনধিকার প্রচেষ্টায় প্রকারান্তরে এই আক্রোশ দেখাইয়া গেল। এই প্রস্তাব লইয়া সে পিতা-মাতার কাছে যতদূর সম্ভব লাঞ্ছিত হইয়াছে, ভবিষ্যতের সমস্ত গঞ্জনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এখানে আসিয়াছে। এই সকল লইয়া তাহার মনে যে ত্যাগস্বীকারের অহমিকাটুকু সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা যেন খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। নিজের মনের এই গোপন দুর্ব্বলতা তাহার চোখে পড়িল না, তাই পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি সর্ব্বাঙ্গে জোর করিয়া মাখিয়া মনে মনে চন্দ্রাকেই দোষ দিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, চন্দ্রা যদি তাহাকে না চায়, তবে তাহারই বা এত মাথা ব্যথা কিসের? এ সকল ব্যাপার শুধু একদিক দিয়া দেখিলেই ত' চলে না,—দুই দিকই দেখিতে হয়। চন্দ্রার যদি ইচ্ছা না থাকে, তবে এইখানেই সব সমাপ্ত হইয়া যাক।

কিন্তু তাহার মনের আর এক দুর্ব্বলতা তাহাকে ঠিক বিপরীত মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। নিজের মনকে চোখ ঠারিয়া কহিল, এ সমস্তর কিছুই সত্য নয়, সব কিছু নিজের গড়িয়া লওয়া। সে যাহা করিতে আসিয়াছে, করিবেই। অতএব সর্ব্বাগ্রে রাজেন-বাবুর সহিত কথা কওয়াটাই একান্ত প্রয়োজন।

ধীরেনের আগমন-সংবাদ তখনও রাজেনবাবুর কানে উঠে নাই, অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি সোল্লাসে

বলিয়া উঠিলেন। এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। ব'সো।

ধীরেন বসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

রাজেনবাবু একবার ধীরেনের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর প্রসন্নকণ্ঠে কহিলেন, বেশ, বল'। একটু থামো, তোমার খাওয়ার কথাটা ব'লে নিই।

ধীরেন বাধা দিয়া বলিল, বলতে হবে না, আমার সঙ্গে চন্দ্রার আগেই দেখা হ'য়েছে।

ও, বলিয়া রাজেনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবে একবার ভাবিয়া লইয়া ধীরেন প্রথমেই বলিল, বাবার একাজে একেবারেই মত নেই।

রাজেনবাবু স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, তা আমি জানি।

ধীরেন বলিল, শুধু যে মত নেই, তা নয়, জানিয়েছেন, তাঁর অবাধ্যতা করলে আমার সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। এমন অবস্থা হ'য়েছিল, যে আমাকে লুকিয়ে পালিয়ে আসতে হ'য়েছে।

রাজেনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরেনের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুমি কি আশা ক'রেছিলে, তোমার বাবা এ বিয়েতে মত দেবেন? আমার চিঠির উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন, তার ওপর এমন আশা মোটেই করা চলে না।

ধীরেন চুপ করিয়া রহিল।

রাজেনবাবু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কহিলেন, আসল কথা

তোমাকে নিয়ে। তুমি নিজের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তা হ'লেই সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আনুষঙ্গিক যে সব ভাবনা, যেমন খাওয়া-থাকার ভাবনা,—সে সব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

ধীরেন জানিত রাজেনবাবু একজন ধনীলোক, কলিকাতায় তাঁহার অনেকগুলি বাড়ী আছে, সুতরাং তাঁহার ইঙ্গিত সে এক নিমেষেই বুঝিয়া লইল। লজ্জায় সে তাহার বলিবার খেই হারাইয়া ফেলিল, সহসা বলিল, কিন্তু আপনার মেয়ের কথা—

রাজেনবাবু ঠিক এই কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। চকিত হইয়া বলিলেন, কেন, মেয়ের কথা কি ?

ধীরেন বলিল না, অন্য কিছু বলছি না, কিন্তু তার মতটা একবার জানা দরকার না ?

রাজেনবাবু নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সে আর নতুন ক'রে জানতে হবে না, আমার ভালই জানা আছে।

ধীরেনের চিত্ত একেবারে নাচিয়া উঠিল।

রাজেনবাবু বলিলেন, তুমি কি বড্ড শ্রান্ত হ'য়েছো ?

ধীরেন বলিল, না।

রাজেনবাবু বলিলেন, তবে আমার সঙ্গে চলো, একটু ঘুরে আসি। যেতে যেতে গল্প করা যাবে।

রাস্তায় আসিয়া ধীরেন বলিল, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো।

রাজেনবাবু সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন, কি কথা ?

ধীরেন একটু ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, আপনি বললেন সমস্ত শুধু আমারই নির্ভর করছে, কিন্তু শুধু কি তাই?

রাজেনবাবু বলিলেন, তা ছাড়া আর কি?

ধীরেন বলিল, আমি আপত্তি করছি ভাববেন না, কথার কথ জিজ্ঞাসা করছি, বাপ-মা'র মতটা কি এ সমস্ত কাজে সবচেয়ে বেশী আবশ্যকীয় নয়?

রাজেনবাবু বলিলেন, আবশ্যকীয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশী নয়। সবচেয়ে বেশী যে জিনিষটার আবশ্যক,—সেটা ওই মন। ও জিনিষটা ফাঁকি দেওয়া চলে না, বাপ-মা'র মতামত ও জিনিষটার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ধীরেন নীরবে রাজেনবাবুর কথাই ভাবিতে লাগিল।

রাজেনবাবু পুনরায় বলিলেন, মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, অমুক লোক ছোট-জাতের মেয়েকে নিয়ে অধঃপতিত হ'য়েছে। সাদা চোখে জিনিষটা খুবই খারাপ দেখায় এবং এজন্তে লোক-নিন্দার সীমা থাকে না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এর ঠিক অনুরূপ দেখা যায়। যারা এমন কাজ করে, তাদের মনের জোর তাদের ফাঁকি-দেবার প্রবৃত্তির চেয়ে ঢের বেশী। আর যাদের চিত্ত দুর্ব্বল, মনকে সন্তুষ্ট করবার মত সাহস নেই, তারাই গালাগালি দেয়। এই যে, এদিকে এসো।

ধীরেন বলিল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

রাজেনবাবু বলিলেন, পুরুত-বাড়ী। পাঁজিটা একবার দেখতে হবে ত'?

আহারাদির পর ধীরেন চন্দ্রার অপেক্ষা করিতেছিল। সকালের সেই ঘটনার পর উভয়ের আর কোন কথা হয় নাই স্নানাহারের সময় দু'একবার দেখা হইয়াছিল মাত্র। চন্দ্রার, সহিত ধীরেনের অনেক কথাই ছিল, মনে-মনে সে এই সকল কথা একবার ঠিক করিয়া লইল, এবং যখন ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পার হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, তখন ভাবিল, চন্দ্রা বোধ হয় আসিবে না। চন্দ্রা আসিলে তাহাকে কি বলিবে. তাহারই কল্পিত প্রশ্নোত্তরমালায় বিব্রত হইয়া বহুবার সে ভাবিয়াছিল, চন্দ্রা যদি না আসে তবে সে একটা অনাবশ্যক ভার হইতে বাঁচিয়া যায়,—কিন্তু যখন দেখিল সত্যই চন্দ্রা আসিল না, তখন সে বাঁচিয়া যাওয়ার আনন্দ একটুকুও অনুভব করিতে পারিল না, বরং ভগ্নাশার ব্যথা লইয়া বিরসমুখে শুইয়া পড়িল।

ঠিক এমনি সময়েই চন্দ্রা ঘরে আসিয়া বলিল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি, ধীরেনবাবু?

ধীরেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, না। তারপর চন্দ্রার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সকালে যে অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার লেশমাত্র চিহ্ন চন্দ্রার মুখে নাই। উৎসাহিত হইয়া ধীরেন বলিল, আমি তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।

চন্দ্রা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তা জানি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

ধীরেন ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, ক্ষমা চাইবার কি আছে, চন্দ্রা?

চন্দ্রা বলিল, আছে বৈকি! সকালে যা বলেছি, তার জন্যে সত্যিই ক্ষমা চাইছি, ধীরেনবাবু।

ধীরেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, এই ছোট-খাটো ব্যপার নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ধুম বাধিয়ে তুললে কি ক'রে চলবে? সংসারে এর চেয়েও ত' কত বড় ঘটনা ঘটে!

চন্দ্রা বলিল, তা ঘটে, কিন্তু এটা কি খুব ছোট জিনিষ?

ধীরেন বলিল, ছোট বৈকি! কথা বৈ ত' নয়, মানুষের মুখ দিয়ে কত অবস্থায় কত কথা বেরোয় তার কি কোন হিসাব রাখা চলে?

চন্দ্রা নীরব হইয়া রহিল। পরে এক স্থানে বসিয়া কহিল, আমার অপেক্ষা করছিলেন কেন?

যাহা বলিবার, ধীরেন মনে মনে তাহা একাধিকবার আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেই সব গোল পাকাইয়া গেল।

ভূমিকা সব বাদ রহিয়া গেল, বলিল, রাজেনবাবুর কাছে বোধ হয় শুনেছো, এবিয়েতে আমার বাবার মোটে মত নেই। যদি তাঁর অমতে কাজ করি, আমাকে তিনি ত্যজ্যপুত্র করবেন।

চন্দ্রা আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যই। পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, না, আমি বাবার কাছে কিছুই শুনি নি।

ধীরেন বলিল, এর পরেও তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে দেবেন কিনা, সেইটেই জানতে এসেছিলুম।

চন্দ্রা একটু হাসিয়া বলিল, এখন জেনেছেন, বাবার এতে কিছুই অমত হবে না?

তাহার এই অনাড়ম্বর উক্তিতে ধীরেন লজ্জা পাইল, বলিল, হ্যাঁ, তাঁর কোনই অমত হবে না। একটু ভাবিয়া পুনশ্চ কহিল, তোমার বাবা সত্যি কথাই বলেছেন, এ সব বিচার, লোকের মতামত দেখে করা চলে না, একমাত্র মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে বিচার করা চলতে পারে। কিন্তু মন শুধু একটা নয়, দু'টো। নিজের মনটা জানি, কিন্তু তোমার মনের কথা ত' জানি না, চন্দ্রা?

ধীরেনের বক্তব্য-বিষয় চন্দ্রা অনেক আগেই অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু ধীরেনের কথা বলিবার সম্পূর্ণ নূতন ধরণ দেখিয়া তাহার বিস্ময় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ধীরেনবাবু, আপনি কি সত্যিই আমাকে ভালবাসেন?

ধীরেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। লজ্জা কাটিয়া গেলে,

তাহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, ভালবাসি বৈকি! আজই যখন তোমার বাবা আমার সুমুখে পুরুত মশাইকে বিয়ের দিন স্থির করতে বললেন, তখন সমস্ত ভূত-ভবিষ্যৎ একদিকে রেখে অন্যদিকে তোমাকে রেখে নিঃসংশয়ে বুঝেছি, তোমাকে ভালবাসি।

চন্দ্রা বিস্মিত হইয়া বলিল, বাবা পুরুত মশায়ের কাছে গিছলেন?

ধীরেন বলিল, হ্যাঁ, এবং দিনও স্থির হ'য়ে গেছে। তোমার বাবার মুখেই সব জানতে পারবে। কিন্তু তার আগে আমি তোমার কথাটা জানতে চাইছি।

চন্দ্রা ধীরেনের প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল, আপনার বাবা-মা কি বললেন?

ধীরেন বলিল, ব'লেছি ত! তারপর সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পিতার নিকট লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা, বিমাতার বিদ্রূপ এবং সর্ব্বোপরি চরিত্রহীনতার ইঙ্গিত, এমন কি ভৃত্যদের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাত, সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া কহিল, এর পরে ও-বাড়ীতে আমি ঢুকবো না, নিশ্চয়। তোমার কাছে আসছি, তুমি আশ্রয় না দাও, পথে পথে ঘুরবো।

চন্দ্রা বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বলিল, নরেশবাবু সব শুনেছেন?

ধীরেন বলিল, নরেশ? না, সে শোনে নি। তার কথা তোমাকে বলি নি, সে কলকাতায় আছে। এখন তার ভয়ানক

অসুখ। মধ্যে দিনকয়েকের জন্তে জেল হয়। জেল থেকেই অসুখ নিয়ে আসে।

চন্দ্রা বলিল, তুমি কার কাছে শুনলে?

ধীরেন বন্ধুর প্রসঙ্গে বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, চন্দ্রার এই তুমি সম্বোধন লক্ষ্য করিল না। বলিল, আশার কাছে।

চন্দ্রা বলিল, আশা কে?

ধীরেন বলিল, আশার কথা তোমাকে বলি নি, না? ওটি আমরা যে কলেজে পড়তুম, সেখানকার প্রিন্সিপ্যালের মেয়ে। ওরই সঙ্গে নরেশের বিয়ের কথা চলছিল।

চন্দ্রা প্রশ্ন করিল, কথার কি হ'ল?

ধীরেন একটু হাসিয়া বলিল, কথা চলছিল বলাটা ভুল হয়েছে আমার। ওই আশার সঙ্গেই নরেশের বিয়ে হবে।

চন্দ্রা বলিল, একেবারে স্থির হ'য়ে গেছে?

ধীরেন বলিল, দিন স্থির হয় নি বটে, কিন্তু স্থির হ'য়ে গেছে যে একদিন এ-বিয়ে হবেই।

চন্দ্রা একটু হাসিয়া বলিল, তাই নাকি? আপনার গুরুদেব ঐ মেয়েটিকে খুব ভালবাসেন, বলুন?

ভালবাসে? একটু হাসিয়া ধীরেন বলিল, একদিনের সামান্ত ঘটনার কথা মনে আছে। আশার পায়ে কি হ'য়েছিল, ডাক্তারেরা বললে অস্ত্র করতে হবে। অস্ত্র অবশ্য করতে হয় নি, আপনিই সেরে গেল। কিন্তু সেই নিয়ে নরেশের কি উদ্বেগ! সন্ধ্যের পর আমি আশাদের বাড়ী যেতে গিয়ে দেখি

অন্ধকারে কে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি
নরেশ। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললে
আশার কাছে যাচ্ছো? দেখে এসে খবর দিও ত' কেমন আছে
অন্য কেউ হ'লে আমি পরিহাস করতুম, কিন্তু তখন নরেশের কণ্
শুনে আর পরিহাস করতে পারলুম না, বল্লুম, তুমি ভেতরে এসে
না? উত্তরে সে বললে, আমার একটু কাজ আছে, ভেতরে গেলে
দেরী হ'য়ে যাবে। তা ছাড়া সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত ছিলুম, বা
বার যাওয়া কি ভাল দেখায়? দেখে এসে যখন খবর দিলুম অ
করতে হবে না, তখন ও যেন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে ছেলেমানু
হ'য়ে গেল। সেদিন ওর কি আনন্দ! তারপর চন্দ্রার দিবে
চাহিয়া বলিল, ভারী মজার, না?

চন্দ্রা কতকটা অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি মজার?

ধীরেন বলিল, নরেশের এই ভালবাসা? ওর ভেতরে
এতখানি দুর্ব্বলতা আছে, ভাবতে পারো?

চন্দ্রা সহসা উত্তর করিল না, কি যেন ভাবিতে লাগিল, পরে
তেমনি অন্যমনস্কভাবে বলিল, ভালবাসা কি দুর্ব্বলতা, ধীরেনবাবু?

ধীরেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, না, তা নয়। কিন্তু
অতখানি বাড়াবাড়ি কি ভাল?

চন্দ্রা বলিল, নরেশবাবুর কথা ব'লছেন ত? কিন্তু এ ত' আর
চুরি ডাকাতি নয়, যে ভালো-মন্দের কথা বলছেন?

ধীরেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, আচ্ছা চন্দ্রা,
তোমার কি মনে হয় এদের ভালবাসা কোনদিন ভাঙ্গতে পারে?

চন্দ্রা ধীরেনের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, ভাঙ্গা মানে যদি ভুলে যাওয়া বলেন, তবে সেরূপ ঘটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়! কতলোক কতলোককে ভালবাসছে, আবার ভুলেও যাচ্ছে ত'!

ধীরেন প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ও সব মিথ্যে ভালবাসা। সত্যিকার ভালবাসা যা, তা কোনদিন ভাঙে না।

চন্দ্রা বলিল, সব কিছুই সত্যি, ধীরেনবাবু, মিথ্যে কিছুই নেই।

ধীরেন বলিল, ভালবাসার নাম ক'রে লোকে যে কেবল মাত্র রূপের মোহে মুগ্ধ হয়, তাও কি সত্যি?

চন্দ্রা এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর দিবে কিনা ভাবিল, তারপর বলিল, রূপটা যদি সত্যি হয়, তবে তার মোহটাই বা সত্যি হবে না কেন? কুরূপাকে ক'টা লোক ভালবাসে বলুন? যে ভালবাসে, সে তারই মধ্যে রূপ খুঁজে পায়। একটু থামিয়া হঠাৎ যেন সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল, সবই সত্যি, এই ভালবাসাটাও সত্যি, ভুলে-যাওয়াটাও সত্যি। দুটোই পাশা-পাশি আছে, কিন্তু একটা না পেলে আর একটার কোন সম্ভাবনা নেই, ধীরেনবাবু।

ধীরেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার এই মত?

চন্দ্রা একটু হাসিয়া বলিল, মত নয়, তবে এই মনে হয়। আপনি ঘুমোন, আমার অনেক কাজ আছে। বলিয়া সে সহসা উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দ্রা চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে ধীরেন বুঝিল, সে আসল বক্তব্য হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং চন্দ্রার নিকট তাহার যে কথাটা জানা একান্ত প্রয়োজন, ঠিক সেই কথাটাই জানা হইল না।

১৩

অবস্থার চক্রে পড়িয়া মানুষকে ঠিক কলের পুতুল হইয়া যাইতে হয়, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এমনি করিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়, মনকে এমনি চোখ রাঙাইয়া বশ করিয়া রাখিতে হয়,—ধীরেন নিজের জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল।

একটার পর একটা দিন পার হইতে লাগিল। কথাটা ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। লোক-জনের এবং আসন্ন শুভ কার্য্যের আয়োজনের ধুম বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেছে। এক বৃদ্ধা আসিয়া জুটিয়াছেন, মেয়েলী কাজের সব ভার তাঁহারই হাতে। ধীরেনের প্রতি তাঁহার ঠাট্টা-তামাসা এবং আদর-যত্নের পরিসীমা নাই। ভবিষ্যতের দিদি-শাশুড়ি সম্পর্কটা যেন ঠিকই হইয়া গিয়াছে, শুধু একটা আচার দ্বারা সেটা লোক-শুদ্ধ করিয়া লইলেই হয়।

রাজেন বাবু এই কয়দিন ধীরেনকে চোখে-চোখে রাখিয়াছেন।

তাহার মনের প্রতি অন্ধ্র-রন্ধ্রগুলি যেন তাঁহার মুখস্থ। তাঁহার সতর্ক চক্ষু সদা-সর্ব্বদাই যেন পাহারা দিয়া আছে। কিন্তু তাহার চেয়েও সতর্ক প্রহরী ধীরেন নিজে। তাহার মনকে সে কঠোর শাসনে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, যেন লাভ লোকসানের ঘর খতাইয়া না দেখে, ভাল-মন্দ কোনটাই যেন না ভাবে।

কিন্তু এত শাসনেও কোন কোন বিনিদ্র রজনীতে সহসা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ধ্বনিয়া উঠিত, মনের বাঁধন সহসা আলগা হইয়া পড়িত। বাপ-মা'র কথা মনে পড়িত। বিমাতার দুর্ব্ব্যবহার অন্তরালে থাকিত, শুধু ভাবিত, এই দিনটি অন্যরূপ হইলে কি ঘটিত! বাড়িতে শত কণ্ঠের কোলাহল ছাপাইয়া শঙ্খধ্বনি উঠিত, দোরের কোনে সংসারের প্রাচুর্য্য উছ্‌লাইয়া ওঠার কাহিনী কথিত হইত, লোকজন, আহার-আয়োজন, ইত্যাদিতে কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিত না। কিন্তু কতই প্রভেদ! বিজন বিশ্রুত স্থানে, সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতভাবে, বাপ-মা'র আশীর্ব্বাদাঞ্চল হইতে শত যোজন দূরে সে জীবনের সঙ্গী লইতে চলিয়াছে।

মনকে অমনি চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিত, চুপ্, চুপ্,—ভাগ্যের লিপি কোন বাধাই মানিবে না, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটাইবেই। ভাবিয়া কি লাভ?

গ্রামে নমঃশূদ্রের বিদ্রোহ লইয়া যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা শেষ হইতে চলিয়াছে। পুলিশের ভয়ে তাহারা উন্নত মস্তক আবার নীচু করিয়াছে। দলপতি যাহারা জেলে গিয়াছে,

হাতে পায়ে ধরিয়া কোনমতে তাহাদের শাস্তি-লাঘব করা যায় কিনা, এই আলোচনা ছাড়া আর কোন আন্দোলনই নমঃশূদ্রের মধ্যে নাই। একে একে তাহারা সকলেই মহাজনের দ্বারস্থ হইতেছে। ধীরেন ইহাদের উৎসাহিত করিবার জন্য আর একবার কর্ম্মে নামিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাজেনবাবুর একান্ত অনুরোধে নিরস্ত হইয়াছে। রাজেনবাবুর নিষেধ করিবার কারণ আছে। বিবাহের কথাটা গ্রামে সর্ব্বত্রই জানাজানি হইয়া গেছে। রাজেনবাবুর পক্ষস্থ লোক খুবই কম, সুতরাং অধিকাংশ লোক এখন হইতেই ইহার বিপক্ষাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার উপর তাঁহার ভাবী জামাতা যদি এই সকল নিম্নশ্রেণীর লোকদের আবার ঘাঁটাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অগ্নিতে আহুতি পড়িবে। শুভকার্য্যটি সম্পন্ন করা ত' দূরের কথা, হয় ত' প্রাণ লইয়াই তাঁহাকে পলাইতে হইবে। তা ছাড়া কোনরূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ের ফলে ধীরেনের মনেও যে বিপর্য্যয় ঘটিবে না, তাহারই বা ঠিক কি ?

মধ্যাহ্নের বেলা শেষ হইতে চলিয়াছে। আম-ডালের উপর একটা পাখী বহুক্ষণ হইতে বসিয়াছিল, ধীরেন অলস দৃষ্টিতে সেইদিকেই দেখিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি সরিয়া পথ দিয়া কেহ চলিলে তাহার উপর পড়িতেছিল। এমনি করিয়া কিছুক্ষণ সময় কাটিলে, তাহার চিন্তা একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে চন্দ্রা ঘরে ঢুকিল। এই কয়দিন সে এ-ঘরে আসে নাই এবং নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত উভয়ের

কোন কথাই হয় নাই। আজ হঠাৎ চন্দ্রাকে দেখিয়া ধীরেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কি চন্দ্রা?

চন্দ্রা সহজভাবে বলিল, কিছুই নয়, অমনি এলুম।

চন্দ্রা বেতের মোড়াটা টানিয়া বসিল এবং কাপড়ের মধ্য হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া ধীরেনের হাতে দিয়া বলিল, নরেশবাবু লিখেছেন।

ধীরেন পত্র দেখিয়াই বলিল, এ ত' নরেশের হাতের লেখা নয়! তা ছাড়া ও জানবে কি ক'রে আমি এখানে আছি।

চন্দ্রা বলিল, নরেশবাবু লেখেন নি, তাঁর হ'য়ে অন্য কে লিখে দিয়েছেন। একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, মাপ করবেন, আপনার চিঠি আমি পড়ে ফেলেছি। একটা লাইন চোখে পড়তেই খটকা লাগলো, তারপর,—আপনি পড়ুন, সব বুঝতে পারবেন। নরেশ-বাবুর ভারী অসুখ।

সামান্য কয় লাইনে একটা পোষ্টকার্ড। পড়িতে ধীরেনের বেশীক্ষণ সময় লাগিল না, কিন্তু পত্রে যে দুঃসংবাদ ছিল, তাহার দুঃখভার কাটাইয়া কথা কহিতে কিছুক্ষণ সময় লাগিল। নরেশ শয্যাশায়ী, লিখিবার সামর্থ্য নাই, অন্য ব্যক্তি তাহার হইয়া লিখিয়াছেন। অসুখের বিবরণ জানাইয়া পরিশেষে ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, ধীরেন পত্র পাইয়াই চলিয়া যাইতে যেন বিলম্ব না করে।

ধীরেন বলিল, আমি এখানে আছি কি ক'রে জানলো?

চন্দ্রা বলিল, হয়ত, শুনেছেন। কিম্বা হয় ত' বাড়ীর ঠিকানায়

চিঠি লিখে কোন উত্তর পাননি, তাই এই ঠিকানায় লিখেছেন।

সম্ভবতঃ ইহাই কারণ। কিন্তু ধীরেনের মুখ সহসা একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। চন্দ্রা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, কি করবেন?

ধীরেন বলিল, কি আর করবো? বরাতে যা আছে, তাই হবে।

চন্দ্রা ঈষৎ কটুকণ্ঠে কহিল, বরাতে যা আছে মানে?

চন্দ্রার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা ধীরেনের কানে বাজিল না, সে বলিল, আমার মনের ভাব তুমি ঠিক বুঝবে না, চন্দ্রা। অতি সহজ অবস্থার ভেতরেও মানুষ বরাতের প্রাধান্যে কতখানি শক্তিহীন হ'য়ে পড়তে পারে, সে কেবল আমিই বুঝছি।

চন্দ্রা নিঃশব্দে ধীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে যে বিরক্তি ও ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল, ধীরেন তাহাও লক্ষ্য করিল না। বোধ করি তাহার অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই সে পুনরায় কহিতে লাগিল, রামায়ণে নাগ-পাশের কথা লেখা আছে না? এও কতকটা তাই। কিছুতেই মুক্ত হবার উপায় নেই। যতই ছাড়াতে যাবে, ততই বন্ধন বাড়বে।

এবার আর চন্দ্রা থাকিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আপনার সম্বন্ধে নাগ-পাশের উপমাটা বেমানান হয়, ধীরেনবাবু। ওটা লক্ষ্মণের মত লোকের জন্যে, আপনার জন্যে নয়। যাই হ'ক, আপনাকে আমি মিনতি করছি, আপনি যে কোন উপায়ে হ'ক

এখান থেকে চ'লে যান। যেখানে কোন পাশই নেই, বাবা-মা'র কাছে যান, তারপর এক সময়ে নরেশ বাবুকে দেখতে যাবেন। বলিয়া সে তেমনি ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেল।

এরূপ কাণ্ড একেবারে নূতন ঘটিলে ধীরেন বিস্মিত হইত, কিন্তু আজ সে মোটেই বিস্ময় অনুভব করিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক এইরূপই এক ঘটনা ঘটে এবং সে কারণে সেদিন সে মনে কষ্টও কম পায় নাই। আজকের ব্যাপারকে সে সম্পূর্ণ অন্য চক্ষে দেখিল। ভাবিল, ইহা চন্দ্রার অহেতুক আত্মগরিমা, এবং ইহারই ফলে সে যখন-তখন তাহাকে অবজ্ঞা ও অপমান করিতেছে।

এই অপমান-বোধ ধীরেনের মধ্যে তীব্র ভাবে জাগিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, চন্দ্রা তাহাকে অবজ্ঞা বা অপমান করিতে পারে, এমন অধিকার তাহার কি আছে? চন্দ্রার প্রতি খুঁটি-নাটি ব্যবহারগুলো তাহার মনে পড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেকটি একই ছাঁচে ঢালিয়া দেখিল, তাহাকে চন্দ্রা আজ নয়, বহুকাল হইতে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে এবং তাহার পরিমাণ সামান্য নয়, একটু একটু করিয়া উভয়ের মাঝখানে পর্ব্বত-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রয়োজনই বা কি? যে ধারণাটা ধীরেন এতদিন মন হইতে জোর করিয়া বর্জ্জন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইল। বলিতে লাগিল, সে এখানে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আসে নাই, বাপ-মা, আত্মীয়-

স্বজন, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, শুধু ইহাদেরই জন্য। এই ত্যাগ-স্বীকারের প্রতিদানে ইহারা যদি এমনি করিয়া কথায় কথায় অপমান করে, তবে সে কি জন্য এখানে পড়িয়া থাকিবে?

চন্দ্রার কথা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া সে ভাবিল, তাই ভালো, এখান হইতে সে চলিয়া যাইবে। যেমন করিয়াই হউক,—ফাঁকি দিয়া, চুরী করিয়া—কোন এক প্রকারে আজই সে সরিয়া পড়িবে। যাহার জন্য সে পথে দাঁড়াইতে চলিয়াছে, সেই ত' তাহাকে নিঃস্ব বলিয়া পরিহাস করিয়াছে। এখানে তাহার কি প্রয়োজন? যে ভালবাসার আশায় সে এখানে আসিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে দুই হস্তে পরিহাস কুড়াইয়াছে। কিন্তু আর নয়!

উত্তেজনার বশে সে তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে রাজেনবাবু বলিলেন, ধীরেন, বেরুচ্ছো নাকি?

ধীরেন নীরসকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

রাজেনবাবু বলিলেন, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

ধীরেন সেইখানে দাঁড়াইয়াই বলিল, কি কথা? ভিতরে আসুন।

রাজেনবাবু নিকটে গিয়া কহিলেন, কলকাতার বাড়ীটা লেখা-পড়া করতে হবে, সেই কথাই বলতে এসেছিলুম। কলকাতা থেকে আমার এক উকিল-বন্ধু এসেছেন, তিনিই সব ঠিক ক'রেছেন।

ধীরেন বলিল, আজই ত' লেখা-পড়া করতে হবে না ?

রাজেনবাবু বলিলেন, না, তবে এ-সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা আছে। আচ্ছা চলো, বেড়াতে গিয়ে বলবো।

ধীরেন ইতঃস্ততঃ করিয়া বলিল, চলুন।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। ধীরেন ঘরে যাইতে গিয়া দেখিল, তখনও তাহার ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। এ-কাজটা চন্দ্রা করিয়া রাখে, আজ বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই করে নাই।

নিতান্ত অপ্রসন্নমনে ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, কে অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বলিল, কে ?

চন্দ্রা উত্তর দিল। বলিল, আমি।

ধীরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, অন্ধকারে ব'সে আছো ?

চন্দ্রা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, আপনার বাবার কাছ থেকে লোক এসেছিলেন,—এককড়ি, না, কি তার নাম।

এককড়ি ধীরেনদের সরকারের নাম। তাহার এখানে আসার হেতু অনুমান করিয়া ধীরেন একেবারে থ হইয়া গেল। অনেক-ক্ষণ সে কিছুই বলিল না, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, সে এখন কোথায় ?

চন্দ্রা বলিল, কোথায় গেছেন জানি না, ব'লে গেছেন কাল সকালে আবার আসবেন।

ধীরেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, এ বড় সাংঘাতিক লোক, চন্দ্রা, পৃথিবীতে এমন দুষ্কর্ম্ম নেই যা এ না করতে পারে।

চন্দ্রা বলিল, আমাদের তাতে ভয় করবার কি আছে ?

ধীরেন বসিয়া কহিল, তুমি জান না, তাই বলছো ভয় করবার কিছু নেই। এককড়ি এই গ্রামেই কোথাও আছে এবং কালই দেখবে, গ্রামের সব লোক তোমাদের বিপক্ষে গেছে। তাতেও কিছু না হয়, হয় ত' ঘর জ্বালিয়ে তোমাদের তাড়াবে। এমন কাজ ও অনেক ক'রেছে।

চন্দ্রা স্থির হইয়া রহিল, তারপর কহিল, কিছুই হয় না, যদি আপনি কোন রকমে এখান থেকে চ'লে যান। ধীরেনবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, সত্যি আপনাকে চ'লে যেতে বলছি। নইলে আপনার বা আমাদের, কোন পক্ষেরই মঙ্গল হবে না।

অন্যদিন হইলে ধীরেন কিছু ভাবিত, কিন্তু আজ সে কোন ভাবনাই ভাবিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, বলিল, তুমি জানো না, চন্দ্রা, আমার চ'লে যাবার কোন পথ নেই। আজই উকিল বাড়ী গিয়ে লেখা-পড়ার কথা ঠিক হ'য়ে গেল, এবং গ্রামশুদ্ধ লোক এ-সব কথা জানে। এরপর আমি আর পালাতে পারি না। তা হ'লে কোথাও মুখ দেখাবার স্থান থাকবে না।

চন্দ্রা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকালপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মুখ দেখাবার লজ্জা দু'দিনপরে কিছুই থাকবে না। আজ আপনাকে যেতেই হবে, ধীরেনবাবু, আমি এককড়িকে কথা দিয়েছি। রাত্রি একটায় গাড়ী আছে, সেইটেতে যাবেন,

কেউ টের পাবে না। বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনের মধ্যে যেন কি খেলিয়া গেল, একটু থামিয়া বলিল, আমি সাড়ে-বারোটার সময় আসবো, ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। এই দেশলাই রইলো, আলোটা জেলে নিন। বলিয়া দেশলাইটা শয্যার একপ্রান্তে রাখিয়া চন্দ্রা চলিয়া গেল।

১৪

ভাবের এবং কল্পনার আতিশয্যে ধীরেন ভাবিয়াছিল, সে কত বড় আদর্শই না পূর্ণ করিতে চলিয়াছে! দেশের সেবা করিতে গিয়া প্রণয় করার কাহিনী লইয়া বন্ধু-বান্ধবের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, বাপ-মা'র মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁহাদের অপরিসীম ক্রোধ, নিজের নিঃস্ব হওয়া, এ সমস্তই সে বহন করিবে, এতটুকু প্রতিবাদ করিবে, না—কেবলমাত্র নিজের আদর্শ পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু সে আদর্শ পূর্ণ হইবার দিন যতই নিকটে আসিতে লাগিল, তাহার আদর্শ-প্রীতি ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং ক্রমে একসময়ে ভয় আসিল। এমনি সময়ে একদিন আবিষ্কার করিল, চন্দ্রা তাহাকে ভালবাসে না, বরং ঘৃণা করে। সেদিন তাহার সমস্ত কল্পনা চুরমার হইয়া গেল। নিজের প্রতি চাহিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। ভাবিল, কি বোকামীই সে করিয়াছে! কিন্তু এ বোকামী হইতে উদ্ধার পাইবার মত বুদ্ধি তাহার

কিছুতেই জোগাইল না। তাহার সমস্ত বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারে রাজেনবাবুর সতর্ক চক্ষু দিন-রাত পাহারা দিয়া রহিল।

রাজেনবাবুর তাহার নামে কলিকাতার বাড়ী লিখিয়া দেওয়ার প্রস্তাবকে সে ছলনা ছাড়া আর কিছুই ভাবিল না। তিনি জানেন সে জমীদারের ছেলে, পিতা চিরকাল রাগ করিয়া থাকিবেন না, একদিন তাহাকে ডাকিয়া লইবেনই, শুধু এই আশাতেই তিনি তাহাকে বাড়ীটা দিতে চাহেন। এবং তাও কন্যার মুখ চাহিয়া। এমনি করিয়া সত্যই সে নাগ-পাশের বন্ধন অনুভব করিয়া নিস্ফল আক্রোশে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। আক্রোশ একদিন কমিয়া গেল, শুধু ভাগ্যের লিপির উপর নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া সে নীরবে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু আজ যাহা ঘটিল, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এককড়ি আসিয়া সব যেন ওলট-পালট করিয়া দিল।

পলাইবার জন্য সে একদিন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ যখন চন্দ্রা বলিয়া গেল, তাহাকে পালাইতেই হইবে, তখন তাহার সমস্ত উৎসাহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

পরবাস-ভূমিকে সে এমনি করিয়া ভালবাসিয়াছে, আর কোন-দিন বুঝে নাই। আজ তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ রহিল না। রাজেনবাবুর জন্য তাহার দুঃখ হইল। আহারে বসিয়া পার্শ্বস্থিত বিড়ালটার প্রতি তাহার মমতা হইল। দু'বেলা আহারের সময় এ প্রাণীটা তাহার কোল ঘেঁসিয়া বসে, আজ চলিয়া গেলে আর কোন দিন সে এটাকে দেখিবে না। চন্দ্রা

কি কাজে রান্নাঘরে আসিল, তাহাকে দেখিবামাত্র ধীরেনের বুকটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। চন্দ্রাকে যেন সে এই প্রথম দেখিল, এবং আর হয়ত দেখিবে না। এ-বাড়ীর ইট-কাঠগুলোর জন্যও তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সকলের কাছেই যেন নীরবে সে বিদায় জানাইতে লাগিল। এখানকার আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত বাদ বহিল না।

যখন সে শুইতে গেল, তখন এক বিভীষিকা তাহাকে চাপিয়া রহিল। বারোটা বাজিতে অনেক দেরী, কিন্তু কেবলই মনে হইতে লাগিল, এখনই চন্দ্রা তাহাকে ঠেলিয়া তুলিবে। এখনই তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। পিতার ক্রোধ-গম্ভীর মুখের কথা মনে পড়িল, বিমাতার ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্রূপের হাসির কথা স্মরণ হইল, এবং ইহাও মনে পড়িল, পলাইতে গিয়া যদি রাজেনবাবুর হাতে ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। অবশেষে সব দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল, যদি ঘুমাইয়া পড়ে! তারপর যাহা ঘটিবার ঘটিবে!

কাহার হস্তার্পণে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, চন্দ্রা। মুহূর্ত্তে মনে পড়িল, এই নিশীথ-অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া তাহাকে পলাইতে হইবে। পশ্চাতের এত বড় ইতিহাস পড়িয়া থাকিবে, একবার ফিরিয়াও চাহিতে পারিবে না।

চন্দ্রা তাহাকে তাগাদা দিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি উঠুন, গাড়ী ফেল্ করবেন।

চন্দ্রার পরিচ্ছদের প্রতি ধীরেনের দৃষ্টি পড়িতে সে সবিস্ময়ে বলিল, একি, তুমি জুতো-টুতো প'রে কোথায় যাচ্ছো?

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল, বরের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছি। চুপ, আস্তে কথা কইবেন।

ধীরেন পুনরায় বলিল, কোথায় যাবে, বল'?

চন্দ্রা বলিল, আপনাকে একটু এগিয়ে দিতে।

ধীরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দরকার নেই, আমি পথ চিনি।

চন্দ্রা বলিল, বলা যায় না, হয়ত' পথ ভুলে ঘুরে-ফিরে এখানেই ফিরে আসবেন। নিন্, এখন কথা বলবার সময় নেই।

ধীরেন আর কিছু বলিল না। ত্বরিতে জামা গায়ে দিয়া জুতা পরিয়া বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে চন্দ্রা বলিল, আস্তে চলবেন, যেন শব্দ না হয়।

দোরে আসিয়া ধীরেনের পা যেন থামিয়া গেল। গোপনে চোরের মত পলায়নের কল্পনা তাহার মনকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

চন্দ্রা আগাইয়া আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়া বলিল, চলুন।

ধীরেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। চাপা কণ্ঠস্বরে কহিল, তুমি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো, কেমন, না? আচ্ছা বেশ!

ধীরেন আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না। বড় বড় পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

পিছন হইতে চন্দ্রা বলিল, দয়া ক'রে একটু আস্তে চলুন।

ধীরেন একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, তুমি কোথায় আসছো ?

চন্দ্রা বলিল, আপনাকে ছাড়তে পারছি না যে ? দাঁড়াবেন না, চলুন।

ধীরেন নড়িল না। বলিল, তুমি কোথায় যাচ্ছো বল', নইলে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো।

চন্দ্রার কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বলিল, আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে চান, থাকুন, কিন্তু আমি চললুম। কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইছিলেন, আমি বোর্ডিংএ যাচ্ছি।

চন্দ্রা চলিতে লাগিল। ধীরেন কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সেও হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

চারিদিক নিবিড় অন্ধকার এবং পথের দু'ধারে অসংখ্য বৃক্ষ-শ্রেণী। তাহারা যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া এই দুই পথিকের পদধ্বনি শুনিতে লাগিল। আকাশের অগণিত নক্ষত্র হইতে যে ক্ষীণ আলোকরশ্মি ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহারই সাহায্যে কোনমতে সঙ্কীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথ চিনিয়া এই দুইজন চলিতে লাগিল।

১৩

নরেশের অসুখ এখন ভালর দিকেই চলিয়াছিল। কয়েক দিন হইল সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছে, এবং ডাক্তার এমনও আশ্বাস দিয়াছেন, আর দিন কয়েক বাদেই সে পথ্য পাইবে।

মাথার উপর হইতে একটা গুরুভার কাটিয়া যাওয়ায় সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। নরেশের বিছানার সঙ্গে আর একটা চৌকি জোড়া দিয়া অন্যের রাত্র-জাগরণের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আজও সেটা সরানো হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই চৌকিটায় বসিয়া কত দুর্ভার মুহূর্ত্তই না কাটিয়াছে! কিন্তু এখন এই চৌকিটির উপর গল্পের মজলিস ছাড়া আর কিছুই হয় না।

আজও গল্প চলিতেছিল। ছায়ায় মুখ রাখিয়া নরেশ শুইয়াছিল এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে দু'একটা কথাও কহিতেছিল। শনিবার, আশা বোর্ডিং হইতে ছুটী লইয়া আসিয়াছে। রাত্রে

বেলার সঙ্গে থাকিবে। নরেশের অসুখের দরুণ বেলা কলেজে নাম লেখাইতে পারে নাই। অন্যান্য দিন সুশীলবাবুও সন্ধ্যাকালে কিছুকালের জন্য আসিয়া বসিতেন। কিন্তু তাঁহার ছুটীর মেয়াদ শেষ হওয়ায় কাল চলিয়া গিয়াছেন।

এই কয়জন ছাড়া আরও একটি লোক অদূরে কেদারায় বসিয়াছিল এবং এই বাড়ীরই একজনের মত হইয়া সকলের সহিত কথা কহিতেছিল।

লোকটির নাম চারু। গল্পের আলোচনা এখন ইহাকেই কেন্দ্র করিয়াছিল। বেলা বলিল, আপনাদের সেবাশ্রম কি চির-কালের মত উঠে গেল, চারুবাবু?

চারু হাসিমুখে বলিল, পাগল, তা কি কখনও উঠতে পারে?

বেলা বলিল, তবে?

চারু বলিল, তবে আবার কি? এত বড় মহৎ আইডিয়াল, তা'র চলার অভাব হয়! শুধু আমি অভাগাই যা বিতাড়িত হলুম। অর্থাৎ উক্ত আশ্রমের চতুঃসীমানার মধ্যে পা দেবার অধিকার আমার নেই।

তাহার কথা বলার ভঙ্গীতে বেলা হাসিল। ক্ষণপরে নরেশ মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কিন্তু আপনিই না ওই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন?

চারু নরেশের দিকে ফিরিয়া কহিল, দুষ্ট লোকে তাই বলে বটে। কিন্তু নিজেদের উদর-সেবা ছাড়া আর কোন সেবাই চলতো না। ভেবেছিলুম, এমনিই বুঝি চলবে। কিন্তু মারে

হরি রাখে কে? চট্ ক'রে জন কয়েক সভ্যের ধর্ম্মজ্ঞান গজিয়ে উঠলো, তারা মুষ্টিভিক্ষা, দাতব্য, চরকা ইত্যাদি বহু আয়োজন ক'রে বসলো। ফলে দেশের বৃহৎ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আশ্রমের ওপর পড়লো, ক্রমে তাঁরা পদধূলি দিতে আরম্ভ করে এটিকে আত্মসাৎ করলেন, এবং তস্য ফলে আমাকে সরে পড়তে হ'ল।

বেলা বলিল, এখন মুষ্টিভিক্ষা, দাতব্য, এ-সব চলে না?

চারু বলিল, চলে না আবার? প্রবল বেগে চলছে। নিঃস্বার্থ সভ্য-সংখ্যাও প্রবলতর বেগে বাড়ছে।

বেলা বলিল, আপনাকে সরে যেতে হ'ল কেন?

চারু বলিল, সরে যেতে হ'ল কি সাধে? নিজের হাতে গড়া জিনিষ এমন ক'রে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, এ আর কদিন চোখ মেলে দেখবো, বল'?

নরেশের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটির কথা মনে পড়িল। বলিল, নষ্ট হচ্ছে বলছেন কেন, চারুবাবু?

চারুর বিস্ময়ের যেন অন্ত রহিল না। বলিল, নষ্ট হচ্ছে বলছি কেন? এর চেয়ে আর কি ক'রে নষ্ট হবে? সত্যি নরেশবাবু, এই যে জোর ক'রে উপকার করার চেষ্টা, এর মত বিড়ম্বনা জগতে দুটী নেই। আমি ভাল থাকি, মন্দ থাকি, তোমার এত মাথাব্যথা কেন বাপু? দোহাই আপনাদের, নরেশ বাবু, আপনাদের আর যা ইচ্ছে করুন, জোর ক'রে পরোপকার করবেন না। আমাদের সরকারও এমনি বহুতর উপকার সাধন করেছেন। ধর্ম্মের লড়াই নেই, ডাকাতি নেই, মারামারি নেই, কিন্তু দেশের লোক-

গুলো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন মোমের পুতুল। খেতে-শুতে পেলে আর রোদ্দুরে যাবে না।

নরেশ শুধু মৃদু হাসিল, কোন কথা কহিল না। বেলা বলিল, সরকার এই সব ক'রে কি দোষের কাজ ক'রেছে?

চারু তৎক্ষণাৎ বলিল, ছিঃ ছিঃ, তা' কি বলতে পারি? প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসকমণ্ডলী ত' এই সমস্ত কত পূর্ণ-মাত্রায় করেন। তা' বলছি না। বলছি, লোকগুলো যে পোড়া ঠিক রকম চাইতে শেখে নি! এ সেই বাঁদরের গলায় মুক্তো-হারের মত!

বেলা বলিল, তবে এদের কি করা উচিত ছিল?

চারু বলিল, কি করা উচিত ছিল? কিচ্ছু না। যেমন ডাকাতি চলছিল, তেমনি চলুক। যেমন লোক মরছিল, তেমনি মরুক। লোকেরা যেমন খেয়ে-শুয়ে ছিল, তেমনি থাকতো; কি দরকার ছিল, এ ও তা শেখাবার? সহসা নরেশের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কহিল, কিন্তু ওঁদের বেয়াদপী দেখ! এত পেয়েও সন্তুষ্ট নন, ওঁরা আরও চান! অভিমান ক'রে বললেন, মোটে এইটুকু দিলে? তোমার সঙ্গে মেশা বন্ধ করলুম। ওঃ, তবে ত' ওদের বড্ড বয়ে গেল। স্ত্রীলোকের কান্না সহ্য করার ক্ষমতা ওদের আছে। হাজার হ'লেও বীরের জাত ত'!

নরেশ বলিল, অভিমান ক'রে আমরা চেয়েছিলুম বটে, কিন্তু আপনারা কোন্ মান দেখিয়ে দ্বীপান্তর ঘুরে আসছেন?

চারু বলিল, কিছু নয়, শুধু বায়ু-পরিবর্ত্তন আর সমুদ্র-ভ্রমণের জন্যে মধ্যে মধ্যে অমন আমরা করে থাকি।

বেলা বলিল, আচ্ছা চারু বাবু, আপনি ত' সব হেসে উড়িয়ে দেন। বড় জিনিষটাকে তুচ্ছ করেন, আবার তুচ্ছ জিনিষটাকে বড় করেন, সে ত' শুধু ঠাট্টা আর তর্কের খাতিরে। কিন্তু আপনার আসল মতটা কি?

আমার আসল মত? বলিয়া চারু একটু ভাবিবার চেষ্টা করিল, তারপর নরেশের দিকে ফিরিয়া কহিল, আমাদের কি নিয়ে কথা হচ্ছিল? সেই সেবাশ্রম নিয়ে না?

নরেশ বলিল, সেবাশ্রম মূলসূত্র বটে, কিন্তু কথাটা হচ্ছিল, সেবা করার ব্যাপার নিয়ে।

চারুর যেন মনে পড়িল। বলিল, হ্যাঁ, আমার আসল মত শোন, বেলা। সেবা করার ব্যাপারটা খুবই ভাল। কিন্তু কেমন ক'রে কাকে করবে? যে ক্ষুধার্ত্ত, তাকে ওষুধ দিয়ে সেবা করা চলে না। আবার যে রোগী, তাকে পরমান্ন দিয়ে সেবা করা চলে না। তাই নয়?

বেলা বলিল, তাই। যে খেতে পায় না, তাকে অন্ন দিয়েই সেবা করবো এবং যে রোগী তাকে ওষুধ দিয়েই সেবা করবো।

চারু হাসিল, বলিল, খুব সাধু কথা। কিন্তু অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে, দেশের সমস্ত নর-নারী এখন কেবল অন্ন-সেবাই চায়। ধর্ম্ম চায় না, জ্ঞান চায় না, রোগমুক্ত হ'তে চায় না, খেতে চায়। এত লোককে খেতে দিতে পারবে?

বেলা সহসা কিছু বলিতে পারিল না। তারপর কহিল, তা হ'লে সেবা করার এত চেষ্টা, সমস্তই কি ব্যর্থ?

চারু শান্তকণ্ঠে কহিল, শুধু ব্যর্থ নয়, ভণ্ডামি। জেনে-শুনে পাপ করা।

বেলা বলিল, তা হ'লে কি করা কর্ত্তব্য?

চারু বলিল, কিছুই নয়।

বেলা বলিল, তবে আপনি কেন কিছু ক'রে জেল খেটে এলেন?

চারু বলিল, আমি? কিছু করি নি। নরেশবাবুর পিকেটিং করার জন্যে জেল হ'ল। কেউ বক্তৃতা ক'রে জেলে যায়। সত্যি বলছি, আমি ও-সব কিছু করি নি।

বেলা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই চারুবাবু, আপনার সিক্রেট আমি জানতে চাচ্ছি না। শুধু আপনার মতবাদটা জানতে চাচ্ছিলুম।

চারু সহসা কি যেন ভাবিতে লাগিল, বলিল, মতবাদ একই, বেলা। নরেশবাবুও যা চান, আমিও তাই চাই। কিন্তু পথবাদ-টাই যা স্বতন্ত্র।

বেলা বলিল, কি চান আপনি?

চারু বলিল, মানুষ হবার যা কিছু দরকার সব চাই। চারুর কণ্ঠস্বরে পরিহাসের লেশ রহিল না। পুনরায় সে সেই কথা-টাই ঘুরাইয়া কহিল, মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাকতে চাই, বেলা, পশু হ'য়ে নয়।

বেলা বলিল, মানুষ হ'তে কোন বাধা আছে কি, চারুবাবু? এর জন্যে এত বিরোধ কেন?

চারু বেলার প্রতি দুই চক্ষু তুলিয়া কহিল, বাধা নেই? তোমার দাদাকেই বরং জিজ্ঞেস করো, মানুষ হ'তে কত বাধা আছে। ওঁকে জিজ্ঞেস করো, দেশের আসল লোক যারা, তারা মানুষের চেয়ে কত স্তর নীচে। সেখানে না আছে আলো, না আছে বাতাস। পাবার এতটুকু ইচ্ছে পর্য্যন্ত নেই। এই পঙ্গু অসাড় ভাবটা কাটাতে পারো, বেলা? তা হ'লেই জানবে দেশের খুব বড় সেবা করা হবে।

বেলা বলিল, কিন্তু বিরোধের প্রয়োজন কি?

চারু মৃদু হাসিয়া কহিল, ওকি আর একটা প্রয়োজনের জিনিষ? ও আপনি আসে। বিরোধ বাদ দিয়ে কোন জিনিষ গড়তে পারে?

নরেশ শুইয়াই সব শুনিতেছিল। বলিল, চারুবাবু এবারে ফিলজফি আনলেন। বাকী রইল কি?

চারু কোন উত্তর না করিয়া মৃদু হাসিল। বেলা কিন্তু অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, আসল কথা এড়িয়ে গেলে আমি ছাড়বো না, চারুবাবু।

চারু কহিল, কি আসল কথা?

বেলা কহিল, জাতির মঙ্গলকামনা দাদা করেন, আপনিও করেন। জাতির মঙ্গল করার পন্থা আপনাদের স্বতন্ত্র। কেমন, না?

চারু এবারেও আসল কথা এড়াইয়া গেল, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, জাতি কথাটার মানেই আমি বুঝি না, বেলা। আমি বুঝি মনুষ্যত্ব। আমি মানুষের মঙ্গল চাই।

নরেশ বলিল, আপনি জাতি-বাদ বিশ্বাস করেন না?

চারু বলিল, না।

বেলা কহিল, কিন্তু জাতি না থাকলে লোকের মনুষ্যত্ব গড়ে উঠতে পারে? জাতির দ্বারাই ত' মানুষের পরিচয়?

চারু বলিল, তা কেন? মানুষ ত' জাতি সৃষ্টি ক'রেছে মানুষেরই মঙ্গলের জন্যে ত'? আজ জাতীয়ত্বের প্রয়োজন নেই, তার চেয়েও বড় জিনিষের প্রয়োজন। ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই আজকের প্রয়োজনের জিনিষটি খুঁজে পেয়েছেন। এতদিন পরে ওদের পরিত্যক্ত জিনিষটা তুলে নেবার কি দরকার? একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আমাদের তথাকথিত পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যরাও একদিন পুরাতন অনার্য্যদের বৈশিষ্ট্য মুছে দিয়ে তা'দের সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রেছিলেন। দোষ কি তাতে? বরং সেই ত' স্বাভাবিক। যদি বাইরের কোন লোক এসে আমাদের ঠিক তাদেরই মত তৈরী করতো, অর্থাৎ আমাদের ওদেরই মত মানুষ ক'রে তুলতো, তবে আমার কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু তা ওরা করে না। চারু যেন আরও কি বলিত, কিন্তু সহসা থামিয়া গেল। হাতের ঘড়িটার পানে চাহিয়া কহিল, ওঃ অনেক রাত হ'ল। নরেশবাবু রোগী মানুষ, বিশ্রামের প্রয়োজন।

বেলা বলিল, কিন্তু তর্কের ত' কোন মীমাংসা হ'ল না?

চারু উঠিয়া কহিল, কাল মীমাংসা হবে। আজ চল্লুম।

বেলা কহিল, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

১৬

চারু লোকটির সহিত নরেশের প্রথম পরিচয় রাস্তায়। নরেশ তখন দোকানে পিকেটিং চালাইবার বন্দোবস্ত লইয়াছে। প্রথম পরিচয় খুব সামান্যই। হয় ত' মনেও থাকিত না। কিন্তু উপর্য্যুপরি লোকটির সহিত দেখা হইতে লাগিল। কলিকাতার যে কেন্দ্র হইতে স্বাদেশিকতার সকল কাজ পরিচালনা হয়, সেখানেও লোকটির যাতায়াত। চেহারা অতি সাধারণ। বরং কুঞ্চিত মুখশ্রী দেখিয়া সহসা লোকের মনে বিরূপ ভাবের সৃষ্টি করে। ভ্রমেও কেহ তাহাকে পদমর্য্যাদাযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে না। অথচ সকলেই যেন তাহাকে কেমন শ্রদ্ধা করে। স্বদেশী সম্পর্কের কোন কাজই সে করে না, অথচ তাহাকে বলিতে কাহারও কোন বাধা নাই।

লোকটি নরেশকে চিনিয়া রাখিয়াছিল। কয়েকবার দেখা-শুনার মধ্যে সে কখন তাহার বন্ধুত্বের দাবী করিয়া বসিল, নরেশ

যেন টেরই পাইল না। তবে মনে-মনে বলিল, লোকটির মিশিবার ক্ষমতা আছে।

একসময়ে সে জানিল, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে সে কয়েক বৎসর জেল খাটিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীদের তখনও কেহ কেহ দ্বীপান্তর-বাসী। কিন্তু এ লইয়া কোন আলোচনা হয় নাই। সেও করে নাই, চারুও না।

তারপরেই রাস্তায় অবৈধ জনতা-সৃষ্টির অভিযোগে নরেশের জেল হয়। জেল হইতে অসুখ লইয়া বাড়ী ফেরে।

তাহার অসুস্থ অবস্থায় একটি লোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসে। লোকটিকে দেখিয়া নরেশের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, আসুন, চারুবাবু।

চারু প্রায়ই আসিত। বাড়ীর সকলেই তাহাকে চিনিল। বেলারও তাহার সম্মুখে কোন লজ্জা রহিল না। এমনি কি সুশীলবাবু পর্য্যন্ত যেন তাহার কতকটা গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

তাহার সহিত ভাল করিয়া মিশিল না শুধু আশা। আর সকলের মত সেও চারুকে শ্রদ্ধা করিল, কিন্তু সে-শ্রদ্ধায় যেন অনেকখানি ভয় মিশিয়া রহিল। ভয়ের কোন কারণ থাক, না থাক,—সে এই লোকটির নিকট হইতে দূরে থাকিত।

কিন্তু ক্রমে তাহার ভয়টা অন্যদিকে গেল। এই লোকটির সম্বন্ধে কিছু গল্প সে শুনিয়াছে। তাহাতে লোকটিকে ঘেরিয়া যে রহস্য রহিয়াছে, তাহা যেন আরও দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। এই একান্ত অজানা রহস্যময় লোকটি বেলাকে যে ক্রমেই নিকটে

টানিয়া লইতেছে, তাহা সে স্পষ্টই দেখিতে লাগিল। এ-কারণে তাহার উদ্বেগের অন্ত রহিল না। স্বভাবতঃই সে স্বল্পভাষী। কিছু না জানিয়া এ বিষয়ে কোন কথা সে কহিল না, কিন্তু কল্যকার কথাবার্ত্তার পর আজ আর সে থাকিতে পারিল না, দুই সখী একত্র হইলে সহসা বলিল, হ্যাঁ ভাই, তুমি কি চারুবাবুকে ভালোবাসো ?

বেলা যতদূর সম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিল, ভয়ানক ভালবাসি।

আশা বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি কথা বলো না ভাই !

বেলা বলিল, সত্যিই ত' বলছি। চারুবাবুকে আমি যা ভালবাসি, তুই তার শতাংশের একাংশও দাদাকে ভালবাসতে পারিস নি। তারপর অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সেই কুঞ্চিত মুখশ্রী, বিস্ফারিত নাশা, কোটরগত চক্ষু, ঘোরতম কৃষ্ণবর্ণ,—এ-কি ভোলবার জিনিষ ? তুই বল না, তুইও কি এই অবতারটিকে ভালবাসিস নি ?

আশা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ভাল ত' বাসিই নি, উপরন্তু ভয় করি। সত্যি বলছি ভাই, ভয়ে আমি ওঁর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলি না।

বেলা চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, তবেই সর্ব্বনাশ ! জানিস ত', মেয়েমানুষ যাকে ভয় করে তা'কেই ভালবাসে ? নাঃ, দাদাকে আগে থেকেই সাবধান ক'রে রাখতে হবে, দেখছি।

আশা বলিল, তা হ'লে আমি ভূতকেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসি।

বেলা বলিল, চারুবাবুও একটি ভূতবিশেষ। বলিয়া সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আশা বলিল, দাঁড়াও, আমি চারুবাবু এলে ব'লে দেবো যে তুমি তাঁকে এমনি ক'রে বল!

বেলা সবিস্ময়ে বলিল, সে কিরে, তুই ভূতের সঙ্গে কথা বলবি? সে আবার হাসিতে লাগিল এবং হাসি থামিলে বলিল, আচ্ছা তুই কি দাদাকে একটুও ভয় করিস না?

আশা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, একটুও না। যাকে লোকে ভয় করে, তা'কে কি কেউ ভালবাসতে পারে?

বেলা আশার মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য যেন মুগ্ধ হইয়া গেল। বলিল, তাই নাকি?

আশা বলিল, আমার ত' তাই মনে হয়।

বেলা তাহার সলজ্জ হাস্যোদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, পরে দেখবি দাদাকে নিয়ে কত ভয়! কত বেঁধে রাখবি? একটু ছাড়া পেলেই দেখবি, জেলে গিয়ে ব'সে আছে।

আশা বলিল, সে ভয় কি এখনই নেই? চারুবাবু আসেন দেখেও আমার ভয় হয়। মনে হয় এইবার সবকে দ্বীপান্তরে পাঠাবে। হ্যাঁ ভাই, চারুবাবুর ক'বছরের জন্যে দ্বীপান্তর হ'য়েছিল?

বেলা ঠিক আশার প্রশ্নের উত্তর দিল না। সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, সে ভয় নেই, আশা, তুই নিশ্চিন্ত মনে থাক। চারুবাবু এমন পাগল নন, যে দাদাকে টেনে নিয়ে জেলে ঢুকবেন।

এতটুকু জ্ঞান তাঁর আছে। তা ছাড়া দাদা নিজেই বোধহয় আবার কলেজে ঢুকে ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য জীবনের সুবিধে ক'রে নেবে।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আশা থতমত খাইয়া গেল। এই আবাল্য সখিটিকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। ইহার নিকট হইতে অকারণ আঘাত সে সহ্য করিতে পারিল না, তাহার তুই চক্ষু ছাপিয়া জল আসিল।

বেলা নিজের রূঢ়তায় লজ্জা পাইল। আশাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চিরকালই কি তুই এমনি প্যান্‌পেনে থাকবি? একটা সামান্য কথাতে অমনি কেঁদে ফেললি? সত্যি বলছি, এই প্যানপেনে স্বভাবটা আমি মোটেই দেখতে পারি না।

আশা সত্য কাঁদে নাই। সুতরাং শান্ত হইল শীঘ্রই। মনে যখন তাহার কোন গ্লানি রহিল না, তখন সে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাই তুলিল, কহিল, আচ্ছা ভাই বেলাদি', তোমার এতখানি বয়েস হ'ল, তুমি কি কোনদিন কাউকে ভালবাসো নি? বা ভালবাসতে ইচ্ছেও তোমার হয় নি?

বেলার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য তাহার চক্ষু ব্যাপিয়া স্বপ্নের জাল নামিয়া আসিল, বলিল, ভালবাসা কি এত সোজা রে?

আশা বলিল, তোমার ভালবাসার যা আদর্শ, তাতে চারুবাবুর মত লোক ছাড়া কাউকে তুমি ভালবাসতে পারবে না। চারু বাবুকেই—

বেলা সজোরে আশার মুখ চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই আশা ইহার কারণ বুঝিল। দেখিল পর্দার নীচে দিয়া একজোড়া পা চলিয়াছে।

বেলা ডাকিল, চারুবাবু, এদিকে।

আশা সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই বেলা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ব'স্ না!

চারু পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল।

বেলা বলিল, সেই জাতীয়ত্বের তর্কটা মনে-মনে ঠিক ক'রে এসেছেন ত'?

চারু হাসিয়া বলিল, আমি কি তর্ক করতেই আসি?

বেলা বলিল, তা ছাড়া আপনার মত কাজের লোক কি করতে আসবেন বলুন?

চারু বলিল, তর্ক করা কাজ নাকি?

বেলা বলিল, কাজ না?

চারু একটু ভাবিয়া বলিল, হ্যাঁ সময়-সময় কাজ বটে! আজই আমাদের এমনি একটা কাজ আছে।

বেলা বলিল, অর্থাৎ তর্ক?

চারু বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়। আজ আমাদের একটা মিটিং আছে।

বেলা বলিল, আপনাদের মিটিং?

চারু একটু হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, আমাদেরও মিটিং হয়, তর্ক হয়, সব হয়। কিন্তু কোনটার মানে হয় না, এই যা দুঃখ।

বেলা সহসা বলিয়া উঠিল, আমাকে আপনাদের মিটিংএ নিয়ে যাবেন, চারুবাবু? চারুকে নীরব দেখিয়া পুনরায় কহিল, কি, ভয় হচ্ছে, পাছে গোয়েন্দাগিরি করি?

চারু বলিল, না, ভয় হচ্ছে না, কিন্তু ভাবছি, সত্যই যদি তুমি যেতে পারতে!

বেলা বলিল, সত্যি যাবো, যদি নিয়ে যান। কিম্বা ঠিকানা রেখে যান, গিয়ে হাজির হবো। ক'টার সময় সভা হবে?

চারু বলিল, সন্ধ্যের পর।

বেলা বলিল, নিয়ে যাবেন?

চারু বলিল, বেশ, নিয়ে যাবো। ঠিক হ'য়ে থেকো। নরেশবাবু কেমন আছেন?

বেলা বলিল, ভাল। চলুন ও-ঘরেই আমরা যাচ্ছি।

চারু চলিয়া গেলে আশা বলিল, সত্যই তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে?

বেলা বলিল, ক্ষতি কি?

আশা বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, ওঁর পেছনে ত' দিনরাত পুলিশ লেগে আছে।

বেলা বলিল, ওঁরা যাবেন বিদ্রোহ করতে, রাজ্য কেড়ে নিতে, আর পুলিশ কি চোখ বুঁজে ব'সে থাকবে?

আশার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বলিল, তা সত্ত্বেও তুমি ওঁদের সিক্রেট মিটিংএ যাবে? সেখানে সকলেই ওই ধরণের লোক!

বেলার সর্ব্বমুখ এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় ভরিয়া উঠিল, বলিল, ভালই ত', অনেক নতুন জিনিষ দেখবো!

৭

এক অপরিষ্কার গলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে বেলা চারুকে বলিল, এ রকম আর কটা গলি পার হ'তে হবে?

চারু হাসিয়া উঠিল, বলিল, বেশী নয়, খানিকটা গেলে এর চেয়েও একটু ছোট গলি পাবো, সেইখানেই একটা বাড়ীতে আমাদের সভা হবে।

সম্মুখের অনেকগুলো বাড়ীর ছাই এবং জঞ্জাল রাস্তার মধ্যখানে জমিয়া উঠিয়াছিল; বোধহয় পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া ইহারই উপর দিয়া লোকেরা যাতায়াতের পথ করিয়া লইয়াছিল। বেলা অতি কষ্টে কাপড় বাঁচাইয়া সে-টুকু পার হইয়া বলিল, বেশ চিত্তাকর্ষক স্থানে ত' আপনাদের সভা-গৃহ করা হ'য়েছে?

চারু বলিল, না, ওটা আমার বাস-গৃহ করা হ'য়েছে।

বেলা আশে-পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, এগুলো বোধ হয় বস্তি?

চারু বলিল, হ্যাঁ। এটা ছোটলোকদের পাড়া, সকলেই প্রায় ছোট শ্রেণীর মুসলমান।

বেলা কাগজে এই সকল মুসলমানদের বহু অত্যাচাদের কথা পড়িয়াছে এবং শুনিয়াছে। সন্ধ্যার পর ইহাদেরই পল্লীর মধ্য দিয়া পার হইতে তাহার গা ছমছম করিয়া উঠিল। বলিল, শুনেছি এরা সুবিধে পেলেই পথিককে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে ছেড়ে দেয়। বাধা দিলে নাকি প্রাণে মারতেও কুণ্ঠিত হয় না।

চারু সংক্ষেপে বলিল, খুন-জখম এখানে লেগেই আছে।

বেলা সভয়ে বলিল, আপনাকে কিছু বলে না এরা?

চারু একটু হাসিয়া বলিল, আমাকে কি জন্যে কিছু বলবে? আমার ত' আর কিছু নেই!

বেলা বলিল, কিন্তু সে কথা ত' ওরা জানে না?

চারু বলিল, তা জানে। আমি যে বাড়ীতে আছি, সেটাও এদেরই একজনের বাড়ী।

বেলা বলিল, অন্যদিন আপনার সঙ্গে কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু এখন যে আমি আছি।

চারু মৃদু হাসিয়া বলিল, তুমি ত' আর আমার কিছু নও!

বেলা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। চারু পুনরায় কহিল, কোন ভয় নেই, এরা খুব ভাল মানুষ। খেতে না পেয়ে একদল এসে এই কাজ আরম্ভ করে, তারপর ক্রমে এটা পেশা দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের পক্ষে চাকরী করা যেমন, এদের পক্ষে চুরি-ডাকাতি

করা তেমনি। খুব সরলভাবেই করে থাকে। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, তা' ব'লে তোমাকে চুরি করবে না।

বেলা বলিল, যদি করে ?

চারু বলিল, যদির কথা ছেড়ে দাও, এত বড় মহাপুরুষ এখানে নেই ব'লেই জানি।

বেলা বলিল, আমার পক্ষে সৌভাগ্য। আচ্ছা, আজকের সভায় কে কে আসবেন ?

চারু বলিল, বেশী নয়, পাঁচ ছ'জন আসবে। গেলেই দেখতে পাবে। এই বাঁ-দিকের পথে এসো।

আরও সঙ্কীর্ণ এক গলিতে উভয়ে প্রবেশ করিল। কিছুদূর যাইতেই দুর্গন্ধে বেলার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিল, একেবারে নরককুণ্ড !

চারু বলিল, তা বটে ! এখানে সব চামড়ার গুদোম।

এতক্ষণ বেশী লোকজন পথে পড়ে নাই, এইবারে লুঙ্গি-পরা গেঞ্জী-গায়ে বহু লোকের সাক্ষাৎ মিলিতে লাগিল। অনেকেই চারুকে অভিবাদন করিল, কিন্তু সকলেই বিস্মিত-দৃষ্টিতে বেলার দিকে চাহিতে লাগিল। চাহনির না আছে ভদ্রতা, না আছে পর্দা ! তাহাদের সেই একান্ত নগ্ন এবং লালসাপূর্ণ দৃষ্টি সম্মুখে বেলা ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়া চারুর গায়ে ঘেঁসিয়া রহিল। চারু তাহার কাঁধে একটা হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, ভয় নেই, এ পথে ত' কেউ ভদ্রমেয়ে কখনও আসে না, তাই ওরা অবাক হ'য়ে গেছে।

বেলা নিজের কাঁধের উপর একজনের হস্তার্পণের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, না, আপনার সঙ্গে যাচ্ছি আবার ভয় কি?

প্রত্যুত্তরে চারু কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল। আবছায়া আলোকে বেলা তাহা দেখিতে পাইল না, আপন মনে চলিতে লাগিল। এক সময়ে বলিল, আর কতদূরে আপনার বাড়ী, চারুবাবু?

অদূরে একটা খোলার ঘর দেখাইয়া চারু বলিল, ঐ যে!

বাড়ীটার কাছাকাছি যাইতে, সেখান হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল এবং চারুর নিকটে আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী মেয়েটিকে দেখিয়া তাহাদের চারি-চক্ষু যেন সহসা কপালে উঠিয়া গেল। একজন একটা ঢোক গিলিয়া চারুর দিকে ফিরিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, বাবু।

চারু বলিল, বল'?

লোকটা একটু ইতস্ততঃ করিতে চারু পুনরায় বলিল, আচ্ছা এদিকে এসো। একটু দাঁড়াও ত' বেলা!

তিনজনে দূরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কি কথা কহিতে লাগিল। বেলা কেমন অস্বস্তি অনুভব করিয়া পিছনে ফিরিতেই দেখিল, ঠিক পিছনের বাড়ীর দোর খুলিয়া একটা লোক হা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এবং চোখা-চোখি হইবামাত্র দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতে লাগিল। বেলা বিরক্ত হইয়া বলিল, চারুবাবু, আপনার হ'ল?

চারু বলিল, হ্যাঁ, চলো।

অতি ক্ষুদ্র একটা ঘর, এক কোণে খাটিয়ার উপর একটা শয্যা পাতা রহিয়াছে। চাদরটা বহুদিন ব্যবহারের দরুণ মলিন হইয়া গিয়াছে। শয্যার উপর ছড়ানো কতগুলো কাগজ ও বই, এবং শিয়রের নিকটে একটা টুলের উপর আধ-পোড়া মোম-বাতি, তাহার গা বাহিয়া অজস্রধারে মোম গলিয়া পড়িয়াছে।

চারু সেই টুলটা পরিষ্কার করিয়া বেলাকে কহিল, রাজগৃহে এসেছো, ব'স।

*বেলা বসিল না, কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘরটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিল, তারপর সহসা তাহার চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল। এই লোক-*টির পূর্ব্ব ইতিহাস সে কিছুই জানে না, শুধু শুনিয়াছে, একদা কোন্ আহ্বানে সে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে। পথ-চলার অধিকার হইতেও একদিন বঞ্চিত হইয়া দ্বীপান্তরে আশ্রয় লয়, তারপর ফিরিয়া আসিয়া রাজপথ ছাড়িয়া অন্যপথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। সে পথ কি, বেলা শুনিয়াছে, কিন্তু চোখে দেখে নাই। পথ না দেখুক, পথের ধারে যে আশ্রয়ে ইহাকে দেখিল, তাহাতে সে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

সহসা সে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপনার মা এখনও বেঁচে আছেন, চারুবাবু?

চারু কোন উত্তর করিল না, একটু হাসিয়া খাটিয়ার নীচে হইতে ষ্টোভ বাহির করিয়া বলিল, বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছে, তুমি খাবে? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই দেওয়ালের গায়ে

টাঙ্গানো এক শিশি হইতে স্পিরিট ঢালিয়া ষ্টোভ ধরাইতে বসিল।

বেলা নিঃশব্দে দেখিতে লাগিল, তারপর বলিল, ভাত খান কোথায়?

চারু বলিল, বাড়ী-উলির কাছে।

বেলা বলিল, বাড়ী-উলিটি কে, মুসলমান ত'?

চারু মুখ না তুলিয়াই বলিল, তা ছাড়া এখানে ভাট-পাড়ার বাম্‌নি কে আসবে, বল'?

বেলা আরও ক্ষণকাল এই লোকটির প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল এবং একসময়ে সহসা সেই মলিন শয্যাটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, এমনি ক'রে কতদিন কাটাবেন, চারুবাবু?

চারু বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিল, তার মানে?

বেলা মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। বলিল, এই বাড়ীতে আর কতদিন থাকবেন?

চারু বলিল, তার কি কোন ঠিক আছে? আজ আছি, হয় ত' কাল নেই।

চারুর ষ্টোভ-ধরানো হইয়াছিল, শেষবার তাহাতে পাম্প দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, বেলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাগজ-পত্র ও বইগুলো গুছাইতেছে। একটু হাসিয়া কহিল, এসব ঘাঁটা খুব অন্যায় তা জানো?

বেলা কোন উত্তর দিল না, বই ও কাগজগুলো মাটিতে গুছাইয়া চারুর দিকে ফিরিয়া কহিল, অন্য কোন চাদর আছে?

চারু বলিল, আছে, ঐ খাটটার নীচে।

খাটিয়ার নীচে একটা চামড়ার ব্যাগের মধ্য হইতে চাদর বাহির করিয়া বেলা পরিষ্কার করিয়া শয্যা রচনা করিল, স্মিতহাস্যে নিজ হস্ত-রচিত শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া কহিল, তবু একটু ভদ্রলোকের মত দেখতে হ'ল।

চারু হাসিয়া কহিল, ঠিক তা নয়, ঘরে একটু লক্ষ্মীশ্রী খুললো,—এই হচ্ছে ঠিক কথা। এতক্ষণ বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এটা একটা অলক্ষ্মীর বাসা। কিন্তু যেই লক্ষ্মী ঘরে পা' দিয়েছেন, অলক্ষ্মী অমনি কোণ-ঠাসা হ'য়েছে।

ঘরে পা দিয়াই বেলা'র মনোমধ্যে যে করুণার গুরু-ভার চাপিয়াছিল, গল্প-হাস্যের মধ্য দিয়া তাহা অনেকটা তিরোহিত হইয়া গেল। চা'য়ের জল গরম হইয়া বাষ্প নির্গত হইতেছিল, বেলার তাহাতে দৃষ্টি পড়িতে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, চা কোথায় আছে দেখিয়ে দিন। আর কাপ? নেই বোধ হয়?

চারু বলিল, চা ঐ তাকটার ওপর আছে। কাপ ঐখানেই একটা পাবে। আর একটা দরকার, না? আচ্ছা আনিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকালপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কাপ-টাপ এখানে পাওয়া যাবে না, তবে একটা বাটি আসছে।

বেলা হাসিয়া বলিল, দোকানে অর্ডার দিয়ে এলেন নাকি?

চারু প্রত্যুত্তরে কহিল, হ্যাঁ, এক রকম দোকান বৈকি! আমার দোকানদার কে জানো ত? বাড়ী-উলি।

বেলা সভয়ে বলিল, সেই মুসলমান ত' ?

চারু হসিয়া বলিল, মুসলসান বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারিণী বিধবা।

বেলা বলিল, সে এখানে আসবে নাকি ?

চারু বলিল হ্যাঁ, বাটিটা ধুয়ে নিয়ে আসছে। বেড়ার ও-পারেই থাকে।

বেলা আর বসিয়া থকিতে পারিল না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আপনি নিজে আনলেন না কেন, চারুবাবু ?

চারু সবিস্ময়ে বেলার দিকে চাহিল এবং কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বাড়ী-ওয়ালী আসিয়াছে।

বাড়ী-ওয়ালী নিম্নশ্রেনীর মুসলমান, গরীব। বয়স অনেক হইয়াছে। মুখশ্রী কু স্থ দু-ই অতিক্রম করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে সেখানে কোমলতা বা কর্কশতা, কোন ভাবই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঘরে ঢুকিয়া এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে সে প্রথমটা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, চা খাবেন বুঝি ? তা এত কষ্ট করার কি দরকার ছিল ? আমাকে বললেই হ'ত, আমি আলীকে দিয়ে ক'রে পাঠিয়ে দিতুম। হুঁ, এখানে জীবনকালটা কাটালুম, বলে লোকের অভাব ! আমাকে বললেই হ'ত ! আলী বলে কি না সাহেবের ওখানে খানসামা-গিরি ক'রে হাত পাকালো, তার সার্টিকেট পর্য্যন্ত আমার কাছে আছে।

চারু বলিল, তার চেয়ে এক কাজ করো ত' আলীর মা ! আজ আলীকে দিয়ে বেশ ভালো ক'রে রান্না ক'রে খাওয়াও।

আলীর মা একবার বেলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, সে আর বলতে হবে, আমি কি বুঝি না? কিন্তু তাহার মনে একটু সন্দেহ ছিল, সেটুকু পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দু'জনের মতই রান্না হবে ত'?

চারু সকৌতুকে বেলার মুখের দিকে চাহিতে দেখিল, তাহার মুখমণ্ডল একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে এবং সে দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারু মনে মনে বিচলিত হইল, কিন্তু বাহিরে অবিকৃত থাকিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিল, কি বেলা, এ-বেলার নেমতন্নটা খেয়ে যাবে?

বেলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

আলীর মা আর একবার বেলার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইল। প্রথম দিন এমনিই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং সে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া চারুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, নয় ত' আমি চাল ডাল পাঠিয়ে দিচ্ছি, উনুন আছেই, একটা না হয় হাঁড়িও কিনে দিচ্ছি। এ বেলার মত তাতেই চালিয়ে নিতে হবে, আর উপায় কি?

চারু বলিল, না, তার দরকার হবে না।

দরকার হয় ত হইবে না, কিন্তু এই মেয়েটিকে সারারাত্রি উপবাসী থাকিতে হইবে মনে করিয়া আলীর মা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাল করিয়া না জানিয়া অন্যের ব্যাপারে বেশী কথা কওয়া যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিল না। চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, আচ্ছা আমি এখন

যাই, যখন যা দরকার হবে, খবর দিলেই ছুটে আসবো। আলী আসবে, সেও থাকবে। সহসা তাহার দৃষ্টি নব-রচিত শয্যার প্রতি পড়িল এবং মনে মনে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া বেলার প্রতি চাহিয়া ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

আলীর মা চলিয়া গেলে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। তারপর বেলা মুখ তুলিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, চারুবাবু, এ হত-ভাগা জায়গায় কি জন্যে আমাকে আনলেন?

বেলার কণ্ঠস্বরে চারু ঈষৎ বিস্মিত হইল, তারপর কহিল, বাঃ, আমি আনলুম, না তুমি নিজে এলে?

কিন্তু এ-জায়গা যে এমনই ভয়ঙ্কর জায়গা, পদে পদে এখানে তাহাকে অপমানিত হইতে হইবে, তাহা সে ভাবে নাই। এই কথাই সে বলিতে গেল, কিন্তু তাহার রুদ্ধকণ্ঠ ভেদ করিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

চারু ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া বলিল, কিন্তু চা'য়ের দশা একেবারে শেষ হ'য়ে গেল।

চারু উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, বেলা তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

নিজের বাটিতে চা লইয়া বেলাকে কাপটা আগাইয়া দিয়া চারু কহিল, খেয়ে দেখো, বোধ হয় একটু মিষ্টি পাবে।

বেলা তাহা স্পর্শ করিল না দেখিয়া পুনরায় কহিল, কি, খাবে না?

বেলা শুধু বলিল, না।

চারু আর কিছু বলিল না, শয্যার উপর বসিয়া চা পান করিতে করিতে কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

এমন করিয়া অনেক সময় কাটিল। বেলার চা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, চারুর চা পান প্রায় শেষ হইল। বেলা আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আমাকে রেখে আসুন, চারুবাবু!

চারু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমাদের মিটিং দেখবে না?

বেলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, না, আমাকে এখুনি রেখে আসুন।

চারু বলিল, তাড়াতাড়ি কি? একটু ব'স, আমি একটা কাজ ক'রে নি। একটু থামিয়া বলিল, মিটিং আর তোমার দেখা হ'ল না, রাত্রি বারোটার পর বসবে।

বেলা অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল, তবে মিথ্যে কথা ব'লে আমাকে এখানে আনবার মানে?

চারু চকিত হইয়া বেলার দিকে চাহিল, তারপর বাটিটা নীচে রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, তোমাকে মিথ্যে কথা ব'লে আনবার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। সে যাক্, তুমি ঠাণ্ডা হ'য়ে একটু ব'স, আমি একটা চিঠি লিখে তোমাকে রেখে আসছি।

বেলা মুখ লাল করিয়া বলিল, না, আমি এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকবো না, আপনি এখুনি আমাকে রেখে আসুন।

চারু বলিল, আমাকে তার আগে চিঠি লেখা শেষ করতেই হবে। বল ত' আমি লোক ডেকে দিচ্ছি, সে তোমাকে বাড়ী

অবধি পৌঁছে দেবে। বলিয়া সে ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাগজ-কলম বাহির করিয়া আলোটা নিকটে টানিয়া লইল, তারপর বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার মিনিট দশেকের বেশী সময় লাগবে না, সেটুকু যদি অপেক্ষা করতে না পারো, আমি অন্য ব্যবস্থা করছি। তাতে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই, আমার কাছ থেকে যাচ্ছো, কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করবে না।

বেলা কোন উত্তর করিল না, চারুও আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

বেলা কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া এই লোকটির প্রতি চাহিয়া রহিল। ইহার সহিত তাহার পূর্ব্বেকার মেলা-মেশার কথা স্মরণ করিয়া সে যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরে সে এই লোক-টিকে কত বড় আসনই না দিয়াছিল! কিন্তু এক্ষণে এই কথা স্মরণ করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে চাহিল। প্রচুর আলো চারুর মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, বেলা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে করিল, সে যেন ইহাকে নূতন করিয়া দেখিল। ইহার মুখের প্রতি রেখাটি বেলার মনে ঘৃণা জাগাইতে লাগিল। চুল হইতে চিবুক অবধি কোনখানে এতটুকু শ্রী নাই, ভীষণ কুটিলতা ও কদর্য্যতায় ভরা। আসিবার সময় এই লোকটার পাশে সে আপনাকে একান্ত নিরাপদ বিবেচনা করিয়াছিল, কিন্তু এখন সে সর্ব্বাপেক্ষা এই লোকটাকেই ভয় করিতে লাগিল।

চারুর চিঠি-লেখা শেষ হইল। সেটাকে খামে মুড়িয়া ঠিকানা লেখা শেষ করিয়া কহিল, চলো।

বেলার আপাদ-মস্তক একবার শিহরিয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

বাহিরে আসিয়া দোরটা টানিয়া দিয়া চারু বলিল, তোমাকে আমাদের মিটিংটা শোনাতে পারলুম না ব'লে বড় দুঃখিত হচ্ছি। আসবার সময় এখান থেকে দুটো লোক বেরিয়ে রাস্তায় আমার সঙ্গে কথা বললে, ওরাই খবর দিলে, মিটিং বারোটার পর বসবে। কোথাও কিছু ঘটে থাকবে বোধ হয়। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চলো।

সেই জঘন্য পল্লী-পথ দিয়া আবার উভয়ে হাঁটিয়া চলিল।

১৮

মানুষের মন অতি বিচিত্র। অন্যে ত' দূরের কথা, যার মন সেই অনেক সময়ে ইহার হদিস পায় না। কখন যে ঐ জিনিষটি বাঁকিয়া দাঁড়ায়, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। অতি তুচ্ছ কারণে সময় সময়ে ইহার ক্ষিপ্ততার নির্দ্দেশ থাকে না, এবং পরে যখন সব শান্ত হইয়া যায়, তখন এই অহেতুক উত্তেজনার জন্য মানুষের লজ্জারও সীমা থাকে না।

বেলার ঠিক তাহাই হইল। চারুর পাশে থাকিয়া রাস্তায় আসিতে আসিতে সমস্ত কথা সে মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। আলোকিত প্রকাণ্ড রাজপথে আসিতেই তাহার দুঃস্বপ্ন যেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। এই সুপ্রকাণ্ড পথ ও সেই সঙ্কীর্ণ গলি, দুয়ের মধ্যে কত ব্যবধানই না রহিয়াছে! এ পথে কত লোক চলিয়াছে, কেহ কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবারও সময় পায় না।

কিন্তু যে পথ সে পার হইয়া আসিল, সেখানে প্রতি পথচারীটি এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি সবকেই দেখিয়া ফিরিতেছে।

কিন্তু সে এইরূপ আশা করিয়াই ত' গিয়াছিল! এক বিদ্রোহীর গোপন আবাস-স্থল আরও কত ভয়ঙ্কর হইতে পারিত! সে এসকল ভাবিয়াই ত' গিয়াছিল! কিন্তু এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় নূতনত্বের আনন্দ কোন্ অতলে ডুবিয়া গেল। উত্তেজনার কারণ ছিল এবং সে কারণ এতই বিশ্রী, যে কেহই নির্ব্বিকারে তাহা অবহেলা করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই লোকটিকে ত' অপরাধী করা চলে না! ইহার কি দোষ? সে ত' তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যায় নাই! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে নিজে যতটুকু অপমানিত হইয়াছে, তাহার চারগুণ অপমানের বোঝা ইহারই ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে। সেই অবহেলিত চা'টুকুর কথা তাহার মনে পড়িল। এবং অবশেষে এই ক্ষুদ্র জিনিষটির কথা স্মরণ করিয়াই সে মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

একবার ভাবিল, কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া এই ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া দিবে এবং কথাপ্রসঙ্গেই নিজের দোষ সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইবে। ইহার চেয়ে বেশী আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত চিন্তা এবং যাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বেলার এত ভাবনা, সে একান্ত উদাসীনভাবে হাঁটিয়া চলিল, একবার ঘাড় ফিরিয়া চাহিলও না, বা একটি কথাও

কহিল না। ইহার মনোভাব কি, লোকটি রাগ করিয়াছে বা দুঃখিত হইয়াছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কিছু না বুঝিয়া-সুঝিয়া যাচিয়া খোসামোদ করার মত হীনতা বেলা কোন-মতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না।

এমনি নীরবে চলিতে চলিতে উভয়ে গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছিল। বেলা বলিল, আপনি ওপরে যাবেন ত'? দাদা বোধ হয় আপনার অপেক্ষা করছে।

চারু বলিল, না, আমার কাজ আছে।

এই স্পষ্ট অস্বীকারোক্তির পর আর কোন কথা চলে না। বেলা মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর অস্পষ্ট স্বরে 'আচ্ছা' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর বেলা প্রত্যহ একবার দাদাকে দেখিতে যায়। আজও যথারীতি যাইতেই নরেশ বলিল, চারুবাবুর বাড়ী কেমন দেখলে?

বেলা বলিল, মন্দ নয়, ভালো।

এই স্বল্প উত্তরে নরেশ সন্তুষ্ট হইল না। বলিল, তবুও, কেমন দেখলে সব বল'?

বেলা বলিল, কেমন আর দেখবো? মুসলমান-পাড়ায় ছোট্ট একটা ঘর, জিনিষপত্তর কিছুই নেই। বিশেষত্বও কিছু নেই।

নরেশ পুনরায় বলিল, শুনলুম, ওঁদের নাকি একটা মিটিং বসবার কথা ছিল?

বেলা বলিল, কথা ছিল, কিন্তু বসে নি। তারপর সহসা

টেবিলের দিকে চাহিয়া বলিল, ইস্, এখানটা কি অগোছাল হ'য়ে রয়েছে! বলিয়া সে উঠিয়া টেবিল গুছাইতে লাগিল। তাহা শেষ করিয়া নরেশের দিকে ফিরিয়া ঘুমাইবার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

নরেশ একটু বিস্মিত হইল। তাহার এই চপল-প্রকৃতি বোনটি কতখানি উৎসাহ লইয়া চারুর সহিত গিয়াছিল তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এবং ফিরিয়া আসিয়া সে যে অসংখ্য বর্ণনা করিবে, তাহাতেও তাহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্রত্যাশিত উৎসাহের লেশমাত্র চিহ্নও সে দেখিল না। এমন কি, বেলার এই প্রসঙ্গ এড়াইয়া যাইবার প্রচেষ্টা তাহার চোখে খুব বড় করিয়া ঠেকিল। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলিল না। বেলা অন্যান্য দিন আরও অনেক্ষণ বসিয়া গল্প করে, আজ তাহার এত শীঘ্র চলিয়া যাওয়াতে সে বাধাও দিল না।

সকালে বেলা দাদাকে ঔষধ দিয়া বলিল, দাদা, তুমি ইজিচেয়ারটায় একটু ব'স, আমি বিছানাটা পরিষ্কার ক'রে ফেলি।

জানালা দিয়া প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল, নরেশ সেইদিকে পিঠ করিয়া বসিল। বেলা ক্ষিপ্র-হস্তে শয্যা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল, দাদা, এইবার থেকে তুমি ব'সে থাকার অভ্যেস কর। দিন-রাত আর কত শুয়ে থাকবে?

নরেশ বলিল, আর চার-পাঁচ দিনে দেখবে বেড়াতে আরম্ভ ক'রেছি।

বেলা বলিল, তা হ'লে আরও চার-পাঁচদিন পরে দেখবো যে আবার শয্যাশায়ী হ'য়েছো।

নরেশ একটু হাসিয়া কহিল, মন্দ কি, আবার একপ্রস্থ সেবা পাওয়া যাবে। বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া ঠাহর করিয়া বলিল, বোধ হয় চারুবাবু আসছেন।

বেলা মুখ ফিরাইল না, বা কোন কথা কহিল না। মুহূর্ত্তের জন্য সে সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া হাতের কাজ করিতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বেলাকে লক্ষ্য করিল, তারপর নরেশের দিকে ফিরিয়া বলিল, কেমন আছেন, নরেশবাবু?

নরেশ বলিল, ভালই, এবং উত্তরোত্তর আরও ভাল হচ্ছি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন!

চারু বসিয়া বলিল, তা হ'লে আমার আর এত ঘন ঘন যাতায়াতের প্রয়োজন নেই, কি বলেন?

নরেশ সহসা ইহার অর্থ ধরিতে পারিল না, পরে বুঝিয়া-সুঝিয়া কহিল, আপনি কি শুধু আমার অসুখের কারণেই আসতেন, আর কোন কারণে নয়?

চারু মৃদু হাসিয়া কহিল, আর কি কারণ হ'তে পারে, নরেশবাবু?

নরেশ বলিল, কেন, বন্ধুত্ব কি একটা কারণ হ'তে পারে না?

চারু বলিল, সেইটেই ত' একমাত্র কারণ। বন্ধু ছাড়া অপরিচিতের অসুখ করলে কে আর রোজ দেখতে যায় বলুন?

নরেশ হাসিয়া কহিল, অপরিচিতের এবং অজ্ঞাতের সেবা করাটা সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম, চারুবাবু!

চারুও হাসিল, কহিল, বড় ধর্ম্ম বড়লোকদের জন্যেই থাক, আমি পারবো না। সে যাক্, শীগ্‌গীর বোধ হয় আমি কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাবো।

নরেশ বলিল, কোথায় যাবেন?

চারু বলিল, পরে শুনবেন। তার আগে আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। বেলা, তুমি চ'লে যাচ্ছো কেন? কালকের রাগ এখনও ভোল নি?

বেলার মনে রাগ ছিল না, কি যে ছিল, সে তাহা নিজেই জানে না। কিন্তু গতরাত্র হইতে সহস্র আবেগ তাহার মনের একান্তে পুঞ্জীকৃত হইতেছিল, তাহা সহসা নড়িয়া-চড়িয়া যেন গলিয়া পড়িতে চাহিল। তাহার আর যাওয়া হইল না, অদূরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

চারু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, কাল মিটিং বসলো প্রায় রাত্রি একটায়, ভাঙ্গলো চারটেয়। ভেতরে অনেক কিছু কাণ্ড ঘটেছে, মায় কোন কোন পর্ব্বতের চূড়া খ'সে পড়েছে। এই সব আলোচনা ইত্যাদি যখন শেষ হ'ল, তখন রাত্তিরও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ভোর রাত্তিরেই একজনকে সরতে হ'ল। দরকার হ'লে আমাকেও অতি শীঘ্র এমনি ক'রে স'রে পড়তে হবে। কে আসছে না?

নরেশ বলিল, বোধ হয় কাকা।

চারু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পায়ের শব্দে বোঝা যাচ্ছে উনি নন, অন্য কেউ।. তবে পুলিশও নয়, এই ভরসা।

কথাটা শুনিয়া সকলেই হাসিল। ক্ষণপরে পর্দা সরাইয়া যে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া বেলা ও নরেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নরেশ বলিয়া উঠিল, ধীরেন যে, হঠাৎ কোথা থেকে ?

ধীরেন ঘরের পর্দা ঠেলিয়া যেমন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশের প্রশ্নের উত্তরে কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

তাহার এই অবস্থা কাহারও চক্ষু এড়াইল না। বেলা কি বলিতে গিয়া পর্দার ফাঁকে সহসা দৃষ্টি পড়িতে বলিয়া উঠিল, বাইরে কে দাঁড়িয়ে না ?

ধীরেনের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ওটি রাজেনবাবু ব'লে একটি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমায় এক্ষুণি ওকে হোষ্টেলে রেখে আসতে হবে। আচ্ছা ভাই নরেশ, এখন যাই, পরে আসবো।

কেহই কিছু বুঝিল না, অথচ মনে হইল কি যেন ঘটিয়াছে। নরেশ বলিল, ওঁকে ভেতরে আসতে বলো। চন্দ্রা দেবী, আপনি ভেতরে আসুন না ?

ধীরেন আরক্তিম হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না, বা চন্দ্রাকেও আহ্বান করিতে পারিল না।

ঝড়—/

চন্দ্রা ভিতরে আসিল। আসিয়া নরেশকে নমস্কার করিয়া অতি স্থিরকণ্ঠে কহিল, আপনার অসুখের সংবাদ আগেই পেয়েছিলুম। কেমন আছেন দেখে যাবার জন্যে এসেছি।

মেয়েটির ধীর এবং বিনম্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিল, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ান্বিত করিল বেলাকে। সে এই সুন্দরী সপ্রতিভ মেয়েটির দিক হইতে সহসা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

নরেশ বলিল, আপনি বসুন, চন্দ্রা দেবী। পরে ধীরেনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ধীরেন, ব'স।

ধীরেন বলিল, না ভাই, কাজগুলো সেরে এসে আমি একবারেই বসবো। কই চন্দ্রা, চলো, আর দেরী ক'র না। আমার অনেক কাজ আছে।

চন্দ্রা নরেশের শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া বলিল, আপনি কাজ সেরে আসুন, তারপর যাবো।

ধীরেন সহসা চটিয়া উঠিল। কিন্তু ক্রোধ গোপন করিয়া বলিল, আর যদি শীগ্‌গীর না আসতে পারি?

চন্দ্রা তেমনি ধীরভাবে বলিল, হোষ্টেল বেশী দূর নয়, একাই যেতে পারবো। আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ধীরেনের মুখে যেন কে একপোঁচ কালী বুলাইয়া দিল। সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা পর্দা সরাইয়া চলিয়া গেল।

তাহার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে বিস্ময়ে কাহারও মুখে কোন কথা ফুটিল না। শুধু বিস্মিত হইল না চন্দ্রা। কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে চারু উঠিল, বলিল, আচ্ছা নরেশবাবু, আর একদিন আসবো।

চারু চলিয়া গেল। তিনজনে নিঃশব্দে বসিয়া তাহার পদশব্দ শুনিতে লাগিল।

প্রথম কথা কহিল নরেশ। চন্দ্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি কি এখন কলকাতাতেই আছেন?

চন্দ্রা বলিল, না, এইমাত্র কলকাতায় আসছি। এতদিন দেশেই ছিলুম।

নরেশ সবিস্ময়ে চন্দ্রার প্রতি চাহিল।

১৯

নরেশের বিস্ময়ের কারণ চন্দ্রা বুঝিল। বলিল, ধীরেনবাবু এতদিন আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। উনি কলকাতায় আসতে চাইলেন, আমারও বোর্ডিং খুলে গেছে, আমি ওঁর সঙ্গেই এসেছি। আপনাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হ'ল, তাই সোজা এখানে এসে উঠেছি।

নরেশ বলিল, আপনার বাবা এখন দেশেই আছেন ত'?

চন্দ্রা বলিল, হ্যাঁ, তিনি দেশেই আছেন।

নরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিল, ধীরেন আপনাদের ওখানে কবে গিছলো?

চন্দ্রা বলিল, উনি ত' আমাদের ওখানেই বরাবর ছিলেন। আপনি যে চিঠি লেখান, সেও ত' ঐ আমাদেরই ঠিকানায়।

নরেশের মুখ দুর্ভাবনায় কালো হইয়া উঠিল; ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বাড়ীর ঠিকানায় দু'খানা চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাই

নি। তাই আন্দাজে আপনাদের ঠিকানায় লিখে দিতে বলি। ও তা হ'লে বরাবর আপনাদের ওখানেই ছিল ?

চন্দ্রা হাসি গোপন করিয়া কহিল, হ্যাঁ, ওখানেই ছিলেন। আপনি এখন কেমন আছেন ?

নরেশ অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিল, ভাল আছি।

ইহার পর কথার সূত্র যেন হঠাৎ হারাইয়া গেল।

বেলা এতক্ষণ কোন কথাই কহে নাই। এইবার আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া কতকটা কেবল এই নীরবতা ভাঙ্গিবার জন্যই কহিল, আপনি কোন্ বোর্ডিংএ থাকেন ?

চন্দ্রা বোর্ডিংএর নাম করতেই বেলা বলিয়া উঠিল, আশাও যে ঐ বোর্ডিংএ আছে!

আশার ইতিহাস চন্দ্রার অবদিত নয়। কিন্তু সে অজ্ঞতার ভাণ করিয়া কহিল, আশা কে ?

বেলা সংক্ষেপে পরিচয় দিল, আমার একটি বন্ধু, এই স্কুলে নতুন ভর্ত্তি হ'য়েছে।

নরেশের বোধ হয় এতক্ষণে খেয়াল হইল, একজন তাহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছে, এ সময় চুপ করিয়া থাকা শোভা পায় না। কিন্তু কি বলিবে সহসা কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া যাহা মনে আসিল, বলিল, রাজেনবাবু কেমন আছেন ?

চন্দ্রা বলিল, ভালই আছেন।

নরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিল, তিনি কি এখন কলকাতায় আসবেন না ?

চন্দ্রা একটু ভাবিয়া বলিল, কিছুদিন পরে আসবেন।

নরেশ বেলার প্রতি চাহিয়া বলিল, এঁর পরিচয় তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছো? গ্রামে যখন আশ্রয়হীন হ'য়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, তখন এঁদের বাড়ীতেই আমরা স্থান পাই। সত্যি, তখন এমন অবস্থা হ'য়েছিল, যে একবেলা মাথা গোঁজবার স্থান ছিল না। ভাগ্যিস্ রাজেনবাবু তখন দেশে গিছলেন! বলিয়া নরেশ সকৌতুকে হাসিল।

এমনি কথাবার্ত্তার মধ্যে এতক্ষণের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গেল। এই মেয়েটি কখন জলের মত উভয়ের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেল, কেহই টের পাইল না। হাসি, গল্প এবং পরিহাসের ভিতর দিয়া সে এতখানি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল, যে দুই ভাই-ভগিনীর মধ্যে কেহই ভাবিতে পারিল না, মেয়েটি আজই নূতন এ-বাড়ীতে আসিয়াছে এবং তাও এখনও বেশীক্ষণ হয় নাই। নরেশের কবে অসুখ করিয়াছিল, কি অসুখ করিয়াছিল, এখন কেমন আছে, এবং এ-সকলের আদি কারণ সেই জেল-যাওয়ার ইতিহাস পর্য্যন্ত চন্দ্রা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিয়া লইল। নরেশ নিতান্ত সহজ ও সরল প্রাণে ইহার সহিত গল্প করিতে লাগিল। অথচ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ইহাকে লইয়া সে কত দুর্ভাবনা ভাবিতে বসিয়াছিল, সে-কথা সে ভুলিয়া গেল!

কথার মাঝখানে চন্দ্রা একসময়ে বলিয়া উঠিল, ধীরেনবাবু এখনও এলেন না,—এইবার আমাকে যেতে হবে। একটা গাড়ী আনিয়ে দিতে পারেন?

বেলা বলিয়া উঠিল, এখনও ত' আপনি বোর্ডিংএ ওঠেন নি, তবে এ-বেলা এখানে খেয়ে-দেয়ে একেবারে বিকালে বোর্ডিংএ গিয়ে উঠবেন!

চন্দ্রা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং অন্যদিন আসবো। আপনি একদিন আমাদের ওখানে চলুন না? আপনার বন্ধুও ত' ওখানে থাকেন বললেন।

বেলা প্রথম পরিচয়ে ইহাকে থাকিবার জন্য আর পেড়াপিড়ি করিল না, বলিল, আচ্ছা, আমি একদিন যাবো। কিন্তু তার আগে আপনাকে আর একদিন আসতে হবে। আমার বন্ধু আসবে, তারই সঙ্গে আসবেন।

চন্দ্রা যখন নরেশ ও বেলার নিকট হইতে বিদায় লইল, ধীরেন তখন নির্দ্দেশ-হীন ভাবনা সঙ্গে লইয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষণ তাহার মন পড়িয়া রহিল নরেশের ঘরটিতে। সেখানকার প্রতি দৃশ্যটি সে কল্পনায় দেখিতে লাগিল। তাহার আকস্মিক উপস্থিতিতে নরেশ ও বেলার মুখে যে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে এখনও স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। চন্দ্রা সঙ্গে থাকায় তাহাদের মনে যে সন্দেহ ও প্রশ্নের অন্ত ছিল না, তাহাও সে তেমনি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে লাগিল। এতক্ষণে বোধ হয় সব কিছু ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিবাহের কথা, চন্দ্রাকে লইয়া পলায়ন, প্রভৃতি কোনটাই বাকী নাই। সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া তাহাদের মনোভাব তাহার প্রতি কি রূপ ধারণ করিবে, তাহা অতি সহজেই বোধগম্য।

বন্ধু বলিয়া নরেশ হয়ত' তাহাকে একটু কৃপার চক্ষে দেখিবে, কিন্তু সে কোন্ মুখে এই কৃপাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া সেখানে আবার গিয়া দাঁড়াইতে পারে?

ধীরেনের মন গভীর হতাশায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, আর যেন চলিবারও শক্তি তাহার নাই। রাস্তার ধারে একটা পার্কে ঢুকিয়া সেখানে একটা খালি বেঞ্চির উপর সে বসিল এবং বসিয়াই তাহার মনে এই কথাটির উদয় হইল, পৃথিবীতে তাহার স্বজন কেহ রহিল না। পিতা তাহার মুখ দেখিবেন না, এতদিন যে আশ্রয়ে ছিল, তাহা গেল এবং তাহার যে অকৃত্রিম বন্ধু ছিল, আজকের ব্যাপারে সেও বহুদূরে সরিয়া গেল।

২০

কয়েকদিন পরে আশা কিছুক্ষণের ছুটী লইয়া বেলার কাছে আসিল।

নরেশের কাকীমা কি কাজে বাহিরে যাইতেছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এবার থেকে আর বোর্ডিংএ যেয়ো না, এইখানেই থাকো, কেমন ?

আশা সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল, বেলাদি' আছে, কাকীমা ?

কাকী বলিলেন, জানো না, সে যে কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছে ?

আশা বিস্মিত হইয়া বলিল, কই, আমাকে কিছু বলে নি ত' ? কবে ভর্ত্তি হ'য়েছে ?

কাকী বলিলেন, এই মোটে তিন-চার দিন। একটু পরেই ও এসে পড়বে। ওপরে গিয়ে ব'স না ততক্ষণ ?

আশা বলিল, কিন্তু আমার অল্পক্ষণের ছুটী, কাকীমা। সিষ্টার

এক জায়গায় গেলেন, আমাকে রেখে গেলেন। আবার ফেরবার মুখে তুলে নিয়ে যাবেন।

একথা বলার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই অতি অপ্রয়োজনের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন মনস্তত্ত্ব ছিল, কাকীর তাহা অবিদিত রহিল না; একটু হাসিয়া বলিলেন, যতক্ষণই ছুটী থাক, বাইরে ত' আর দাঁড়িয়ে থাকবে না? ওপরে যাও, আমিও এখুনি ফিরবো। বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

কাকী চলিয়া গেলে আশা একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া আরক্ত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে এক নরেশ ছাড়া আর কেহই নাই। ঝী-চাকরেরা সব নীচে আছে। এমনি অবস্থায় নরেশের নিকট যাওয়ার কল্পনায় সে লজ্জায় কাঠ হইয়া গেল। কাকীমা যে কি ভাবিয়া গেলেন, তিনিই জানেন। বেলাই বা আসিয়া কি ভাবিবে? কিন্তু এখনই ফিরিয়া যাওয়াও চলে না এবং ফিরিবার উপায়ও হাতে নাই।

নরেশ ঘুমাইতেছে কি জাগিয়া আছে, মনে মনে আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল, এবং উত্তর স্থির করিবার আগেই দেখিল এই বাড়ীর এক ভৃত্য তাহারই দিকে আসিতেছে। এখানে দাঁড়াইয়া থাকার দরুণ পাছে ইহার সপ্রশ্ন-দৃষ্টির মধ্যে পাড়তে হয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল, কিন্তু নরেশের ঘর পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া পড়িল।

নরেশ জাগিয়াই ছিল, পদশব্দ শুনিয়া বলিল, কে?

আশা কোন উত্তর করিতে পারিল না এবং নিজের

নীরবতাতেই সে আরও আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে সে এই লোকটিরই রোগশয্যায় রাত্রি কাটাইয়াছে। তখন কতদিন এঘরে অন্য কোন জনপ্রাণী ছিল না। কিন্তু সেদিন এই লজ্জা-ভাবের বিন্দুও তাহার মনে উঠে নাই।

নরেশ কোন উত্তর না পাইয়া নিজেই উঠিয়া আসিল এবং আশাকে দেখিয়া বলিল, তুমি? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

আশা এবারেও কোন কথা কহিল না। নরেশের পিছনে নীরবে ঘরের মধ্যে গিয়া একটা টুলের উপর বসিল।

নরেশ প্রশ্ন করিল, তুমি একা এসেছো?

আশা এ-প্রশ্নের কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না, তবু বলিল, হ্যাঁ।

নরেশ বলিল, তোমার সঙ্গে চন্দ্রার আসবার কথা ছিল। চন্দ্রাকে চেনো? তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে?

আশা বলিল, হ্যাঁ হয়েছে। ও এখানে এসেছিল, তাও ব'লেছে।

নরেশ বলিল, কথা ছিল তোমার সঙ্গে আর একদিন আসবে।

আশা কহিল, আমাকে ত' সে-কথা বললে না! তবু আসবার সময় ওকে ডাকলুম, এলো না। বললে কাজ আছে।

নরেশ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, খুব পড়ে বুঝি?

আশা কোন উত্তর করিল না। একটু পরে নরেশ কি ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় বলিল, গ্রামে থাকতে প্রথম যখন এঁর সঙ্গে আলাপ হয়, ভেবেছিলুম, হয় ত' সাধারণ মেয়ের মতনই

একজন কেউ হবে, এবং গ্রামের লোকের মুখে নানা কথা শুনে আরও ছোট ক'রেই দেখেছিলুম। ধীরেন যখন-তখন ও-বাড়ী যেতো, তাও আমি বন্ধ করতে চেয়েছিলুম।

আশা বলিল, ধীরেনবাবুর সঙ্গে ত' চন্দ্রাদি'র বিয়ের কথা হয়েছিল। বিয়ে হবে ব'লে ঠিকও ছিল।

নরেশ কি বলিতেছিল, থামিয়া সবিস্ময়ে কহিল, ধীরেনের সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে? কে বল্লে তোমাকে?

আশা বলিল, চন্দ্রাদি' নিজেই একদিন বলছিল।

নরেশ আশার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, চন্দ্রা নিজেই ব'লেছে? তারপর

আশা বলিল, তারপরে কি হ'য়েছিল ঠিক জানি না। কিন্তু চন্দ্রাদি' বোধহয় এ-বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। ধীরেনবাবুর সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হ'য়েছিল, এটা যেন ওর কাছে অত্যন্ত হাসির ব্যাপার। সেদিন এ-কথা বলতে গিয়ে হেসেই অস্থির।

নরেশের বিস্ময় কাটিতে ক্ষণকাল সময় লাগিল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, চন্দ্রা কোন ধরণের মেয়ে জানো? জলের স্রোতের মত। নিজের জোরে নিজে চলে, কোন বাধা মানে না। সুমুখে যা দাঁড়ায়, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আশা সবিস্ময়ে নরেশের দিকে চাহিল। এই স্বল্পভাষী লোকটি কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা সহজে করে না। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়ে সে চন্দ্রার ভিতরে এমন কি জলস্রোতের

কলকোলাহল শুনিতে পাইল, যাহাতে সে নিঃসঙ্কোচে বলিল, এই জলস্রোতের উজানে সব কিছুই ভাসিয়া যায়?

নরেশ পুনরায় কি বলিতেছিল, আশা শুনিল না, বাহিরে মোটরের শব্দ শুনিয়া বলিল, সিষ্টার এসেছেন, আমি চল্লুম। বেলাদি'কে বলবেন, আমি এসেছিলুম।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখিল, সিষ্টার আসেন নাই, কাকী বেলাকে লইয়া ফিরিয়াছেন।

বেলা নিকটে আসিয়া বলিল, কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছি, ভারী সখ হ'য়েছিল, তাই লাইব্রেরীতে ব'সে পড়ছিলুম। আমি ত' জানতুম না, তুই আসবি। তোর মুখ ভারী কেন রে?

আশা একটু হাসিয়া বলিল, কই, না।

বেলা তাহাকে টানিয়া বলিল, চল্।

আশা বলিল, না ভাই আর যাবো না, আর একদিন আসবো। এখন না ফিরলে মিস্ সেন বকবেন। তোমাদের গাড়ীটাতে আমাকে পৌঁছে দিতে বল না, ভাই?

বেলা বলিল, দাদার সঙ্গে কি ঝগড়া ক'রেছিস?

আশা ব্যস্ত হইয়া বলিল, ধ্যেৎ, ঝগড়া করবো কেন? তা নয়, একরকম না ব'লেই এসেছি, এখনই ফিরে যেতে হবে।

বেলা একটু হাসিয়া বলিল, বেশ ক'রেছিস। নে, তবে গাড়ীতে ওঠ।

গাড়ী গেট পার হইতেই আশা দেখিল চন্দ্রা পায়ে হাঁটিয়া এই বাড়ীতেই আসিতেছে। কেমন করিয়া সে ছুটী পাইল এবং

যদি আসিবে তবে তাহার সহিত আসিতে কি আপত্তি ছিল, কিছুই বুঝিল না। মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে চন্দ্রা তাহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া অভিবাদন জানাইল, কিন্তু আশা তাহার প্রত্যুত্তর দিবার অবকাশ পাইল না, গাড়ী এক নিমেষে বহুদূরে চলিয়া গেল।

২১

বেলা চন্দ্রাকে নরেশের ঘরে লইয়া গেল। আশা আসবার পূর্ব্বে নরেশ একটা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল, আশা চলিয়া যাইবার পর পুস্তকটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। চন্দ্রাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া সেটা নামাইয়া রাখিল। বলিল, আশা কোথায় গেল ?

উত্তর দিল বেলা। বলিল, চ'লে গেছে।

নরেশ বলিল, ওর সিষ্টার এসেছিলেন বুঝি ?

বেলা বলিল, কই, না ?

নরেশ বলিল, কেন, সিষ্টারের গাড়ী এসেছে ব'লে ও চ'লে গেল যে !

আশার মুখভারের কথা বেলার মনে পড়িল। তার উপর তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার ব্যাপারে তাহার মনে খটকা লাগিল। কিন্তু চন্দ্রার সম্মুখে কিছু প্রকাশ না করিয়া সংক্ষেপে বলিল, না, সে

আমাদের গাড়ীতেই গেছে। বেশীক্ষণ ছুটী ছিল না কিনা! পরে আশার প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দিবার জন্য চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমার কতক্ষণ ছুটী, ভাই?

চন্দ্রা মুখ না তুলিয়াই বলিল, আজীবন।

এই একটি অতি ছোট্ট কথা সে এমনি এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করিল, যে বেলা ও নরেশ এক সঙ্গেই তাহার দিকে চাহিল। কণ্ঠস্বরে কৌতুক ছিল, পরিহাসও ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন তীব্রতা যেন সব কিছুকে ছাপাইয়া গেল।

চন্দ্রা মুখ তুলিয়া উভয়কে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমি সিনিয়র বোর্ডার, তা ছাড়া সকলে আমাকে একটু স্নেহ করেন, এইজন্য আমার ওপর ওঁরা বেশী কড়াকড়ি করেন না। সন্ধ্যের মধ্যে ফিরলেই আমার চলবে।

নরেশ বলিল, তা না হয় ফিরবে। কিন্তু তুমি এলে কিসে? গাড়ী-ভাড়া ক'রে ত'? তার চেয়ে আশার সঙ্গে এলে না কেন?

চন্দ্রা বলিল, এখানে আসবার কোন স্থিরতা ছিল না তাই আশার সঙ্গে আসি নি। তা ছাড়া গাড়ী-ভাড়া করতে হয় নি, ট্রামেই এসেছি।

নরেশ সবিস্ময়ে বলিল, ট্রামে এসেছো? একা? তারপর নিজেই হাসিয়া বলিল, তোমাকে যে চেনে নি সে শুনে হয়ত' আশ্চর্য্য হবে, কিন্তু আমার আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নয়।

চন্দ্রা বলিল, আপনি আমাকে চিনে নিয়েছেন বুঝি?

নরেশ বলিল, চিনে নিয়েছি বললে ঠিক বলা হবে না, কিন্তু যেটুকু বুঝেছি, আশা করি তাতে কোন ভুল নেই।

চন্দ্রা বেলার দিকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিল, সে কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নরেশের দিকে চাহিয়া আছে। পরে নরেশকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল, আচ্ছা আমাকে কি-রকম চিনেছেন, নরেশবাবু?

তাহার কথা কহার ছেলেমানুষী ধরণে নরেশ হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বেলার এটা খুব ভাল লাগিল না। সে চন্দ্রাকে বলিল, তুমি একটু বসবে ভাই, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি?

চন্দ্রা সম্মতি জানাইতে সে চলিয়া গেল।

নরেশ মাসিক পত্রটা পুনরায় তুলিয়া লইয়া চন্দ্রাকে বলিল, এই কাগজে নারী সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। লেখক বলেছেন, নারীকে চেপে রেখে আমরা সমাজের খুব বড় একটা শক্তিকে পঙ্গু ক'রে রেখেছি, এবং সে কারণে দায়ী এক আমরাই, অর্থাৎ পুরুষরাই। লেখকের সঙ্গে সব জায়গায় আমার মতের মিল হয় না, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, সত্যিই একটা শক্তিকে আমরা নষ্ট ক'রে ফেলছি। সুযোগ পেলে তোমার মত কত মেয়ে কতদিকে উন্নতি করতে পারতো, কে জানে? বলিয়া সে চন্দ্রার দিকে চাহিল।

নিজের সম্বন্ধে এমনি অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়া চন্দ্রার সর্ব্বমন ব্যাপিয়া আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া গেল। কিন্তু

বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না, শুধু তাহার ওষ্ঠ-প্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

নরেশ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, হাসলে যে?

চন্দ্রা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, আপনি খুব মাসিক পত্রিকা পড়েন বুঝি?

নরেশ বলিল, খুব নয়, তবে এখন বন্দী হ'য়ে অবধি খুবই পড়ছি। কিন্তু আমি যা বললুম, সে সম্বন্ধে তুমি কিছু বললে না ত'?

চন্দ্রা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, নারীর শক্তি আছে কিনা, সে অন্য কথা, কিন্তু আপনারা সে-শক্তিকে চেপে রাখবার কে? আপনাদের সে অধিকারও নেই।

নরেশ বলিল, অধিকার নেই, কিন্তু অনধিকারেও ত' আমরা হাত দিতে যাচ্ছি! অবশ্য লেখকের মত আমি অতটা একদৃষ্টিমিষ্ট নই, তা সত্ত্বেও নিজেদের দোষ অস্বীকার করি না।

চন্দ্রা বলিল, দোষ-গুণের কথা বলছি না,—বলছি নারীদের সত্যিই যদি কোন শক্তি থাকে, আপনারা কি ক'রে তা চেপে রাখবেন?

নরেশ বলিল, কি ক'রে তা জানি না, কিন্তু চোখের ওপর দেখছি, নারীকে পুরুষ অল্প-বিস্তর চেপে রেখেছে। এ কথা আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না।

চন্দ্রা কি ভাবিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, শুনেছি নাকি একজন আর একজনকে দমন ক'রে, খর্ব্ব ক'রে তবে

বাঁচতে পায়! ঠিক এই কারণেই যদি স্ত্রী-পুরুষের ভেতরেও এমনি দ্বন্দ্ব চ'লে আসে,—তাতে দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে ?

নরেশ হাসিয়া বলিল, মনে হচ্ছে তুমি শুধু শুনে একথা বলছো। কিন্তু একটা কথা ভুল করছো,—পৃথিবীতে একজন একজনকে দমন করছে, আত্ম-রক্ষার জন্যে বটে; কিন্তু সেটা তার নিজের স্বার্থের জন্যে। নারী-পুরুষের সম্বন্ধ ত' ঠিক স্বার্থের সম্বন্ধ নয়,—এখানে স্বার্থের মাপ-কাঠি দিয়ে বিচার করলে চলবে কেন ?

চন্দ্রা এতক্ষণ এই আলোচনায় প্রবেশই করিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার সে যেন খেই খুঁজিয়া পাইল; আত্মবিশ্বাসের বলে একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বার্থের নয়, তবে ভালবাসার,—এই ত' ?

নরেশ লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারিল না।

চন্দ্রা নিজেই কহিল, তবে পুরুষ এতদিন নারীশক্তিকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে কেন ?

তর্কের মুখে নরেশের লজ্জা রহিল না। বলিল, তারও কারণ এই ভালবাসা। ভালবাসার জিনিষকে অতি একান্তভাবে পাবার লোভেই পুরুষ নারীর চারিদিকে এত গণ্ডী দিয়েছে, এত বিধি-নিয়ম করেছে।

চন্দ্রা বলিল, তবে ভালবাসাও স্বার্থের অন্য একটা রূপ বলুন! এ জিনিষটা লোককে শুধু নিজের দিকেই চাওয়ায়, নয় কি ?

নরেশ সহসা কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

চন্দ্রা বলিল, স্বার্থ থাক আর না থাক, নরেশবাবু, নারীর যদি শক্তি সত্যি কিছু থাকে, তা আছে, এবং থাকবেও। হয় ত' এইটাই সত্যি, সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যই নিজের সব শক্তি অন্যের হাতে অর্পণ ক'রেছে। এটাও হ'তে পারে ত'?

নরেশ এই মেয়েটির বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া উঠিতেছিল। বলিল, হ'তে পারে বৈ কি! কিন্তু তুমি কি মনে করো, তাই সত্যি? বর্ত্তমান সমাজে নারীর যা স্থান, সেইটেই কি তার প্রকৃত প্রাপ্য?

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল, সে কথা আমি কি ক'রে বলবো, নরেশবাবু? সমাজে আগে একটা স্থান ক'রে নিই, তারপর আপনার কথার উত্তর দেবো। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, এই যে পুরুষেরা নারীদের দুঃখে চোখের জল ফেলছে, এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছুই হ'তে পারে না। নারীর যদি জাগা প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, সে নিজেই জাগতে পারবে, ঠেলে জাগাতে হবে না। কাঁচা-ঘুম ভাঙানো ঠিক নয় জানেন ত? বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

বেলা এতক্ষণে ফিরিল। সঙ্গে কাঁচের গেলাসে নরেশের জন্য দুধ আনিয়াছিল, বলিল, দাদা, অনেক তর্ক ক'রেছো, বোধহয় ক্ষিধেও পেয়েছে।

নরেশ হাত বাড়াইয়া গেলাসটা লইলে বেলা চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমাদের তর্কের আসল ব্যাপারটা শুনি নি বটে, কিন্তু শেষের দিকটা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি চারুবাবুর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ। আচ্ছা দাদা, এইবারে আমাদের বাড়ীতে একটা ডিবেটিং ক্লাব খুললে কেমন হয় বল দেখি? তুমি হবে প্রেসিডেণ্ট, আমি সেক্রেটারী, চারুবাবু আর চন্দ্রা স্পিকার হবে। চন্দ্রা, এইবার ওঠ দিকিনি, আমার সঙ্গে এসো, একটু কাজ আছে।

এতক্ষণের তর্কের সমস্ত গুরুত্বকে এক দমকা হাওয়ার মত ভাসাইয়া দিয়া বেলা চন্দ্রাকে সঙ্গে লইয়া গেল। নরেশ উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া বসিল।

মিনিট দশেক পরে বেলা দাদার ঘরে ফিরিয়া আসিল। নরেশ তখনও তেমনি চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বলিল, চন্দ্রা চ'লে গেছে?

বেলা সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ।

নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, অদ্ভুত মেয়ে।

বেলা বলিল, তাই নাকি?

নরেশ বেলার কণ্ঠস্বরের উষ্ণতা লক্ষ্য করিল, কিন্তু মনে কিছুই না আনিয়া বলিল, সত্যিই তাই। ক্রমশঃই ওকে চিনতে পাচ্ছি—

কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বেলা বলিয়া উঠিল, ক্রমশঃ যে

তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছো, দাদা, একথাটাও মনে রেখো। বিশেষ ক'রে মনে রাখাটা যখন তোমার পক্ষে দরকারই।

বেলা আসিয়াছিল, আশার কি হইল, কেন সে রাগ করিয়াছে, ইহারই খবর লইতে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আর অপেক্ষা করিল না, নরেশকে অন্ধকারে এমনি আঘাত দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

২২

চন্দ্রা যখন বোর্ডিং-এ ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিত, ইহার মন সহসা এক উত্তাল আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সুশ্রী মুখের উপর আনন্দের উত্তেজনা এমনিভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, যে রাস্তার পথিকের দৃষ্টি তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপর না পড়িয়া পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার চক্ষু এ-সব দিকে ছিল না। তাহার একান্ত একাগ্র মনটি অন্তরের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছিল, এবং সেখানে কোন্ স্বপ্নসৌধ রচনা করিতেছিল, তাহার কোনই নির্দ্দেশ ছিল না।

আসিবার সময় বেলা তাহাকে গাড়ী দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে লয় নাই। ট্রামে ফিরিবে, ইহাই স্থির করিয়াছিল। নরেশের কথা তখনও তাহার মর্ম্মে বাজিতেছিল। এই ট্রামে-চড়া ব্যাপার

লইয়াই সে তাহাকে যে আসন দিয়াছে, সে-আসন যে উহার কাছে পাইবে, তাহা কল্পনাতীত ছিল।

এই কল্পনার সূত্র ধরিয়া সে ট্রাম-লাইনে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার ট্রামে চড়ার স্পৃহা আর রহিল না। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কর্ম্ম ফেরৎ এবং ভ্রমণেচ্ছুক যাত্রীতে প্রতি ট্রাম পরিপূর্ণ। এই বদ্ধ বাতাস ও লোকজনের মধ্যে বসিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। মনের মধ্যে যে-সুর বাজিতেছিল, এত লোকজনের মধ্যে তাহা যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

আর একটু আগাইয়া একটা গাড়ী লইবে স্থির করিল। চলিতে চলিতে দুই চোখে সে রাস্তা, বাড়ী, লোক-জন, সবই দেখিতে লাগিল, কিন্তু এ-সমস্ত ছায়ার মত সরিয়া যাইতে লাগিল, একটা জিনিষও তাহার মনকে স্পর্শ করিল না। তাহার মনের সবটুকু জুড়িয়া যাহা হিল্লোলিত হইতেছিল, তাহা না সত্য, না স্বপ্ন। এ-দুয়েরই মাঝামাঝি একটা জিনিষ আছে, যাহার অনুভূতি মানুষের প্রাণকে পুলকিত করে, অনির্দ্দেশের পিছুতে তাহাকে ছুটাইয়া দেয়; কিন্তু কিছু পাওয়াইয়া দেয় না, ধরাইয়া দেয় না। ইহার অন্ত না থাক, কিন্তু আদি আছে। চন্দ্রার প্রাণের আজকের নূতন ইতিহাসের আদি আছে, কিন্তু অন্তের স্থিরতা নাই।

রাস্তার মোড়ে সে একটা ট্যাক্সি লইল। বোর্ডিংএর পথ বেশীদূর ছিল না, অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী বোর্ডিংএর গেটে আসিয়া থামিল। গাড়ী বিদায় করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল,

বাহিরের বৃদ্ধ দারোয়ানটা তাহার দিকে একরকম ছুটিয়া আসিতেছে। চন্দ্রা বলিল, কি রামদীন?

বৃদ্ধ দারোয়ান যতদূর সম্ভব ব্যস্ততার সহিত বলিল, তোমার বাবা আসছেন, দিদিমণি।

চন্দ্রার বুকে এক ঝলক্ রক্ত ছলাৎ করিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া এত বড় কালো মেঘ জমিয়া আছে, আর সে কি সোনালী স্বপ্নেই না ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল!

বৃদ্ধ দারোয়ান তখনও বলিয়া চলিয়াছে, তিনি বহুৎক্ষণ এসেছেন। ভারী গোসা করেছেন। ব'লছেন, এখুনি তোমাকে ছাড়িয়ে লিয়ে যাবেন। মিস্-বাবা বহুৎ ক্ষণসে তোমাকে খুঁজছে, জলদি ক'রে যাও, দিদিমণি।

চন্দ্রা মোটেই ব্যস্ত হইল না। তাহার ভীত মুখমণ্ডল সহসা কঠিন হইয়া উঠিল এবং এতক্ষণের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যে-ভাব প্রকাশ পাইল, তাহাতে সুখ-দুঃখ যেন সব একাকার হইয়া গিয়াছে।

রাজেনবাবু চন্দ্রাকে দেখিয়া রাগিলেনও না, হাসিলেনও না, একবার তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া শুধু বলিলেন, আমার সঙ্গে চলো।

২৩

যে দিন রাজেনবাবু জানিলেন তাঁহার মেয়ে ধীরেনের সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সেদিন তাঁহার বিস্ময় ও ক্রোধের অন্ত রহিল না। দিনের পর দিন তিনি ধীরেনের উপর নিরন্তর চক্ষু রাখিয়াছিলেন, যদি কোন মুহূর্ত্তে সে পিছাইয়া যায়। এমনি করিয়া সমস্ত উপকরণ যখন সমাপ্ত হইয়া আসিল, ঠিক সেই সময়েই এই অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়! এ-বিপর্য্যয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যা ভয় করিয়াছিলেন, তাহা এ ধরণের নয়, অন্য ধরণের। তাই প্রথমে যেন তিনি ব্যাপারটা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপলব্ধি তাঁহাকে করিতে হইল। নিজের মেয়েকে তিনি চিনিতেন। পূর্ব্ব দিবস সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহাকে সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা তিনি হন নাই।

বাড়ীতে যে কয়জন আত্মীয়-অনাত্মীয় লোক আসিয়াছিল, তাহারাও কানাঘুষা শুনিল। কিন্তু না দেখিয়া-শুনিয়া সহসা রাজেনবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। ব্যাপারটা কি, ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অন্ততঃ একটা দিনও অপেক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কিন্তু রাজেনবাবু তাহাদের সে সুযোগ দিলেন না। সন্ধ্যার সময় তিনি গা-ঢাকা দিলেন, আর ফিরিলেন না। লোকেরা এক-দু'দিন অপেক্ষা করিয়া যে যার স্থানে ফিরিয়া গেল, এবং রসনা দ্বারা যতদূর পারা যায় সত্য-মিথ্যা ছড়াইয়া দিয়া গেল। গ্রামময় ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

রাজেনবাবু হতমান হইয়া একেবারে ধীরেনের বাবার কাছে উপস্থিত হইলেন। মনে আক্রোশ গর্জ্জাইয়া উঠিতেছিল, এতক্ষণ প্রকাশের সুযোগ পান নাই, এইবার মনের ঝাল মিটাইয়া ধীরেনের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া তিনি যাহা পারিলেন বলিয়া গেলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল এই যে, অম্বিকাবাবুর মত প্রবল প্রতাপান্বিত ক্রোধ-পরায়ণ জমিদার রাজেনবাবুর এই অনল উদ্গারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। একাগ্র মনে রাজেনবাবুর সব কথা শুনিয়া গেলেন, এবং এত কথার যে টুকু সার তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহা এই যে, ঘটনা যাহাই ঘটিয়া থাকুক, সত্যকার বিবাহ বলিয়া পদার্থ হয় নাই। নিজের সরকার এককড়িকে তিনি চিনিতেন। জমিদারী-চালান বুদ্ধিতে বুঝিলেন, এ ব্যাপারে তাহার হাত নিশ্চয়ই আছে এবং হয় ত বা একাজ

তাহারই চক্রান্তে হইয়াছে। চক্রে অনেক জটিলতা থাকে এবং সে জটিলতা ভেদ করিয়া বোধ হয় রাজেনবাবুই আসল খবর আজও জানিতে পারেন নাই। এককড়ি না আসা পর্য্যন্ত তিনিও কিছু জানিতে পারিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহা জানিলেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

রাজেনবাবুর উপর তাঁহার অসীম ক্রোধ ছিল। এই লোকটাই মেয়ের রূপ দেখাইয়া ধীরেনকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এত শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধির সংবাদে তাঁহার মন হইতে সে ক্রোধ চলিয়া গেল। রাজেনবাবুর বক্তব্য নিঃশব্দে শুনিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, ছেলের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই, সে কি করিয়াছে না করিয়াছে, তিনি কিছু জানেন না, বা জানিতেও চাহেন না।

রাজেনবাবু যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আপনার ছেলেকে আমি জেলে দিতে পারি, তা জানেন?

অম্বিকাবাবু নির্ব্বিকারচিত্তে ধূম পান করিতে করিতে বলিলেন, বেশ, তাই দেবেন!

দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের উত্তাপে রাজেনবাবু প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিলেন না, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই জেলে দেবো। কিন্তু আপনাকে বাদ দেবো তা মনে করবেন না, আপনার মত অনেক জমিদারকে আমি আদা-জল খাইয়েছি মনে রাখবেন।

অম্বিকাবাবুর মনে এইবার ক্রোধের সঞ্চার হইল। এত বড়

কথা তাঁহার মুখের উপর কেহ বলে না। ক্রোধান্ধ রাজেনবাবুর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে দারোয়ান দিয়ে তাড়াবো। বেল্লিক্ কোথাকার!

দারোয়ান ডাকিবার দরকার হইল না। রাজেনবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

অম্বিকাবাবু ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং চক্রাকার ধূমের মত তাঁহার মনে নানা কথার চক্র খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দেশে ফিরিবার মুখ রাজেনবাবুর ছিল না, মনও ছিল না। তিনি কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া যে সংবাদ শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার গাত্রদাহ, ক্রোধ, আক্রোশ, অপমান, সব এই সংবাদের বহ্নিনিম্নে স্তব্ধ হইয়া গেল।

শুনিলেন, কুসুমকুমারী মৃত্যুশয্যায়।

২৪

রাজেনবাবু পূর্ব্ব হইতেই গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। চন্দ্রাকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিলেন। বোর্ডিংএর কর্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, কাল তিনি লোক পাঠাইবেন, জিনিষ-পত্র যেন তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মিস্ সেন শুষ্কমুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। চন্দ্রা স্কুলের মধ্যে ভাল মেয়ে, এবং সকলেই তাহাকে স্নেহ করে। রাজেনবাবু তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন বলিয়া মিস্ সেনের দুঃখ হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি রাজেনবাবুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর কয়েকমাস গেলেই চন্দ্রা একটা পাশ করিবে, সেই কয়মাস যেন তাহাকে রাখিয়া দেওয়া হয়। রাজেনবাবু কোনমতেই সম্মত হইলেন না। অথচ কি কারণে চন্দ্রাকে লইয়া যাইতেছেন, তাহাও খুলিয়া বলিলেন না।

মিস্ সেন তবু যেটুক জানিলেন, চন্দ্রা তাহাও জানিল না। সে শুধু এইটুকু জানিল, তাহাকে এখান হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে একবার মিস্ সেনের ব্যথাতুর মুখের দিকে চাহিল, সঙ্গীদের কথা একবার স্মরণ করিল, তারপর পিতার সহিত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

পথে পিতা-পুত্রীর কোন কথাই হইল না। চন্দ্রা বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিল, রাজেনবাবু যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন। এমনি করিয়া সমস্ত পথ অতিবাহিত হইল। বাড়ীর দোরে গাড়ী থামিলে রাজেনবাবু প্রথমে নামিলেন, তারপর চন্দ্রা নামিল! নামিয়া সে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইল না। রাজেনবাবু বলিলেন, ওপরে এসো।

দ্বিতলের এক ঘরে গিয়া রাজেনবাবু চন্দ্রাকে বলিলেন, ব'স।

চন্দ্রা বসিল। রাজেনবাবু দরজা বন্ধ করিয়া চন্দ্রার নিকটে আসিয়া বসিলেন।

প্রথমটা কেহ কোন কথা কহিল না। পরে রাজেনবাবু সহসা দুই কাঁধ নাড়াইয়া এক প্রকার শব্দ করিয়া নড়িয়া বসিলেন। চন্দ্রার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, ধীরেন কোথায়?

চন্দ্রা কহিল, আমি জানি না।

রাজেনবাবু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, বোধ হয় বাপের কাছে ফিরে গেছে। যাক্, তোমাকে কি জন্যে আনিয়েছি জানো না বোধ হয়?

চন্দ্রা চুপ করিয়া রহিল। রাজেনবাবু বলিতে লাগিলেন,

তোমাকে আর বোর্ডিংএ ফিরে যেতে হবে না। জিনিষ-পত্র কালই এসে পৌঁছুবে। আর গোচ্চার প'ড়েই বা কি হবে? বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের পক্ষে এই যথেষ্ট।

চন্দ্রা চুপ করিয়াই রহিল।

রাজেনবাবু পুনরায় বলিলেন, হ্যাঁ, তোমাকে যা বল্‌তে যাচ্ছিলুম্‌,—তোমার মার বড্ড অসুখ, বোধ হয় আর বাঁচবে না। সেই জন্যেই তোমাকে আনা, বুঝলে?

এত বিস্ময় চন্দ্রার আর কিছুতেই হইত না। যাহা কোনদিন শুনে নাই, শুনিবে এমন সম্ভাবনা নাই, আজ একান্ত অপ্রত্যাশিত সেই বাণী শুনিয়া চন্দ্রা যেন নিজের শ্রবণ-শক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মা নাই ইহাই সে জানে, সুতরাং মা থাকার সম্ভাবনা মনে উঠিতে পারে না। সে বরাবর বোর্ডিংএ থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে। পিতার সহিত তাহার এইটুকু সম্বন্ধ ছিল, তিনি মাসে মাসে তাহার খরচ দিতেন এবং অন্য মেয়েদের অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়াই দিতেন। সুতরাং তাহার বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই খ্যাতি ছিল। বড় বড় ছুটীতে যখন বোর্ডিংএ কোন মেয়েই থাকিত না, তখন সেও চলিয়া আসিত এবং ঠিক এই ঘরটিতেই আশ্রয় লইত। বাড়ীতে তিনটী প্রাণীকে সে দেখিতে পাইত। এক তাহার পিতা, অন্য এক বুড়ী ঝী, অপর একজন পাচক। পিতাকে সে খুব কমই বাড়ীতে দেখিত এবং আরও কম তাঁহার সহিত কথা বলিত। পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন এই বাড়ীটিতে থাকিতে থাকিতে তাহার

প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। জানালার গরাদে মাথা রাখিয়া কর্ম্ম-মুখরিত জগতের যে-টুকু অংশ সে দেখিতে পাইত, তাহাতে সে তাহার সমস্ত অন্তর ঢালিয়া দিত, এবং কায়মনোবাক্যে ইহাই ভাবিত, কবে সে এই বন্ধ কারা হইতে মুক্তি পাইবে!

বাড়ীর এই বৃদ্ধা ঝী'টির সহিত তাহার অনেক কথা হইত। ইহারই মুখে সে তাহার নিজের জীবনের ও পিতার জীবনের অনেক কথা শুনিয়াছিল। ইহারই মুখে সে শুনিয়াছিল, তাহাকে শিশু অবস্থায় রাখিয়া তাহার মা মারা যান, তারপর দাইয়ের হাতে সে মানুষ হয়। একটু বড় হইতেই সে বোর্ডিংএ যায়। মা'র অকাল-মৃত্যুর ইতিহাস সম্বন্ধেও সে একটু একটু শুনিয়াছিল। তার বাবা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, এবং সেই অত্যাচারের ফলেই তাহার মা একদিন আত্মহত্যা করেন। তারপরেই তার বাবা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন, সম্পত্তির অর্দ্ধেক বিক্রয় হইয়া যায়। মেয়েকে বোর্ডিংএ পাঠাইয়া অপ্রতিহত গতিতে সেই উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত তিনি এখনও অব্যাহত রাখিয়াছেন। শুধু মেয়ে থাকিলে তিনি বাড়ীতে একটু সাবধান হইয়া থাকেন মাত্র।

মায়ের ইতিহাস সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় ছিল, এবং এই কাহিনী তাহার নিকট এতই অতীত হইয়া গিয়াছিল, যে তাহার ভাবনার দ্বারেও ইহার ছায়া-স্পর্শ হইত না। তাই আজ রাজেনবাবু যখন তাহাকে মাতার রোগ-সংবাদ দিলেন, তখন সে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনটাই করিল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া রাজেন-বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজেনবাবু বলিতে লাগিলেন, দেশে থাকতেই তোমার মা'র অসুখ হয়, আমি কোন খবর পাই নি। তারপর এসে দেখি, এই অবস্থা। তিনি তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, প্রস্তুত হ'য়ে থাকো, একটু পরে এসে নিয়ে যাবো।

চন্দ্রার নির্ব্বাক কণ্ঠে বাক্য ফুটিল। সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, কে আমার মা?

রাজেনবাবু একবার চোখ তুলিয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, তারপর মুখ নীচু করিয়া বলিলেন, ব'স, বলছি।

চন্দ্রা বসিল না, দাঁড়াইয়াই রহিল।

রাজেনবাবু কি বলিবেন, বোধ হয় ভাবিয়া লইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, সমাজে তোমার মা'র স্থান নেই।

চন্দ্রার চোখের সম্মুখে সহসা যেন এক যবনিকাপাত হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া কহিল, আমার মা মারা গেছেন।

রাজেনবাবু তেমনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন, না, তোমার মা মারা যান নি, যে মারা গেছে, সে আমার স্ত্রী।

চন্দ্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। দুই হাতের মুঠোয় শয্যার প্রান্তটা চাপিয়া ধরিয়া কোনরূপে নিজেকে সচেতন করিয়া রাখিল এবং মনকে ইহাই বুঝাইতে লাগিল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না, বাস্তবতার চরমে গিয়া জাগ্রত হইয়া আছে।

রাজেনবাবু মুখ তুলিয়া চন্দ্রার প্রতি চাহিলেন না। আজ তাঁহাকে সব কথা বলিতে হইবে। বলিলেন, যে মারা গেছে, সে

আমার স্ত্রী। তার কোন মেয়ে ছিল না, এক ছেলে ছিল। একদিন বাড়ী এসে দেখি, ছেলে শুদ্ধু সে নেই। খোঁজ ক'রে যখন সন্ধান পেলুম, শুনলুম, তার আগেই সে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ কেস-টেস্ অনেক হ'ল, সে-সব থাক্,—ছেলেকেও আমি পেলুম না। পরে আর বিশেষ খোঁজও করি নি। এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাঁহার সহসা চেতনা হইল, কাহার নিকট কি বলিতেছেন! তাঁহার ঠোঁটের কোণে অলক্ষ্যে এক অদ্ভুত হাসি খেলিয়া গেল। অসংলগ্নতা হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া বলিলেন, তোমার মা এখন এইখানেই আছেন। তাঁরই ইচ্ছামত তোমাকে ছেলে-বেলাতেই বোর্ডিংএ পাঠিয়ে দিই এবং আসল পরিচয় থেকে তোমাকে বরাবর দূরে রাখি। জন্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়। অন্ততঃ আমি সেই ধারণা নিয়ে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ভগবানের তা ইচ্ছে ছিল না। বলিয়া তিনি একটু মৃদু হাসিলেন। এতক্ষণের পর স্থির-প্রতিমা চন্দ্রার প্রতি চাহিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, এ-সব কথা তোমাকে কোনদিন শোনাবো ভাবি নি, কিন্তু আজ শোনাতে হ'ল। পৃথিবীতে এমনিধারা আশ্চর্য্য অনেক কিছুই ঘটে, মানুষকে স'য়ে নিতে হয়। আচ্ছা, আমি একটু পরে আসছি। তোমার মাকে খবর দিয়ে আসি। বলিয়া রাজেনবাবু নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

২৫

কলিকাতার এই বাড়ীটির আশে পাশের প্রাচীর ও গৃহ এ বাড়ীর লোকদের চক্ষুকে যেন ঘেরিয়া রাখিয়াছে। প্রতিদিন সকালে প্রতি গৃহের লোক জাগিয়া উঠে, ধীরে ধীরে কোলাহল বাড়িতে থাকে, মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া যায়, সন্ধ্যার পর আবার দ্বিগুণিত হইয়া উঠে, তারপর একটু রাত্র হইতেই সব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। রাস্তা হইতে দু'একটা রিকৃসা চলার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ, কিম্বা দ্রুতগ্রামী মোটরের শব্দ ছাড়া জাগ্রতের কোন লক্ষণই থাকে না। এ-বাড়ী হইতে যাহারা বাহির হইতে পায় না, তাহারা পৃথিবী সম্বন্ধে এইটুকুই খবর পায়।

আর একটু খবর পাওয়া যায়, একটি জানালা হইতে যেখানে রাস্তার কিঞ্চিৎ অংশ দেখা যায়। এইটুকু দিয়া কত লোক হাঁটিয়া কতদূরে চলিয়া যায়, কত বিচিত্র যান ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি-পথে পড়িয়া সরিয়া যায় এবং এইটুকুর ভিতর কত কাণ্ডই না ঘটে!

এ-বাড়ীর অন্তরালে যে একটি অনন্তপ্রায় পৃথিবী রহিয়াছে, তাহারই এক বিস্মৃত ক্ষুদ্রতম অংশ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রা এই জানালায় মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল। তাহার জীবনে যে বিপ্লব ঘটিয়া আমূল বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, ভাবিতেছিল, ইহার তুলনা পৃথিবীতে কোথাও নাই। তিল তিল করিয়া সে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা সে মধুময় বলিয়াই ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একদিন যখন এই সঞ্চিত মধুভাণ্ডে দুই হাত পূরিয়া মধু আহরণ করিতে থাকিবে, তখন হইতে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত ইহা নিঃশেষ হইবে না। কিন্তু কে জানিত, এ সকলেরই মূলে এত ব্যর্থতা, এতখানি বিষ লুকাইয়াছিল? এতদিনের এত পরিশ্রম, এত আনন্দ, এমনি এক মূহূর্ত্তে এত বিষাক্ত হইয়া উঠিবে, কে জানিত?

রাস্তায় জনগণের চলাচলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সে ভাবিতেছিল, এখন সহসা যদি সে মরিয়া যায়, কোথাও কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। সংসার যেমন চলিতেছে, তেমনিই চলিবে। শুধু তাহার অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে, এইটেই যা সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন এবং সব চেয়ে বড় লাভ। আজ যদি সে মরে, তবে অভিশাপের বোঝা মাথায় লইয়াই মরিবে। আগে মরিলে কি ক্ষতি হইত? কিছুই না। এই নিদারুণ সত্য প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভগবান তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি লুপ্ত করিয়া দিলেন না কেন? তাঁহার বিরাট সৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র শক্তির উপর

দুর্ভার বোঝা চাপাইয়া তাঁহার কোন্ ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইল ?

ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, কে করাঘাত করিল। চন্দ্রার বুকের রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া সে আস্তে আস্তে দোর খুলিয়া দিল।

পুরাতন বৃদ্ধা ঝীকে বোধ হয় বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, তাহার স্থানে আর এক নূতন ঝী কাজ করিতেছে। সে-ই ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, মা আপনাকে ডাকছেন।

চন্দ্রা নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল, বলিল, চলো। ঝীএর পিছু পিছু সে কুসুমকুমারীর ঘরে প্রবেশ করিল। কাল প্রথম সে এ-ঘরে আসিয়াছিল, আজ দ্বিতীয় বার আসিল। ঝী তাহাকে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুমকুমারী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া শয্যায় বসিতে বলিল। কিন্তু ইহার আদেশ পালন করিতে গিয়া চন্দ্রার সর্ব্বশরীর এক অব্যক্ত উত্তেজনায় রী-রী করিয়া উঠিল। সে কিছুতেই শয্যাটার উপর বসিতে পারিল না, আশে-পাশে চাহিয়া দেখিল বসিবার আর দ্বিতীয় স্থান নাই, অগত্যা দাঁড়াইয়াই রহিল।

কুসুম তাহার মনের ভাব বুঝিল, বুঝিয়া কি ভাবিল, সেই জানে, কিন্তু বসিবার জন্য আর অনুরোধ করিল না। রোগশীর্ণ হাত বাড়াইয়া শয্যার নিম্ন হইতে একগোছা চাবি বাহির করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, এই বড় চাবি দিয়ে আলমারীটা একবার খোল ত'? দোরটা আগে দিয়ে দাও।

আলমারীটা খুলে একটা লাল-ফিতে বাঁধা কাগজ পাবে, সেটা বার করো।

চন্দ্রা কাগজ আনিলে কুসুম কহিল, ওর মধ্যে একটা উইল আছে, প'ড়ে শোনাও।

অনেক কাগজ-পত্র ছিল, তাহার মধ্য হইতে উইল বাছিয়া চন্দ্রা তাহা পড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর পড়িয়াই সে সহসা থামিয়া গেল এবং তাহার মনে হইল, যেন মুখ চোখ দিয়া আগুণ ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

কুসুম চোখ বুজিয়াছিল, এ-সকল কিছুই লক্ষ্য করিল না, বলিল, পড়'।

চন্দ্রা নিজেকে যেন চাবুক মারিয়া সংযত করিয়া লইল। তারপর অবিকম্পিত কণ্ঠে উইল গোড়া হইতে পড়িতে লাগিল।

ব্যাঙ্কে কুসুমের নামে পনের হাজার টাকা জমা ছিল, সেটা সে চন্দ্রার নামে লিখিয়া দিয়াছে।

পড়া শেষ হইলে কুসুম বলিল, এইবার ওটা রেখে দাও।

চন্দ্রা কাগজপত্র যথাস্থানে রাখিয়া আলমারীতে তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা সন্তর্পণে বিছানার উপর ফেলিয়া দিল। কুসুম ইহা লক্ষ্য করিল, কি বলিতে যাইতেছিল, ক্ষণেকের জন্য থামিয়া গেল, তারপর ক্লিষ্টস্বরে কহিল, আর একটা কথা তোমাকে বলবার আছে। আচ্ছা থাক্, উনিই বলবেন 'খন। দাঁড়িয়ে থেকে তোমার কষ্ট হ'চ্ছে, তুমি ঘরে যাও।

চন্দ্রা বাহির হইতে পারিলে বাঁচে। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে একরকম ছুটিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল, এবং সশব্দে দোরে খিল লাগাইয়া জানালার ধারটায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার দুই হাতের তালু যেন জ্বলিতেছিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে দুইটা গরাদ চাপিয়া ধরিয়া শীতল লৌহস্পর্শে হাতের জ্বালা নিবাইতে লাগিল, এবং উত্তপ্ত কপাল সেই কঠিন গরাদের উপর ঘসিতে ঘসিতে থাকিয়া থাকিয়া মুখ হইতে একপ্রকার অস্ফুট শব্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

পরের দুইদিন চন্দ্রার কি করিয়া কাটিল, তাহা এক অন্তর্য্যামীই জানেন। আঘাত পাইতে পাইতে মানুষের এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সেটা আলোচনা করিয়া দেখিবার মত অবস্থা তাহার থাকে না। চন্দ্রার মনে ইহার পর যেন ক্ষোভ-দুঃখ সব বিলীন হইয়া গেল, কোন কিছু ভাবিবার রহিল না, চিন্তা-হীন, আশা-হীন ভাবে কলের মানুষের মত দিন কাটাইতে লাগিল।

এমনি করিয়া কতদিন কাটিত বলা যায় না, কিন্তু চন্দ্রার ভাগ্যে আরও সঞ্চিত ছিল। এই দুই দিনের মধ্যে কুসুম তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, এবং রাজেনবাবুও দিনান্তে একবার তাহার শরীর সম্বন্ধে খোঁজ লওয়া ছাড়া দ্বিতীয়বার আসেন নাই। কিন্তু ইহার পরদিন রাজেনবাবু যখন আসিলেন, তখন দূর হইতে চন্দ্রার শরীর কেমন আছে জানিয়াই বিদায় লইলেন না, দরজাটা বন্ধ করিয়া শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন। চন্দ্রা সেই জানালার ধারে বসিয়াছিল। বুঝিল, রাজেনবাবু কিছু বলিবার

জন্যই আসিয়াছেন। সে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইল না, শান্তচিত্তে কথাটা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজেনবাবু বলিলেন, তুমি এই দু'দিন তোমার মা'র কাছে যাও নি, না?

চন্দ্রা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

মাটিতে একটা কাগজ পড়িয়াছিল। রাজেনবাবু সেটা কুড়াইয়া লইয়া সেইদিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা ছিল, কিন্তু তোমার অসুবিধে হবে ব'লে আর ডেকে পাঠায় নি। আমারই ওপর বলার ভার পড়েছে। আমাকেই বলতে হবে। বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তারপর একটু ভাবিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, যা বোঝবার তা ত' তুমি বুঝলে এই ক'দিনে, আর যা শোনবার, তাও শুনলে। এরপর আর কি করবার আছে? একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, কিন্তু এমনি ক'রে ত' বরাবর চলতে পারে না, বিশেষ তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার ত' চলতেই পারে না। পৃথিবীতে ভাল-মন্দ দুইই আছে, এবং দু'য়ের ভেতরে থেকেই মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়।

রাজেনবাবু কি বলিতে চান, চন্দ্রা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। আসল কথাটা শুনিবার অপেক্ষায় চুপ করিয়া রহিল।

রাজেনবাবু বলিলেন, তোমার ভাল করবার জন্যে ত' যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিলুম, এবং হ'লে ত' ভালই হ'ত; অন্যপক্ষেও কোন

ক্ষতি ছিল না,—কিন্তু তা ত' আর হ'ল না! এখন বাকী চেষ্টাটুকু করতে হবে। এই কথাই তোমার মা তোমাকে বলতে চেয়েছিলেন।

তথাপি চন্দ্রা কিছু বুঝিল না। সে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে রাজেনবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজেনবাবু বুঝিলেন, বুঝিয়া কথাটা ভাঙ্গিয়াই বলিলেন, তোমার মা'র যা অবস্থা, কবে মারা যান কোনই স্থিরতা নেই। তাঁর ইচ্ছে, তার আগেই তোমার বিয়ে দেবেন। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার আর ত' কোন উপায় নেই! তিনি সব ঠিক ক'রেই রেখেছেন। ঠকানো, প্রবঞ্চনা, কিছুই করতে হবে না,—মানুষকে মানুষ ব'লেই গ্রহণ করবে, এমন লোকও ত' আছে! সে কথা থাক, তোমার মা তোমাকে এই কথাটা বলতে চেয়েছিলেন, পারেন নি, তাই আমি ব'লে যাচ্ছি। তুমি ওঁর সম্বন্ধে যা ইচ্ছে ভাবো, কিন্তু এইটুকু জেনো, ওঁর মত তোমার শুভানুধ্যায়ী পৃথিবীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। শুধু তোমার সম্বন্ধে ভেবে ভেবেই আজ এই দশা। তুমি উত্তেজিত না হ'য়ে ভাল ক'রে ভেবে দেখো। বলিয়া রাজেনবাবু [illegible] দ্রুতপদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রার ইচ্ছা হইল, সে একটা বিরাট চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না। ইচ্ছা হইল পিছন হইতে রাজেনবাবুকে ধরিয়া আনিয়া এই শঠ কপটকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে; কিন্তু সে যেমন বসিয়াছিল, তেমনই

বসিয়া রহিল, একটু নড়িতেও পারিল না। তাহার মস্তিষ্কে ভাবনা-চিন্তা প্রবেশ করিবার মত যেন লেশমাত্র স্থানও ছিল না, কিন্তু বহুদিনের বহু স্মৃতি সহসা নাড়া পাইয়া কিল্‌বিল্‌ করিয়া উঠিল। বোর্ডিং-এর কথা মনে পড়িল, মিস্‌ সেনের কথা মনে পড়িল, দু-একজন বন্ধুর কথা মনে পড়িল, দেশের বাড়ীতে ধীরেনের কথা মনে পড়িল, নরেশের কথা মনে পড়িল এবং এইখানে আসিয়া সে সহসা থামিয়া গেল। ইজি-চেয়ারে শায়িত এই শান্ত লোকটিকে সম্মুখে রাখিয়া সে অর্দ্ধ-জাগ্রত, অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় চুপ করিয়া রহিল। এবং ইহারই মধ্যে তাহার মাথায় কোন্‌ ভাবনা ঢুকিয়া তাহার সর্ব্বচেতনাকে সহসা সচকিত করিয়া তুলিল। অকস্মাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিজের ছোট হাত-বাক্সটি খুলিয়া কয়েকটি টাকা বাহির করিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না; সকলের অলক্ষ্যে সে একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে যে গাড়ী পাইল তাহাতে উঠিয়া নরেশের ঠিকানায় চালাইতে আদেশ দিল।

২৬

এমন এক-একটা ঘটনা ঘটিয়া যায়, যাহাতে সুদূর ভবিষ্যৎ একেবারে হাতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহার জন্য মানুষ দিন গোণে, দিন-গোণা সহসা শেষ হইয়া যায়।

সকালে বেলা পিতার নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া আনন্দিত হইবে, কি দুঃখিত হইবে, ঠিক করিতে পারিল না। তাহার কাকী গৃহমধ্যে কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, সেখানে গিয়া বলিল, কাকীমা, বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন।

কাকী কিছুমাত্র কৌতূহলী না হইয়া বলিলেন, কি লিখেছেন? ভাল আছেন ত?

বেলা বলিল, হ্যাঁ, তিনি ভাল আছেন, কিন্তু লিখেছেন, আশার মা'র ভারী অসুখ।

কাকী মুখ তুলিয়া বলিলেন, তাই নাকি? কিন্তু কই, আশা ত' সেদিন কিছু ব'লে গেল না।

বেলা বলিল, আশা বোধ হয় জানতো না। বাবা লিখেছেন, তাঁর অসুখটা হঠাৎ একটু বেশী রকমের হ'য়ে গেছে। আর কি লিখেছেন জানো? অসুখে প'ড়ে আশার মা'র ইচ্ছে হয়েছে, শীগ্‌গীরই মেয়ের বিয়ে দেবেন। বিয়ে যে কোথায় দেবেন, সে ত' জানই! তাই বাবা তোমাদের আমার আর দাদার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছেন।

কাকী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এতে আর মতামত কি? এ যে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বেলা একটু হাসিল। আনন্দের আতিশয্যে সে আর বসিল না, বলিল, আমি যাই, আশাকে সুখবরটা দিয়ে আসি। তারপর আশাকে শুদ্ধ নিয়ে এসে দাদাকে সারপ্রাইজ করবো, আর আশাকেও অপ্রস্তুতে ফেলবো, কি বল কাকীমা?

কাকী বলিলেন, আশার মা'র অসুখ, তাকে সুখবর দেবে কি কথা?

বেলা একটু অপ্রতিভ হইল, বলিল, তবে যাই, ও কোন চিঠিপত্তর পেয়েছে কিনা একবার খোঁজ নিয়ে আসি। বলিয়া সে একটু অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দাদার বিয়েটা শীগ্‌গীর হ'য়ে গেলে ভালই হয়, কাকীমা! সারতে না সারতে দাদা যে রকম স্বদেশ-উদ্ধার কল্পনায় লেগে গেছে, আবার কোন্ দিন জেলে যাবে। রোজ বিকালে ওর ঘরে যে কত ছেলে আসে, আর কত কথা বলে, কোন সি-আই-ডি শুনলে পত্রপাঠ শ্রীঘরের ব্যবস্থা না ক'রে ছাড়বে না।

বেলা আশার বোর্ডিং-এ গিয়া দেখিল সে নিবিষ্টমনে একটা বই পড়িতেছে। বেলাকে দেখিয়া সে একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, হঠাৎ সকালেই যে?

বেলা বলিল, কোন কাজ ছিল না, অমনি বেড়াতে এলুম। হ্যাঁ রে, মেসো-মশায়ের কোন চিঠিপত্তর পেয়েছিস?

আশা বলিল, কই না' অনেকদিন আগে পেয়েছিলুম। কেন বল ত?

বেলা আসল কথা চাপিয়া গেল। বলিল, অমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম। মিস্ সেনের কাছ থেকে তোর হ'য়ে ছুটী নিয়েছি, আমাদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আস্‌বি চল। বলিয়া সে আশার বইটা বন্ধ করিয়া দিল।

আশা বলিল, না ভাই, ছুটীর ব্যাপারে মিস্ সেন ভারী কড়া হ'য়েছেন। চন্দ্রাদি'র ব্যাপার জানো ত'?

বেলা বলিল, না, কি হ'য়েছে?

আশা বলিল, একদিন চন্দ্রাদি' ছুটী নিয়ে কোথায় গিছলো, ইতিমধ্যে তার বাবা এসে উপস্থিত! মেয়েকে দেখতে না পেয়ে তিনি রাগারাগি ক'রে চন্দ্রাদি'কে বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। এমন কি এখনও পর্য্যন্ত স্কুলেই আস্‌তে দেন নি।

বেলা বিস্মিত হইল, বলিল, তাই নাকি? সে এখন কোথায় আছে?

আশা বলিল, আমি ত' জানি না, মিস্ সেন জানেন।

তিনি কত বুঝিয়ে চন্দ্রাদি'র বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরই দেন নি।

বেলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, আচ্ছা তোর কোন ভয় নেই, তোকে আর কেউ স্কুল ছাড়াবে না। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, চল্।

আশা বলিল, সত্যি তুমি মিস্ সেনকে ব'লেছো?

বেলা বলিল, তবে কি মিছে কথা বলছি?

যাইবার জন্য আশা উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হঠাৎ কি মনে হওয়ায় বলিল, কি করতে যাবো, ভাই?

সেদিনে আশার হঠাৎ চলিয়া আসার কথা বেলা ভুলে নাই। বলিল, প্রত্যেক দিন কি কোন কাজ নিয়েই আমাদের বাড়ী গেছিস্? আমিই কি কোন কাজ নিয়ে এসেছি? একেবারে আমাদের ওখানে থেকে খেয়ে-দেয়ে আসবি। তোকে নামিয়ে দিয়ে আমি কলেজে যাবো।

আশা আর কোন কথা কহিল না। বেলার সঙ্গে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

পথে যাইতে যাইতে বেলা বলিল, আমি একটা ভবিষ্যদ্-বাণী করবো, শুনবি?

আশা বলিল, কি?

বেলা গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর চোখ বুজিয়া দুই হাতের আঙ্গুল গণিয়া, আশাকে দিয়া

একটা ফল ও একটা ফুলের নাম করাইয়া বলিল, আমার গণনা-মতে আগামী মাসে তোর বিয়ে হবে।

আশা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, খুব বড় জ্যোতিষী হ'য়েছো ত'! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহার ভিতর কোথাও একটা সত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বেলা বোর্ডিংএ গিয়াই তাহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহার ধারা ধরিয়া আশা অনুমান করিল, তাহার বাবাই বোধ হয় এ-বিষয়ে কোন কিছু লিখিয়াছেন। এ অনুমান ঠিক হইতে পারে ভাবিয়া সে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল এবং নরেশের নিকট পুনরায় যাইতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

কিন্তু বাহিরে সে কিছুই প্রকাশ করিল না, অন্য প্রসঙ্গ আনিয়া কথাটা চাপা দিয়া ফেলিল। এমনি অবান্তর গল্প করিতে করিতে তাহাঁরা যখন আসিয়া পৌছিল, দেখিল আর একটা গাড়ী গেটে দাঁড়াইয়া আছে। কে আসিয়াছে ঠিক অনুমান করিতে না পারিয়া বেলা বলিল, চুপি চুপি চল, দাদার ঘরে কে এসেছে দেখে আসি।

বেলার মনে স্ফূর্ত্তি ছিল, তাহারই জোরে বেলাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বলিল, পায়ের শব্দ করিস্ নি, আগে দেখি চেনা কি অচেনা, তারপর ঘরে ঢুকবো।

পা টিপিয়া দু'জনে নরেশের ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা মুখে তর্জ্জনী দিয়া আশাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া এক পাশের পর্দা সামান্য একটু সরাইয়া ফেলিল। সেই

মুহূর্ত্তে চকিতে যে দৃশ্য উভয়ের চোখে পড়িল, তাহা এক নিমেষে দু'জনকে প্রস্তরের মত নিশ্চল করিয়া দিল। দেখিল, মহেশ একটা চেয়ারে স্থির হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার পায়ের গোড়ায় চন্দ্রা বসিয়া কত কি যেন বলিতেছে; এক মুহূর্ত্তের দেখা। সুতরাং কাহার মনের কি ভাব কতখানি মুখে প্রকাশ পাইয়াছে কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু যেটুকু চোখে পড়িল, তাহাই অতর্কিতে বজ্রপাতের মত উভয়কে যেন স্তব্ধ করিয়া তুলিল।

আশা পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। নিমেষে তাহার অন্তরের এক প্রান্ত হইতে অন্য পর্য্যন্ত এক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাহারই আলোকে সে নিজের অন্তরের প্রতি চাহিয়া নিজেই যেন শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, হতাশা ও ঘৃণা নিমেষে কি করিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত অন্তর ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে হইল আর সে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। দুই হাতে মুখ চাপিয়া সে ছুটিয়া নামিয়া গেল।

আশা চলিয়া যাইবার পর বেলার হুঁস হইল। ক্ষণকালের জন্য সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, তারপর আশাকে ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, আশাও নাই, তাহাদের গাড়ীটাও নাই। সেইক্ষণে এও বুঝিল, ভবিষ্যতের আশা সমূলে চুরমার হইয়া গেল।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, চন্দ্রা হয়ত' এখনই নামিয়া আসিবে। ইহার সহিত দেখা হইতে পারে ভাবিয়া ঘৃণায় তাহার

সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এবং এই অপ্রীতিকর ঘটনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে নিজের ঘরে গিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল।

বন্ধ ঘরের মধ্যে বেলা কতক্ষণ কাটাইল এবং তাহার মনে কোন্ কোন্ ভাবের উদয় হইল, ঠিক বলা যায় না; কিন্তু এ কথা ঠিক, যে তাহার কাণ সদা সজাগ হইয়া রহিল। এক সময়ে কাহার পরিচিত পদশব্দে সে চট্ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং দোর খুলিয়া আগন্তুকের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিকটে আসিতেই বেলা বলিল, এদিকে আসুন, চারুবাবু।

চারু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, অনেক দিন দেখা-শুনো হয় নি, না?

বেলা বলিল, না। কোথাও গিছলেন বুঝি?

চারু সে-কথার উত্তর না দিয়া বেলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি হ'য়েছে তোমার?

বেলা বলিল, কই, কিছু হয় নি ত!

চারু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কিছু না হ'য়ে পারে না। কিছু একটা হ'য়েছে নিশ্চয়ই। আমাকে বলবে না, এই কথ বল?

বেলা বলিল, আপনি আমাকে কোন কথা ব[illegible] যে আমি আপনাকে সব কথা বলতে যাবো?

চারু হাসিয়া উঠিল। বলিল, একদিন আমার কথা শুনতে গিছলে মনে নেই? সেই মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে? কিন্তু সে যাক্, আমার নরেশবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে, চলো ও-ঘরে যাই। বলিয়া চারু চলিতে উদ্যত হইল।

বেলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, একটু দাঁড়ান, চারুবাবু, আমি এখুনি আসছি। আমি না আসা পর্য্যন্ত যেন যাবেন না। বলিয়া বেলা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আবার নরেশের ঘরের পর্দা সরাইয়া সন্তর্পণে ও সভয়ে ঘরটা দেখিয়া লইল। দেখিল, চন্দ্রা নাই, কখন চলিয়া গিয়াছে। নরেশ দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। নিশ্চিন্ত হইয়া চারুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বেলা বলিল, যান চারুবাবু।

চারু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হ'য়েছে বল ত', বেলা?

বেলা কিছুই বলিল না, শুধু পূর্ব্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিল, আপনি যান, দাদা আপনার অপেক্ষা ক'রে আছেন।

চারু আর কিছু প্রশ্ন করিল না, কিন্তু একটু বিস্মিত হইয়াই চলিয়া গেল।

চারু চলিয়া গেলে বেলা পুনরায় দোর বন্ধ করিয়া দিল এবং এতক্ষণ যাহা করে নাই, এইবার তাহাই করিল। শয্যায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

২৭

এত বড় দুঃখ বেলা জীবনে আর কোন দিন পায় নাই। দাদাকে সে যে আদর্শের আসনে বসাইয়া চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, একটু ক্ষণের জন্যও সে আসনে কোন দিন দাগ পড়ে নাই। চিরকাল এই নিষ্কলুষ আদর্শ হৃদয়ে লইয়া সে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার মন সন্দেহ ও দ্বিধাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দাদার বিরুদ্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু ভাবিবার মত সাহস সে পাইল না। দাদা অত অন্যায় কিছু করিয়াছেন, এমন ধারণা সে কোন মতেই মনে আনিতে পারিল না। অথচ স্বচক্ষে সে যাহা দেখিয়াছে তাহা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবারও উপায় রহিল না। দ্বিধা-বিভক্ত মনে এইটুকু বুঝিল, কোথাও কিছু একটা গোপন রহিয়াছে, যেটা প্রকাশ না পাইলে সে কিছুই বুঝিবে না। কিন্তু কেমন করিয়া

সেখানে সে দেখিতে পাইবে ? তাহার দাদা আশাকে ভালবাসে, যেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তেমনি করিয়াই ভালবাসে। এতদিনের এই অগাধ ভালবাসার পরে যে সে অন্য কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা বেলা কোন মতেই ভাবিতে পারিল না। এমনও হইতে পারে, একমাত্র অন্য পক্ষই আজ চঞ্চল, তাহার দাদা এ° বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কিন্তু সে যাহা চক্ষে দেখিয়াছে, তাহা কেবল এক পক্ষ লইয়াই হইতে পারে না, উভয় পক্ষের একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রয়োজন। পরস্পর-বিরোধী ধারণা ও প্রত্যক্ষকে লইয়া সে অনেক কথাই ভাবিল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই আসিতে পারিল না। এমনি ভারাক্রান্ত মন লইয়া সে সমস্ত কাজই করিল, কলেজে গেল, ঘরের দু'একটা কাজকর্ম্ম করিল, কাকীর সহিত বিকালে বেড়াইয়াও আসিল, কেবল সহস্র কৌতূহল সত্ত্বেও দাদার ঘরে যাইতে পারিল না। পাছে তাহার দাদার সহিত দেখা হইয়া যায়, এইজন্য সে সমস্ত দিনটা ভয়ে ভয়ে কাটাইল। রাত্রে আহারাদির পর যে সময়টা সে প্রত্যহ দাদার সহিত বসিয়া গল্প করে, আজ সে সময়ে ঘরে গিয়া নিজেকে বন্ধ করিয়া রাখিল।

নির্দ্দেশহীন ভাবনার মধ্যে বেলা কখন নিজেকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছিল। এক সময়ে মনে হইল, কে যেন তাহার দ্বারে মৃদু করাঘাত করিতেছে।

বলিল, কে ?

বাহির হইতে নরেশ বলিল, আমি।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেলা থতমত খাইয়া গেল। তারপর উঠিয়া আস্তে আস্তে দোর খুলিয়া দিল।

নরেশ ভিতরে আসিয়া বলিল, তুমি আজ সকাল থেকে একবারও আমার ঘরে যাও নি কেন?

তাহার কণ্ঠস্বরের অপরিসীম শান্ততায় বেলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু সে মুখ তুলিয়া দাদার দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না, অপরাধ যেন সে-ই করিয়াছে।

নরেশ একটা টুল টানিয়া বসিল, এবং তেমনি শান্তকণ্ঠে কহিল, তুমি কেন যাও নি, আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার পায়ের শব্দ পেয়েই বুঝেছিলুম, তারপর চারুবাবুর মুখে তোমার কথা শুনে আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে তুমি ভারী অন্যায় করেছো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স!

বেলার রুদ্ধ অভিমান ফুলিয়া উঠিল। কোন মতে ক্রন্দনকে চাপিয়া সে বসিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না।

নরেশ বলিল, কাকীমা'র মুখে আমি বাবার চিঠির কথা শুনলুম। তুমি যদি আগে আমাকে চিঠির কথা বলতে, তা হ'লে চন্দ্রাকে তখনই একটা উত্তর দিতে পারতুম। চন্দ্রা আমার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিল। পায়ে ধ'রে মিনতি জানিয়ে গেছে। বলিয়া নরেশ যেন দুর্ভাবনায় ডুবিয়া গেল।

বেলা এইবার দাদার মুখের দিকে চাহিল এবং চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু দাদা আর একজনও বহুদিন আগে থেকে তোমার আশ্রয়ের আশায় অপেক্ষা ক'রে আছে।

নরেশ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, না, আর একজন আশ্রয় চায় নি, তার আশ্রয়ের ভাবনা নেই। সে চেয়েছে অন্য কিছু। সেই কথা ভেবেই চন্দ্রাকে কোন কথা দিতে পারি নি। তুমি জানো না, চন্দ্রা আজ কতখানি বিপন্ন। একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, তা হ'ক, তবু চন্দ্রাকে বলতে হবে, আমি আশ্রয় দেবার কেউ নই। বাবার ইচ্ছে আমি বেশ জানি, তাঁর ইচ্ছের অমতে কোন কাজ হবে না। আমাকে তিনি কেন কিছু লেখেন নি জানো ত? পাছে সেটা আদেশের মত শোনায়!

বেলা ভীতকণ্ঠে বলিল, কিন্তু দাদা তোমার কি ইচ্ছে নেই?

আমার ইচ্ছে? নরেশ একটু হাসিল, বলিল, ইচ্ছে দিয়েই ত' সব কাজ হয় না, বোন্, কর্ত্তব্য ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটা ইচ্ছের চেয়েও বড়। আর এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ত' তোমার অজানা নেই! বলিয়া নরেশ চুপ করিল।

কিন্তু বেলা অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, আশা আজ স্বচক্ষে দেখে গেছে, চন্দ্রা তোমার পায়ের কাছে ব'সে আছে!

নরেশের মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, তারপর?

বেলা বলিল, তারপর সে চলে গেছে, একটা কথাও ব'লে যায় নি। কি ধারণা নিয়ে গেছে, সেই জানে।

নরেশ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। সে কিছু ভাবিতে লাগিল, কি নিজেকে সম্বরণ করিতে লাগিল, সেই জানে; এমনি করিয়া অনেকক্ষণ কাটিল। তারপর বলিল, সে যদি ভুল বুঝে গিয়ে থাকে,

তাতে আমার কোন অপরাধ নেই। এতদিনেও সে যদি আমাকে না চিনে থাকে, সে অপরাধ আমারও না, ওরও না, উভয়েরই ভাগ্যের। আচ্ছা তুমি শোও, আমি যাই।

বেলার অন্তর অনুতাপে ও গ্লানিতে ছিঁড়িতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, দাদা, অপরাধ আমারই সব চেয়ে বেশী। যতটুকু পারি, আমাকে সংশোধন করতে দাও। তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু ভেবো না; যা করবার আমিই করবো। এমন কি চন্দ্রাকেও যা বলবার, আমিই বলবো।

নরেশ বেশী কথা কহিতে পারিতেছিল না। যাইতে যাইতে শুধু বলিল, আচ্ছা।

২৮

পরদিন একটু বেলাতেই বেলার ঘুম ভাঙ্গিল এবং ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গেই গতরাত্রের কথা মনে পড়িল। এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে ঘুমাইয়াছিল। আজ উঠিয়া এই কথাই ভাবিল। বিছানায় শুইয়াই আজ কি কি কাজ করিবে স্থির করিয়া লইল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া কাকীর নিকট গিয়া বলিল, কাকীমা, গাড়ীটা আজ আমার সমস্ত সকাল দরকার আছে। কাকাবাবুর যদি দরকার হয়, ব'লো, যেন ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে নেন। আমি দশটা-এগারটার মধ্যেই ফিরে আসবো।

নিঃসন্তানা রমণী এই ভাসুর-কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, বলিলেন, শুধু সকাল কেন, সমস্ত দিনই গাড়ী নাও না, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু চা খাবে ত'? আজ এত বেলায় উঠলে যে?

বেলা বলিল, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, কাকীমা। চা থাক্, এখন খাবো না। বড্ড কাজ আছে, আমি ঘুরে আসি।

বেলা প্রথমে আশার বোর্ডিং-এ গেল। কাল রাত্রি হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছে, এখানে আসিয়া কি ভাবে কথা বলিবে, নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আশাকে কতটা তিরস্কার করিবে, তাহার ও নরেশের মধ্যে ভুল বুঝিবার দরুণ যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কি করিয়া সরাইয়া দিবে। রাস্তায় আসিবার সময়ও এই পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণগুলো মনে মনে আলোচনা করিয়া লইল। কিন্তু বোর্ডিং-এ আসিয়া মিস্ সেনের মুখে যাহা শুনিল, তাহাতে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। মিস্ সেন বলিলেন, আশার বাবা কাল বিকালে আসিয়াছিলেন, কন্যাকে লইয়া বিকালের গাড়ীতেই চলিয়া গিয়াছেন।

মহেশবাবু ইতিপূর্ব্বেও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং শত ব্যস্ততাসত্বেও তাহাদের সহিত দেখা করিয়া যাইতে ভুলেন নাই। কিন্তু এবার কেন তিনি তাহাদের বাড়ী গেলেন না, ইহার মধ্যে কাহার প্ররোচনা আছে, বেলার বুঝিতে দেরী হইল না। স্ত্রীর অসুখের দরুণ মহেশবাবু কলিকাতায় থাকিতে পারেন না, কিন্তু গাড়ীর অপেক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া থাকার চেয়ে কয়েক মিনিটের জন্য কি তাহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিতে পারিতেন না?

বেলার অন্তর সহসা আশার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, যাহার গরজ সেই যদি এত উদাসীন হয়, তবে সে

কেন শুধু শুধু নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া মরে? জানিয়া-শুনিয়া যে নিজের পায়ে কুঠার আঘাত করে, তাহাকে সে কি করিয়া রোধ করিবে?

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার দাদার কথা মনে পড়িল। এই লোকটির কোনই অপরাধ নাই। শুধু তাহাদেরই বুঝিবার ভুলে ও দেখিবার দোষে ইহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইতেছে। অবশেষে তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল চন্দ্রার উপরে। নরেশ তাহার যে বিপন্ন-অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছিল, সে-কথা বেলার মনেই রহিল না। অতিশয় ক্রোধে সে ভাবিতে লাগিল, সমস্ত কিছুর জন্য একমাত্র এই মেয়েটাই দায়ী। ধীরেনের সহিত চন্দ্রার বিবাহ-প্রস্তাবের কথা সে দাদার মুখে শুনিয়াছিল, এবং এই কথা স্মরণ করিয়াই সে ভাবিল, ইহার স্বভাবই এই, এমনি ছলনা করিয়া হীন আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়াই ইহার সব চেয়ে বড় কাজ। বোর্ডিং হইতে কেন চন্দ্রাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে তাহাও বেলার মনে পড়িল। এই সমস্ত মিলিয়া তাহার চন্দ্রার সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত ধারণা জন্মিল, তাহাতে সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ইহার সহিত একদিন সে মেলা-মেশা করিয়াছে ভাবিতেও অপমান বোধ করিল। মিস্ সেনকে বলিল, চন্দ্রা দেবীর ঠিকানাটা আপনি জানেন?

মিস্ সেন বলিলেন, ঠিক আমার মনে নেই, তবে খাতায় লেখা আছে, ব'লে দিচ্ছি।

অনেক রাস্তা গলি ঘুরিয়া চন্দ্রার বাড়ীর ঠিকানার নির্দ্দেশ

পাওয়া গেল। গাড়ী সবটুকু যাইতে পারিল না, গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ, পথ খোঁজা ও হাঁটিয়া আসার সমস্ত বিরক্তি সে চন্দ্রার উপর ফেলিল। চন্দ্রাকে যাহা বলিবে ভাবিয়াছিল, মনে মনে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া স্থির করিল, খুব শক্ত কথা চন্দ্রাকে শোনাইয়া দিয়া আসিবে। তাহাতে সে আহত হয় হ'ক্, কিন্তু এটুকু সে নিশ্চিত জানাইয়া দিবে, একমাত্র তাহারই জন্য অনেকগুলি প্রাণীর দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।

কড়া নাড়িতে ঝী আসিয়া দোর খুলিয়া ছিল। বেলার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই বলিল, কাকে চাইছেন ?

বেলা বলিল, চন্দ্রা আছে ?

ঝী বলিল, দিদিমণি ? ওপরে আছে। ডেকে দেবো ?

বেলা বলিল, না, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

ঝী আর কথা কহিতে সাহস করিল না। বেলাকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রার ঘর দেখাইয়া বলিল, এই ঘরে দিদিমণি আছেন, ডাকুন। বলিয়া ঝী চলিয়া গেল।

নিত্যকার মত চন্দ্রা তাহার প্রিয় জানালার ধারটিতে বসিয়াছিল। কড়া-নাড়ার শব্দে দোর খুলিয়া বেলাকে দেখিয়াই সে যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

বেলা কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যও করিল না। ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

চন্দ্রার বুদ্ধির অভাব ছিল না। নিমেষেই সব বুঝিয়া লইল। দোর বন্ধ করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, বলো।

কি বলিয়া আরম্ভ করিবে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বেলা প্রথমেই বলিল, তোমার এসব ছেলে-মানুষীর মানে কি, চন্দ্রা ?

চন্দ্রা মৃদু হাসিয়া বলিল, কোন্ সব ছেলে-মানুষী ?

বেলা ক্রোধ চাপিতে পারিল না, বলিল, জানো না তুমি কি ক'রেছো ? মনে ক'রো না কেউ আমাকে কিছু ব'লেছে। কাল স্বচক্ষে আমি সব দেখেছি।

চন্দ্রা লজ্জাও পাইল না, রাগও করিল না। তেমনি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, আমি যে কেবল ছেলে-মানুষীই ক'রেছি, তুমি কেমন ক'রে জানলে ?

বেলা চমকাইয়া উঠিল। বলিল, তার মানে ?

চন্দ্রা কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বেলা ক্ষণকাল পরে বলিল, এ সবের ভেতর ছেলে-মানুষীই থাক বা অন্য কিছু থাক, তোমাকে আমি এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি, দাদার সঙ্গে আশার বিয়ে হবার কথা আছে এবং এ কথা আজ স্থির হয় নি, বহুদিন স্থির হ'য়ে আছে। কেন, তুমি কি এর কিছুই ইঙ্গিত পাও নি ?

চন্দ্রা এ কথারও সহসা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি আনিয়া বলিল, তোমার দাদা কিছু ব'লেছেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর পায়ে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লো, আমি একদিনের উত্তেজনার বশে যা করেছি, তার জন্যে

ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা করার ক্ষমতা তাঁর আছে, ক্ষমা তিনি করবেন।

বেলার রাগ একেবারে জল হইয়া গেল। চন্দ্রার মুখে শ্রান্তি ও ম্লানিমার সংমিশ্রণে যে অদ্ভুত ছায়া ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বেলা একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। কিন্তু সহসা কিছু বলা সমীচিন বিবেচনা না করায় চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রা পুনরায় বলিল, আশার সম্বন্ধের কথা আমি শুনেছিলুম বটে, কিন্তু জানো ত' অধিকাংশ সময়েই মানুষের মতি ভুল হ'য়ে যায়? ঠিকমত ভেবে ক'টা লোক কাজ করতে পারে বল'?

বেলা অকস্মাৎ চন্দ্রার দুই হাত ধরিয়া বলিল, আমার রূঢ় কথার জন্য কিছু মনে ক'রো না, ভাই। নানান কারণে আমার মনটা মোটেই ভাল ছিল না।

চন্দ্রা বলিল, না, মনে কিছু করি নি; তোমার দাদাকেও কিছু মনে করতে বারণ ক'রো। ব'লো, তাঁর কাছে আমার আর কোন প্রার্থনা নেই। একটু থামিয়া বলিল, সংসারে এ সব ছোট ছোট ঘটনা কত ঘটে! কিছুদিন পরে দেখবে, এ ঘটনার লেশ-মাত্রও তোমাদের মনে থাকবে না।

বেলা যা যা বলিতে আসিয়াছিল, সব যেন ভুলিয়া গেল। চন্দ্রাও আর কোন কথা কহিল না।

এমনি চুপ করিয়া দু'জনে বসিয়া রহিল। তারপর চন্দ্রা একসময়ে হাসিয়া বলিল, তোমাকে একটা সুখবর শোনাবার আছে। শীগ্‌গীরই আমার বিয়ে হচ্ছে।

বেলা প্রথম ইহা পরিহাস বলিয়া ভাবিল; কিন্তু চন্দ্রার মুখের প্রতি চাহিয়া কেমন খট্‌কা লাগিল, বলিল, সত্যি?

চন্দ্রা হাসিমুখে বলিল, সত্যি বৈ কি! দিন সাতেকের মধ্যেই হ'য়ে যাবে। বল' ত' তোমাদের নেমতন্ন করবো।

চন্দ্রার চেষ্টাকৃত হাসি ও পরিহাস তাহার অন্তরের বেদনাকে বেলার দৃষ্টি হইতে গোপন রাখিতে পারিল না। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি সুখী হও এই প্রার্থনা করি। কিন্তু তোমার কি হ'য়েছে, কি জন্যে দাদার কাছে গিয়েছিলে, কিছুই জানি না। দাদা নিজে কিছু ব'লেন নি, জিজ্ঞেস করতে সাহসও আমার হয় নি। কিন্তু আমার কাছে বলতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

চন্দ্রা পরম বিস্ময়ের সহিত বলিল, বলবার কি আছে, এতে? কিচ্ছু বলবার নেই। আমার কিছুই হয় নি। শুধু কালকে একটু মাথা খারাপ হ'য়েছিল, আজকে সেরে গেছে। তুমি এলে ভালই হ'ল, নইলে আমাকেই যেতে হ'ত!

বেলা বলিল, তুমি কি আর আমাদের বাড়ী যাবে না?

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল, আজ বাদে কাল আমার বিয়ে, এখন কোথাও যাবার সময় কোথায় পাবো, ভাই?

বেলার দেরী হইতেছিল, সে বিদায় লইল। দোর পর্য্যন্ত আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, বিয়ের সময় খবর পাবো ত', ভাই?

চন্দ্রা বলিল, উঁহু, তা হবে না। আমার বিয়েতে কেবল আমি এবং আর একজন, এ-ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই।

২৯

সুশীলবাবুর পত্র পাইয়া নরেশ ও বেলা দু'জনেই দেশে ফিরিয়া আসিল। এই কয়দিন দু'জনের মনেই প্রশ্ন উঠিতেছিল, আশার সহিত ইহার পর কিরূপভাবে মেলা-মেশা করা যায় এবং ইহাদের সে-ই বা কি ভাবে গ্রহণ করিবে! কিন্তু এ বিষয়ে দু'জনের কোন আলোচনাই হইল না। আগেকার মতই গল্পে-পরিহাসে দিন কাটিল, কিন্তু যে কেন্দ্রে দু'জনের চিন্তা এক হইয়া আছে, সেখানে কেহই স্পর্শ করিল না।

বাড়ী পৌঁছিয়া নরেশ বেলাকে শুধু বলিল, মা'র মা'কে কি আজই দেখতে যাবে?

বেলা বলিল, চল' না, যাই।

আশার মা'র অসুখটা যেমন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শীঘ্র সারিয়া আসিল। ইতিমধ্যেই তিনি অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছিলেন, নরেশ ও বেলাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া

বলিলেন, এসো বাবা, এসো। পরে নরেশের শুষ্ক চেহারার দিকে চাহিয়া বলিলেন, অনেক দিন ভুগলে, ভয়ানক রোগা হ'য়ে গেছো।

বেলা বলিল, আশা কোথায় মাসীমা ?

তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া মেয়েকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, এইখানেই ত' ব'সেছিল, কোথায় গেছে। বোধ হয় ছাদে গেছে। যাও না, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

বেলা বলিল, একটু পরে যাচ্ছি। তারপর শরীর ও অন্যান্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বেলা উঠিয়া পড়িল। কিন্তু সে আশার সহিত দেখা করিল না, একেবারে বাড়ী চলিয়া গেল।

সুশীলবাবু বাহিরেই বসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তোমার মাসীমাকে কেমন দেখলে ?

বেলা বলিল, যেমন শুনেছিলুম, তার চেয়ে অনেক ভালো আছেন।

সুশীলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, হঠাৎ যে রকম অসুখ হ'য়েছিল, তাতে ডাক্তারেরা জীবনের আশঙ্কা করছিলেন। তিনিও বোধ-হয় সেই আশঙ্কাই করেছিলেন, তাই মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চেয়েছিলেন। আমার ত' কোন আপত্তিই ছিল না, তাই তোমাদের তাড়াতাড়ি আসতে বলি।

বেলা চুপ করিয়া রহিল।

সুশীলবাবু পুনরায় কহিলেন, ওঁর শরীর যখন একটু ভালর দিকেই যাচ্ছে, তখন বিয়ের জন্যে তাড়াতাড়ি নেই। নরেশেরও শরীর দুর্ব্বল আছে, একটু সেরে উঠুক, তারপরে বিয়ে দিলেই

হবে, কি বল? বলিয়া তিনি একখানি আনন্দোজ্জল মুখের সম্মতির আশায় কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার প্রত্যাশিত উৎসাহের বিন্দুও খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, রেলে এসে তোমার শরীরটা ভালো নেই বোধ হয়? সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ো।

বেলা উঠিবার পূর্ব্বে বলিল, আমি কলেজ কামাই ক'রে শুধু শুধু ব'সে থাকবো কেন বাবা, তার চেয়ে ফিরে যাই।

সুশীলবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, আমাকেও একবার কলকাতায় যেতে হবে, সেই সময়েই তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। নরেশ এখন এইখানেই থাকবে।

একটু পরে নরেশ ফিরিল। বেলা দাদারই অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই সে বলিল, কি রকম দেখ্‌লে দাদা?

তাহার প্রশ্নে একটু আশ্চর্য্য হইয়া নরেশ বলিল, কি, কি রকম দেখলুম?

বেলা বলিল, মাসীমাকে কি রকম দেখলে?

নরেশ বলিল, আমি ত' একটু ভালই দেখলুম।

কিন্তু যে কথাটা উভয়ে উভয়ের কাছে জানিতে চাহিল, তাহার উল্লেখ মাত্র হইল না।

বেলা বলিল, বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতা যাবেন, আর তুমি এখানেই থাকবে।

এ কথা উত্থাপনের কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না, সংলগ্নতাও ছিল না। তথাপি নরেশ বলিল, কবে যাবে?

বেলা একটু ভাবিয়া বলিল, এই দু-তিন দিনের মধ্যে।

নরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমি থাকবো কে বল্লে?

বেলা উত্তর করিল, বাবা। তোমার কলকাতায় কাজ কি বল? তার চেয়ে তুমি এখানে থাকো, বাবার কাছে একজনের থাকা হবে।

নরেশ আর কোন কথা কহিল না। আহার করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

প্রথম দিন বেলার সহিত আশা সাক্ষাৎ করিল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন না করিয়া পারিল না। পরদিন বেলা যখন করুণাময়ীকে দেখিতে গেল, আশা সেই ঘরেই বসিয়াছিল। মা'র নিকট ধরা পড়িবার ভয়েই হ'ক বা সৌজন্যতার জন্যই হ'ক, কালকের মত আজ সে উঠিয়া যাইতে পারিল না। বেলা ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে আশাকে দেখিল, তারপর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া বলিল, আজ কেমন আছেন, মাসীমা?

করুণাময়ী বলিলেন, ক্রমেই ভাল হ'য়ে উঠছি, মা। ব'স।

বেলা বসিল। করুণাময়ী কন্যা এবং বেলার সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন, এবং রুগ্নতার দরুণ এই দুইটি মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

রুগ্ন শরীরে বেশী কথা কহান অনুচিত বিবেচনায় বেলা বেশীক্ষণ বসিল না। মাকে আশা এতটুকু সন্দেহ করিবার অবকাশ দিল না। পূর্ব্বেকার মতই সে দোর অবধি বেলার সঙ্গে গেল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না। করুণাময়ীর সম্মুখে

পরস্পরকে দু'একটা কথা কহিতে হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহারও প্রয়োজন হইল না।

এই নীরবতার অপমান বেলা অন্তর দিয়া অনুভব করিল। যাইতে যাইতে একবার ভাবিল, ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর এইখানেই দিয়া যায়! কিন্তু পরক্ষণেই আর একটি লোকের কথা মনে পড়ায় ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল।'

৩০

চন্দ্রা তাহার বিবাহিত জীবন লইয়া সুখী হইল কি দুঃখিত হইল, কিছুই বুঝিল না। তাহার জীবনে উপর্য্যুপরি যে ঘটনা ঘটিল, তাহার কোনটাই সে কোন দিন প্রত্যাশা করে নাই। এতদিন যে শিক্ষা সে পাইয়া আসিয়াছে, তাহারই পরিমার্জ্জিত রুচি লইয়া মনের অতি একান্তে যে আদর্শটি গড়িয়া তুলিতেছিল, একদিনের এক মুহূর্ত্তের রহস্যোদ্‌ঘাটনে তাহা নির্ম্মূল হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, কোনখানে একটুকু চিহ্নমাত্র রহিল না। শুধু ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ক্ষত চারিদিকে বিদ্যমান রহিল, এবং তাহার বেদনা এতই তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, যে ইহা অনুভব করিয়া শোক করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার রহিল না। শুধু একটি ক্ষণের আঘাত তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ক্ষণের অসহ্য জ্বালা লইয়া শান্তির আশায় সে নরেশের কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল। নরেশ ইহা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই

জানে, কিন্তু সেদিনের লজ্জাস্কর ইতিহাস বোধহয় তাহার জন্ম-কলঙ্ককেও ছাপাইয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রা জীবনে ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সব পরিত্যাগ করিল; স্রোতের টানে কোন লঘু বস্তু পড়িলে তাহা যেমন স্রোতেই ভাসিয়া যায়, স্রোতের বিপক্ষে তাহার শক্তি তুচ্ছতম হইয়া যায়, চন্দ্রা নিজের জীবনকে ঠিক তেমনি করিয়াই 'দেখিল। তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল, জন্ম-ইতিহাস জানিল, মাকে চিনিল, এবং অবশেষে বিবাহও হইয়া গেল। সব কটা যেন একটানা ঘটিয়া গেল।

বিবাহের ইতিহাস সামান্যই। অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া একটি শীর্ণকায় ব্যক্তি দুটী জীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহার ভার গ্রহণ করিল, সাক্ষী রহিলেন স্বর্গের দেবতা এবং মর্ত্ত্যের রাজেনবাবু, দুই পুরোহিত ও অতি-অপরিচিত আর কয়েকজন ব্যক্তি। সব কিছুর অন্তরালে কুসুম তখন রোগশয্যায় শুইয়া কি ভাবিতেছিল সেই জানে। চন্দ্রা কিন্তু তাহার কথা একবার মনেও আনিল না। তারপরেই নূতন গৃহে যাত্রা সুরু হইল।

কিন্তু এ যাত্রা যেন অন্ধকারে পথ-যাত্রা। অতীতকে চন্দ্রা বহুদূরে ফেলিয়া দিল, বর্ত্তমান সে চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি অন্ধ করিয়া রাখিল।

তাহার স্বামী-গৃহে জীবন আরম্ভ হইল শুধু নিজেকে এবং স্বামীকে লইয়া। একটি ঝী ব্যতীত তৃতীয় জন কেহ রহিল না। চন্দ্রা ইহাই বোধ হয় চাহিয়াছিল। এ-জন্য বোধ হয় ভাগ্য,

বিধাতাকে ধন্যবাদও দিল। গৃহটী রাজেনবাবুর, বিবাহে জামাতাকে অস্থায়ী অর্থের সহিত এই স্থায়ী বস্তুটিও যৌতুক স্বরূপ উপহার দিয়াছেন।

স্বামীকে চন্দ্রা চিনিল না। চিনিবার জন্য চেষ্টাও করিল না। দুই চোখ মেলিয়া তাঁহার পঞ্জরসার দেহটি দেখিল এবং দুই কাণ দিয়া তাঁহার অজস্র আদেশ-উপদেশ শুনিতে লাগিল। বাড়ীতে তিনি বেশীক্ষণ থাকেন না, কিন্তু যেটুকু সময় থাকেন সে-সময়ে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। কণ্ঠের অতল গহ্বর হইতে তীক্ষ্ণ স্বর বাহির করিয়া কেবলই কথা কহিতে থাকেন। যখন বুঝিতে পারেন চন্দ্রা কিছুই শুনিতেছে না, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। ক্রোধের উত্তাপে তিনি যতই হাঁপাইয়া পড়েন, ততই বকিতে থাকেন।

স্বামীর নাম সিদ্ধেশ্বর। পিতা-মাতা হয় ত' বহু সুলক্ষণ দেখিয়াই নামটা রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার একটাও অবশিষ্ট নাই।

এই লোকটিকে চন্দ্রা আস্তে আস্তে গা-সওয়া করিয়া লইতেছিল। কিন্তু ক্রমে ইহার বাক্য তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল, এবং সে বাক্যের হুল চন্দ্রার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাত্রে ইহার পাশে শয়ন করিয়া চন্দ্রার সহজে ঘুম আসিত না। অন্ধকারে দুই চক্ষু মেলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিত। সিদ্ধেশ্বর সহসা কাসির বেগে জাগিয়া উঠিয়া বলিত, ঘুমোও নি ?

চন্দ্রা বলিত, না।

সিদ্ধেশ্বর বিড়-বিড় করিতে করিতে শুইয়া পড়িত এবং খানিক পরে বলিত, একটু জল দাও ত'!

চন্দ্রা উঠিয়া জল আনিয়া দিত। কিন্তু আবার শুইতে তাহার ইচ্ছা হইত না। জানালার ধারে শীতল বাতাসের মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত।

সিদ্ধেশ্বরের কাসি এক-একদিন বাড়িয়াই চলিত। রাগিয়া বলিত, একটু হাওয়া করতে পারো না? দেখছো আমি ম'রে যাচ্ছি, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভা দেখছো!

কিন্তু সেদিন চন্দ্রা কি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে সে উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী বালিসে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। ভয়ে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিতেই দেখিল, সিদ্ধেশ্বরের দুই কস বাহিয়া রক্ত গড়াইয়া বালিশের একস্থান একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে সে একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর ইঙ্গিত করিয়া জল চাহিতে তাহার চেতনা হইল। সে তাড়াতাড়ি জল আনিয়া সিদ্ধেশ্বরের মুখে ধরিল। জলপান করিয়া ও চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জল দিয়া সিদ্ধেশ্বর অনেকটা সুস্থ হইল। চন্দ্রার দিকে দুই তীক্ষ্ণ চোখ দিয়া চাহিয়া বলিল, হাঁ ক'রে দেখছো কি? কাস্‌তে কাস্‌তে গলা চিরে রক্ত বেরিয়ে গেল, তবু হারামজাদীর ঘুম ভাঙ্গে না! বেশ্যার মেয়ে আর কত ভালো হবে? নাও, এদিকে এসো, একটু হাওয়া করো।

চন্দ্রার সব চেয়ে গুরুতর গোপন ক্ষত কে যেন তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্র দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরিয়া দিল। এত বড় যন্ত্রণায় একটি ধ্বনিও সে মুখ দিয়া প্রকাশ করিল না। মশারীর চাল হইতে পাখা পাড়িয়া স্বামীকে সে বাতাস করিতে লাগিল।

পরদিন সিদ্ধেশ্বর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া রহিল। কাল রাত্রের জন্য তাহার শরীর ভাল ছিল না। কিন্তু সে নিয়মিত বাহিরে যাওয়া ছাড়িল না, একটু বেলা হইতেই ময়লা সার্ট ও ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

চন্দ্রা বলিল, কোথায় যাচ্ছো?

সিদ্ধেশ্বর শ্লেষকণ্ঠে উত্তর দিল, টাকার যোগাড় দেখতে।

চন্দ্রা আর কোন কথা কহিল না।

বাড়ীর পাশেই খানিকটা জায়গা পড়িয়াছিল; সেখানে আশে-পাশে সমস্ত বাড়ীর ছাই আসিয়া জমা হয় এবং দু'তিন দিন জমিতে জমিতে যখন তাহা একটি ক্ষুদ্রতম পর্ব্বত হইয়া দাঁড়ায়, তখন একদিন গাড়ী আসিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া যায়। দিনের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সারিয়া চন্দ্রা এই জমিটার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অল্পক্ষণ হইল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঝী নীচে শুইতে গিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর আজ দুপুরে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় বাহির হয় নাই, শুইয়া আছে। চন্দ্রা এই সময়টায় সেলাই নিয়া বসে, কিন্তু আজ আর ভাল লাগিতেছিল না। বাহিরের উত্তপ্ত বাতাসে চিলের চীৎকারধ্বনি

শুনিতে শুনিতে চন্দ্রা কখন তাহার পূর্ব্ব-জীবনে ফিরিয়া গেল, টেরই পাইল না। সহস্র করতালি ও প্রশংসাধ্বনির মধ্যে সে কতবার প্রাইজ পাইয়াছিল, মনে পড়িল। একবার কোন এক সাহেবের স্ত্রী তাহাদের স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন। হেড মিষ্ট্রেস্ তাহাকে সব চেয়ে ভাল মেয়ে বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, তারপর তিনি তাহাকে কত আ[illegible] করিয়াছিলেন! বোর্ডিং-এ একবার থিয়েটার হয়। তাহা[illegible] সে সব চেয়ে বড় পার্ট নেয়। সে সময় কত সুখ্যাতি [illegible] পাইয়াছিল। তাহাদের বোর্ডিংএ তাহার এক বন্ধুর ভাই মধ্যে মধ্যে আসিত। তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সেই ছেলেটি কত চেষ্টাই না করিয়াছিল! এই নিয়া বন্ধুরাও কত হাসি-তামাসা করিত।

এমনি করিয়া অতীতের অতি তুচ্ছ ও খুঁটি-নাটির ভিতর সে একেবারে ডুবিয়া গেল। একান্ত তন্ময়তার মধ্যে বাহ্য বস্তু সব ভুলিয়া গেল। তাহার উন্মুক্ত চক্ষু ধীরে ধীরে বুঁজিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে কখন ও-বাড়ীর ঝী আসিল, চ[illegible] জানিল না। ঝী চন্দ্রাকে নিদ্রিতা ভাবিয়া নিকটে আসিয়া [illegible]তশয় ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকিল, দিদিমণি!

চন্দ্রা যেন সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল, চোখ মেলিয়া ঝীকে দেখিয়া বলিল, কি ঝী?

ঝী চন্দ্রার হাতে একটা চিঠি দিয়া বলিল, এখুনি একবার ও বাড়ীতে চলুন, বাবু গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চিঠিতে রাজেনবাবু চন্দ্রাকে এক লাইন মাত্র লিখিয়াছেন, সে যেন পত্র পাঠ মাত্রই চলিয়া আসে।

চন্দ্রা ঝী'কে প্রশ্ন করিল, কেন ঝী?

ঝী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুধু বলিল, চলুন, গিয়ে শুনবেন।

সিদ্ধেশ্বরকে কিছু বলিয়া যাইবে কিনা চন্দ্রা একটু ভাবিল। কিন্তু তাহার বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে আর স্বামীর কাছে গেল না, বাড়ীর ঝীকে জানাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া ঝী দূর হইতে কুসুমকুমারীর ঘরটা দেখাইয়া বলিল, ঐখানে যান।

দূর হইতে প্রায়ান্ধকার ঘরটা দেখিয়া চন্দ্রার মনে হইল, ওখানে পাতাল-পুরীর গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। ক্ষীণ-তম শব্দটি পর্য্যন্ত নাই! সে গেলেই তাহার পদধ্বনিতে এই নিবিড় নীরবতা যেন অকস্মাৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। চারি-দিক হইতে নানা কলরোল আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিবে। তাহার কেমন ভয় হইতে লাগিল। সেইখানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

এক সময়ে ওই ঘর হইতে কে বাহির হইয়া আসিল। চন্দ্রা তাহাকে চিনিতে পারিয়া নিজের মনের এই দুর্ব্বলতায় একটু হাসিল।

রাজেনবাবু নিকটে আসিয়া চাপা-কণ্ঠে বলিলেন, ঘরে এসো।

ঘরের মধ্যে সব জানালা বন্ধ থাকায় যে অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে চন্দ্রা ঘরে ঢুকিয়া প্রথম কিছু ঠাহর করিতে

পারিল না। তারপর একটি শুভ্র শয্যা তাহার চোখে পড়িল। তাহার উপরে যে শুইয়া আছে তাহাকেও সে চিনিল।

রাজেনবাবু এইবার শ্লেষ-কণ্ঠে কহিলেন, আগে তোমাকে খবর দিতে নিষেধ ক'রেছিলেন, তাই বলি নি।

চন্দ্রা কিছু বুঝিল না, কিছু আন্দজাও করিতে পারিল না। সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাহিল।

রাজেনবাবু একটু পরে দাঁতে-দাঁতে চাপিয়া বলিলেন, তোমার মা বেঁচে নেই, মারা গেছেন।

চন্দ্রার মাথার মধ্যে দপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল; মুহূর্ত্ত-কাল স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে 'মা গো' বলিয়া মৃতের শয্যার উপর পড়িয়া গেল, এবং এত দুঃখ-বিপদেও যে দুই পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিল, আজ সে জ্ঞান হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

৩১

সিদ্ধেশ্বরকে চন্দ্রা ভালবাসে নাই, কোনদিন ভালবাসিবে, ভাবেও নাই। স্বামীর সঙ্গে বাস করিয়া দিন কাটানই তাহার বিবাহিত জীবনের আদর্শ হইয়াছিল। ইহার বেশী কিছু সে চায় নাই, এবং চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু কসুমের মৃত্যুর পর তাহার এ-ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। বাঁচিয়া থাকিতে সে মাকে মা বলিয়া গ্রহণ করে নাই, মৃত্যুর পর তাহাকে গ্রহণ করিল এবং ভালবাসিল। মৃতের প্রতি তাহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস সহস্র রূপ ধরিয়া সহসা তাহাকে যেন নূতন মানুষ করিয়া তুলিল। যে পৃথিবীকে শুষ্ক রসহীন বলিয়া চিনিয়াছিল, তাহারই অন্তরালে সে যেন এক উৎসের সন্ধান পাইল। আশা-প্রত্যাশা জীবনে নিয়তই বিফল হয়, কিন্তু এ-ছাড়া অন্য জিনিস ও মানুষের জীবনকে সঞ্জীবিত ও রস-সিঞ্চিত করিয়া রাখে, চন্দ্রার মা মরিয়া চন্দ্রাকে একথা শিখাইয়া গেল। পৃথিবীতে ব্যর্থতার মধ্যেও সার্থকতা আছে,

একথা চন্দ্রা প্রথম বুঝিল। তাহার ব্যর্থ জীবন গড়িয়া তুলিতে গিয়া প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল সিন্ধে[illegible] উপর। যাহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকেই সে প্রীতিকর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রাণমন পণ করিল।

মায়ের সমস্ত ইতিহাস চন্দ্রা এতদিনে জানিতে পারিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কুসুম সব কথা কন্যাকে লিখিয়া গিয়াছিল, এবং এই লজ্জাস্কর কাহিনী কন্যাকে শুনাইতে গিয়া মরিয়াও যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিবে না, একথা বার বার জানাইয়া দিয়া গিয়াছিল। পত্রের কোনখানে ক্ষমা চায় নাই, অনুতাপ করে নাই, শুধু কন্যাকে লইয়া তাহার লজ্জা ও অপমানের বোধটা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে।

গ্রামের একটি নিঃসহায় বিধবা মেয়ে চক্রে পড়িয়া কলিকাতায় আসে, এবং এখানে আসিয়া [illegible]ন লজ্জা-মান-ভয় সব কিছু নিঃশেষে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত [illegible]ল, ঠিক সেই সময়েই তাহার এক সহায় মেলে। সে সহা[illegible] কূল মিলিল না বটে, কিন্তু এ অবস্থায় অন্যদের মত একেবারে অকূলে ভাসিল না। যে তাহাকে আশ্রয় দিল, তাহার জীবনে অভিজ্ঞতা বেশী, কি দুঃখ বেশী, বলা যায় না, কিন্তু কোনটারই অভাব ছিল না। মেয়েটি তাহাকে ভালবাসিতে শিখিল। লোকটিও বোধ হয় একান্ত ভাবে ইহাই চাহিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে তৃতীয় জন আসিল, তাহার জন্ম অতি সত্যের মধ্য দিয়া, কিন্তু সে-সত্য সমাজের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়।

তার পরের কথা চন্দ্রা জানে। পূর্ব্বের কথাও জানিল। পিতাকে সে কোনদিন শ্রদ্ধা করে নাই। ভুল পরিচয় লইয়া যতদিন সে হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইয়াছে, ততদিনও নয়; যেদিন সত্যকার পরিচয় পাইয়া দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িল, সেদিনও নয়। কিন্তু আজ সে তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিল। ভালবাসিল না, ভক্তি করিল না, কিন্তু শ্রদ্ধা করিল। এত শ্রদ্ধা সে কোনদিন আর কাহাকেও করে নাই। তাহার পিতার জীবনের যে-অংশে তাহার কোনই সংশ্রব নাই, সেখানকার ইতিহাস সম্বন্ধে সে এখনও তেমনি অন্ধকারে রহিল। কিন্তু সে-স্থানের বেদনার কথা তাহার অজ্ঞাত রহিল না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কেন ত্যাগ করিয়াছিল, পরে তাঁহার স্ত্রী কোন্ অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে, সে-সকল জানিবার কোন আবশ্যকতাও তাহার ছিল না। যেটুকু জানিল, তাহা এই যে, স্ত্রী-পুত্র-হারা অপমানিত এই পুরুষটি একদিন তাহার মাকে কলঙ্ক-পঙ্কিল পথ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল, এবং নিজে পঙ্ক-তিলক কপালে পরিয়া তাহাদের কন্যাকে পঙ্কজ নাম হইতে গোপন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সত্য আপনা হইতেই প্রকাশ পাইল। সে সত্যের আলোকে এই লোকটির হৃদয়ে যে সত্য চন্দ্রা দেখিতে পাইল, তাহাতে সে ইহার প্রতি শ্রদ্ধানিত না হইয়া পারিল না।

কুসুমের মৃত্যুর পর রাজেনবাবু চন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি এইখানেই থাকো না কেন? সিদ্ধেশ্বরের অসুখ-বিসুখ আছে, তারপর হয় ত' তোমার ওপর অত্যাচার-অনাচারও করতে

পারে। বরং সে একটু ভালো হ'লে যেয়ো। তার সেবা-চিকিৎসার বন্দোবস্ত আমি ক'রে দেবো।

চন্দ্রা শুধু বলিয়াছিল, না, আমি সেখানেই [illegible]বো।

ইহার পরে চন্দ্রা স্বামীগৃহে ফিরিয়া [illegible] এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া জীবনের আর একটি অধ্যায় সুরু ক[illegible]।

সিদ্ধেশ্বর প্রথমটা চন্দ্রার পরিবর্ত্তিত [illegible]বহারে অবাক হইয়া গেল। চন্দ্রাকে সে সজীব পুত্তলিকার [illegible]তন পাইয়াছিল। আদেশ করিলে তাহা পালন করিত, আ[illegible] না করিলে চুপ করিয়া থাকিত। মুখে হাসি-ক্রোধ সুখ-দুঃখের কোন চিহ্নই ছিল না। দম-দেওয়া কল যেমন স্থিরীকৃত কাজটি নির্ব্বিবাদে করিয়া যায়, তারপর থামিয়া যায়, চন্দ্রাও তেমনি ঘর-কন্নার বাঁধা-ধরা কাজ কয়টি করিত; তাহার মধ্যে না ছিল বৈচিত্র্য, না ছিল বৈষম্য। শত তিরস্কারেও তাহার নির্ব্বিকার মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইত না এবং যখন বাক্যের দাহ তাহার চর্ম্ম ভেদ করিবার চেষ্টা করিত, তখন সে নিঃশব্দে অন্যত্র চলিয়া যাইত।

সে-ই যখন একদিন রাত্রে আসিয়া বলিল, রোজ রোজ রাত্রে এত কাসচো, ডাক্তার দেখাচ্ছো না কেন, সেদিন সিদ্ধেশ্বর একটু বিস্মিত হইল। বিস্ময়ের কারণ শুধু চন্দ্রা[illegible] উপদেশ নয়, তাহার কণ্ঠে এমন একটা সহানুভূতির স্বর বাজিয়া উঠিল, যাহা সিদ্ধেশ্বরের কাণে অদ্ভুত ঠেকিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, ওষুধের টাকা কে দেবে? তোমার বাবা?

সেদিন চন্দ্রা আর কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তার পরিবর্ত্তন সিদ্ধেশ্বর চিরদিন উপেক্ষা করিতে পারিল না। ক্রমে, অনাদর-লালিত স্নেহ-বুভুক্ষু শিশু অফুরন্ত ভাল-বাসা পাইলে যেমন সহসা আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে দিশাহারা হইয়া পড়ে, তেমনি করিয়া সিদ্ধেশ্বর নিজেকে চন্দ্রার ছায়ায় ডুবাইয়া ফেলিয়া অন্য সব কিছু যেন ভুলিয়া গেল। সহসা সে শরীর হইতে যত্ন-পোষ্য রোগটি তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঘরে ঔষধের শিশি একটা একটা করিয়া অনেকগুলো জড় হইয়া উঠিল।

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল, এইবার পুরাণ শিশি-বোতলের দোকান খোল'।

শারদ-মেঘের এই ক্ষণিক হাস্যটুকু সিদ্ধেশ্বরের বড় ভাল লাগিল। সে অতৃপ্ত দৃষ্টি দিয়া তাহা যেন নিঃশেষে শুষিয়া লইল। উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

চন্দ্রা একটু লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে কোথায় একটা তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ করিল,—যেন অতীতের স্তর ভেদ করিয়া একটি সূক্ষ্ম ধারা বহিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সে-রাত্রে সহসা চন্দ্রার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, সিদ্ধেশ্বর বালিশে মুখ গুঁজিয়া এক প্রকার শব্দ করিতেছে। উঠিয়া সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া ফেলিল। সিদ্ধেশ্বর তখন ভাল করিয়া বসিয়া খক্ খক্ করিয়া কাসিতে লাগিল।

চন্দ্রার বুঝিতে বাকী রহিল না, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবার ভয়ে সিদ্ধেশ্বর বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল। সহসা তাহার দুই চক্ষু-পল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল এবং স্বামীর দৃষ্টি হইতে তাহা গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া লইল।

সিদ্ধেশ্বর যতদিন রোগকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, ততদিন রোগও তাহার বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন সে ডাক্তারের ঔষধপত্র খাইয়া রোগকে রীতিমত সম্মানের আসনে বসাইল, তখন এই রোগ একদিন তাহাকে শয্যাশায়ী করিল। প্রথম দুইদিন সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রাকে বুঝাইল, এ কিছুই নয়, সে শীঘ্রই সারিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার অসুখ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ীতে আর তৃতীয় পুরুষ-ব্যক্তি ছিল না, চন্দ্রা ঝীকে দিয়া রাজেনবাবুকে খবর পাঠাইল।

রাজেনবাবু খবর পাইয়াই আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রা অবাক হইয়া গেল। সে রূপই তাঁহার নাই। মহীরুহের উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেলে ডালপাতা ভাঙ্গিয়া তাহার যেমন হয়, রাজেনবাবুর চেহারাও ঠিক তেমনি হইয়াছে।

ছুটোছুটি করিয়া রাজেনবাবু সেই দিনই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ কবিরাজ সিদ্ধেশ্বরের চিকিৎসার ভার লইলেন। রাজেনবাবুর সঙ্গে তিনি বহুক্ষণ নানা পরামর্শ করিলেন, চন্দ্রা তাহার বিন্দুও বুঝিল না। কেবল এইটুকু শুনিল, সহসা কোন উত্তেজনার কারণ ঘটিলে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসককে বিদায় দিয়া রাজেনবাবু কন্যাকে একান্তে

লইয়া গিয়া বলিলেন, তুমি কিছুদিন ও-বাড়ী গিয়ে থাকলে পারো না?

চন্দ্রা বলিল, কেন?

রাজেনবাবু একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, এই অসুখ-বিসুখ নিয়ে তোমার কষ্ট হ'তে পারে, তা ছাড়া,—

চন্দ্রা বলিল, না, আমার কোন কষ্ট হবে না। বলিয়া সে বিরক্তিভরেই চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রাকে একা পাইবামাত্র সহসা তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই? আর যদি না বাঁচি?

রোগীর কাতর-কণ্ঠ চন্দ্রাকে চমকিত করিয়া তুলিল। সে দুই বিস্ফারিত নেত্র তুলিয়া সিদ্ধেশ্বরের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রার ধৃত হাতটায় একটু চাপ দিয়া পুনরায় কহিল, সত্যি, আমি আর বাঁচবো না। আমার শেষ হ'য়ে আসছে, বেশ বুঝতে পারছি।

চন্দ্রার কণ্ঠের তালুতে অশ্রু ঠেলিয়া উঠিল, তাহা রোধ করিতে গিয়া সে কোন কথাই কহিতে পারিল না। মৃত্যু-ভীত স্বামীকে আশ্বাস দিবার মত কোন শক্তিই তাহার রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধেশ্বর পুনরায় বলিল, আচ্ছা, তুমি আমাকে ভালবাসো?

এই প্রথম স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসার প্রশ্ন করিল। লজ্জায় স্ত্রীর দুই গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল না, কিন্তু অব্যক্ত অনুভূতিতে

তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। একটা কাজের অজুহাতে সে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর তাহার হাতটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে বাঁচাতেই হবে, এখন আমি মরতে চাই না, চন্দ্রা।

তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনায় চিকিৎসকের কথা স্মরণ করিয়া চন্দ্রা ভীত হইয়া উঠিল। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কবিরাজ মশাই কোন ওষধ দিয়ে গেছেন কি ?

সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রার হাত ছাড়িয়া ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, না, পাঠিয়ে দেবে। সে চোখ বুজিল।

চন্দ্রা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৩২

সিদ্ধেশ্বর প্রায় ভাল হইয়া উঠিল। তাহার মন হইতে আসন্ন মৃত্যুর ভয়টা কাটিয়া যাওয়ায় সে অনেকটা প্রফুল্লও হইল। তাহার বাঁচিবার ইচ্ছা অকারণে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। এতদিনের রোগভোগে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ-প্রায় হওয়ায় এবং প্রায়-সম্পন্ন কতগুলি দালালী সংক্রান্ত কাজ নষ্ট হওয়ায় তাহার মনঃক্ষোভের অন্ত রহিল না। চন্দ্রাকে কহিল, সে এইবার ভাল হইয়া উঠিলেই সাহেবদের ধরিয়া একটা চাকুরী জুটাইয়া লইবে। তাহাতে যা আয় হইবে, তাহাতে দু'জনের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। কি হইবে বেশী টাকা দিয়া ?

চন্দ্রা স্বামীর আশায় উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল মাত্র, হাঁ, না, কোনটাই বলিল না। তাহার কাছে কোনটারই বিশেষ মূল্য ছিল না।

স্বামী শরীরে কি নিদারুণ ব্যাধি পুষিয়া রাখিয়াছেন, সে কথা জানিতে তাহার বাকী নাই। প্রথম যেদিন সে ইহা টের পাইয়াছিল, সেদিন তাহার রক্ত হিম হইয়া যায়, তারপর স্পষ্ট দিবালোকের মত অদূর ভবিষ্যতের ছবিটা দেখিয়া লয়। তারপর হইতে এই ছবি নিয়ত মনশ্চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া সে দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, যাহাকে ধরিয়া রাখিবার কোনই নিশ্চয়তা নাই, তাহার জন্য চন্দ্রা প্রাণপণ করিয়া বসিল। সিদ্ধেশ্বরকে এইবার সে সত্য করিয়া ভালবাসিল, এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার লোভের অন্ত রহিল না। অনন্ত আশা লইয়া সে সিদ্ধশ্বরের সেবা করিতে বসিল। সেবা দেখিয়া বৃদ্ধ চিকিৎসক অবাক হইয়া গেলেন।

সত্যই সে সিদ্ধেশ্বরকে বাঁচাইয়া তুলিল। কিন্তু এত পরিশ্রমে তাহার নিজের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার শরীরের দিকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, আমাকে বাঁচিয়ে তুমি নিজে মরতে বসলে। কিছুদিনের জন্যে একটু চেঞ্জে যাও, নইলে, এ-শরীর আর সারবে না।

চন্দ্রার মুখ সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তাই ভালো। চলো সমুদ্রের ধারে যাই, কেমন? আমার ভারী ভালো লাগে!

সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রার ছলনা ধরিতে পারিল না। সোৎসাহে বলিল, সেই ভালো। কোথায় যাবে? পুরী? ওয়ালটিয়ার? না, তার চেয়ে গোপালপুর ভাল। কি বল'?

কিন্তু পরে সিদ্ধেশ্বর যেদিন জানিল ঘরের টাকা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, সেদিন বেড়াইতে যাওয়ার উৎসাহ তাহার নিবিয়া গেল। স্থির করিল, একটা চাকুরী জোগাড় করিয়া উপস্থিত সমস্যা সমাধান করিয়া পরে অন্যান্য আয়োজন করিবে।

চন্দ্রা কিন্তু অন্যরূপ ভাবিয়া রাখিল। তাহার মা তাহাকে টাকাটা দিয়া গিয়াছিলেন, সেইটে ভাঙ্গাইয়া স্বামীকে সমুদ্রের ধারে কোথাও লইয়া যাইবে ঠিক করিল এবং ভিতরে ভিতরে তাহার আয়োজনও করিতে লাগিল।

আজ সকাল হইতেই চন্দ্রার শরীরটা ভাল ছিল না, তার উপর দুপুরে অত্যন্ত গরম পড়ায় সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। বিকালের পর দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বাহিরের উন্মুক্ত জানালায় দাঁড়াইয়া রহিল। এ পাড়ায় লোক চলাচল খুবই কম, যে কয়জন যাতায়াত করিতেছিল, চন্দ্রা অলস দৃষ্টি মেলিয়া সবকেই দেখিতেছিল। এক সময়ে একজনকে দেখিয়া তাহার দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল এবং কিছু না ভাবিয়াই ডাকিয়া উঠিল, চারুবাবু!

চারু পাশ দিয়াই যাইতেছিল, ফিরিয়া প্রথমটা চন্দ্রাকে চিনিতে পারিল না, তারপর ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া চিনিল। নিকটে আসিয়া কহিল, ওঃ, এত রোগা হ'য়ে গেছেন? আপনার গলার স্বরটা বাদে সব বদলে গেছে। অসুখ ক'রেছিল কি?

চন্দ্রা বলিল, না, ভেতরে আসুন।

মাথার কাপড় দেখিয়া চন্দ্রার বিবাহের কথা চারু তখনই

বুঝিয়াছিল। এ বাড়ীর অন্য কাহারও সহিত পরিচয় না থাকায় চারু ঘরে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

চন্দ্রা তাহা বুঝিল, বলিল, ইতস্ততঃ করবার কোন কারণ নেই, আপনি আসুন। তারপর চারুকে লইয়া ভিতরে যাইতে যাইতে বলিল, ওঁর বড্ড অসুখ। আমি ছাড়া ওঁর সঙ্গে কথা বলবার দ্বিতীয় লোক কেউ নেই। আপনি এলেন, ভালই হ'ল। আসুন, এই ঘরে।

সিদ্ধেশ্বরের মুখের এমনি কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যা প্রথমেই মানুষের চোখে পড়ে। চারু ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু পাশে চন্দ্রার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ওঃ, বহুকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা।

চন্দ্রা বলিল, আপনি এঁকে চেনেন?

চারু বলিল, আজ চিনি? সেই ছেলেবেলায় একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, তারপর বড়-বেলায় কত মিশেছি, কি বল হে, সিদ্ধেশ্বর?

সিদ্ধেশ্বর অন্য একদিকে চাহিয়া নীরস-কণ্ঠে শুধু বলিল, হ্যাঁ, ব'স।

চন্দ্রা উভয়কে ঘরে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেই চারু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, তোমার এ কি খেয়াল হ'ল, সিদ্ধেশ্বর?

সিদ্ধেশ্বর তেমনি নীরসকণ্ঠে কহিল, টাকার দায়ে।

চারু বলিল, টাকার দায়ে তুমি একজনের সর্ব্বনাশ করতে ব'সেছো?

সিদ্ধেশ্বর শ্লেষকণ্ঠে বলিল, অকারণ মামলা সাজিয়ে অন্যে যখন আমার সর্ব্বনাশ করলে, তখন তাদের উপদেশ দিতে যাও নি কেন? সম্পত্তি ত' গেলই, তারপর ফেরারী হ'তে হ'ল। এ টাকা কি তুমি দিতে? টাকা পেয়ে তবে দাঁড়াতে পেলুম, নইলে এই রোগ নিয়েই শ্রীঘর-যাত্রা করতে হ'ত।

চারু বলিল, সেই তোমার ভাল ছিল।

সিদ্ধেশ্বর চটিয়া উঠিল। বলিল, আমার পক্ষে সেই ভাল ছিল, আর তোমরা? যারা কথায়-কথায় বৃটিশ-রাজত্ব উল্টে দিচ্ছো, তোমরা গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবে, না? আর ফাঁক পেয়ে এসে দুটো বড় কথা শুনিয়ে দিয়ে যাবে, এই ত'? ও-সব চালাকী রাখো, সব আমার জানা আছে। তোমাদের দলে অনেক দিন ঘুরেছি।

চারু একটু কোমলকণ্ঠে কহিল, তোমার অসুখের কথা তুমি বেশ ভাল ক'রেই জানতে, এবং তার ফলাফলও তোমার অজানা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার বিয়ে করা কি উচিত হ'য়েছে?

সিদ্ধেশ্বরের রক্তহীন মুখ ক্ষণকালের জন্য আরও ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি আমাকে জানো, চারু, আমি কত অত্যাচার সয়েছি। মৃত্যু স্থির জেনে আর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে পারলুম না, লোভের বশে বিয়ে ক'রে ফেল্লুম। এখন ভাবছি,—আর ভেবেই বা কি হবে? আমার দুষ্টগ্রহ, আর ওর বরাত। আর যেন সে বলিতে পারিল না, বালিশটা মাথায় টানিয়া শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ক্ষণপরেই আবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কিন্তু এও সত্যি, ওরও আর কোন উপায় ছিল না। আমি যদি মরি,—যদি কেন, একদিন মরবো ত' নিশ্চয়ই, তা হ'লেও ওর একটা উপায় থাকবে। ওর জন্মের ইতিহাস জানো? কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, দূর হইতে চন্দ্রাকে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

চারু বোধ হয় সিদ্ধেশ্বরের কথা শুনিতেই পাইল না, অস্পষ্ট অন্ধকারে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

৩৩

অম্বিকাবাবু ধীরেনকে বাহিরে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে যাইতে বলিলেন, এক বছর ত' এমনি স্বদেশী ক'রে আর ঘরে ব'সে কাটলো। এইবার কলেজ খুল্‌লেই গিয়ে আবার নাম লিখুবে।

ধীরেন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

অম্বিকাবাবু একটু বিদ্রূপকণ্ঠে কহিলেন, পারো ত' পরীক্ষার মাথায় আর একবার কলেজ ছেড়ে দিও। কলেজে সেসন আরম্ভ হ'তে আর কত দেরী?

ধীরেন মনে মনে হিসাব করিয়া কহিল, আর বেশী দেরী নেই, দিন পনের পর থেকেই লেক্‌চার আরম্ভ হবে।

অম্বিকাবাবু মনে মনে কি ভাবিলেন, বলিলেন, আচ্ছা।

ধীরেন আর একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, কলেজে আবার ভর্ত্তি না হ'য়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারি। তাই দেবো কি?

অম্বিকাবাবু সংক্ষেপে কহিলেন, না, আবার লেকচার এ্যাটেণ্ড করবে।

পিতা-পুত্রে আর কোন কথা হইল না। পিতা গড়গড়ার নল মুখে দিয়া ক্ষণকাল এই সম্বন্ধেই কিছু ভাবিলেন, তারপর আর কিছুই তাঁহার মনে রহিল না। পুত্র নিজের ছোট্ট ঘরটিতে ফিরিয়া আসিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। জানালার নিকটেই একটা টগর-গাছ কে কবে পুঁতিয়াছিল ঠিক নাই, অযত্ন অবহেলায় আজ সেটা মস্ত বড় হইয়া ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই পুষ্পিত গাছটার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরেনের সহসা গ্রামে রাজেনবাবুর বাড়ীটার কথা মনে পড়িল। সে-বাড়ীতেও একটা ফুলভরা করবী-গাছ ছিল। চন্দ্রার কথা মনে পড়িল, নরেশের কথাও মনে পড়িল; আরও অনেক কথা তাহার মনে পড়িল।

কলেজে পুনরায় ভর্ত্তি হওয়ার আদেশের সঙ্গে এ-সকল চিন্তা মনে আসিবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু এই কারণ-হীন ও সূত্র-হীন চিন্তাগুলো তাহার মনে যেন ভীড় বাধিয়া আসিতে লাগিল। সব চিন্তার সঙ্গে তাহার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল, কোথায় কি? সে কি করিতে গিয়াছিল, কি করিল, কি-ই বা করিবে! প্রত্যেকটাতে কতই না তফাত! যখন সে সব কাজ ছাড়িয়া দেশের কাজ করিবে বলিয়া মাতিয়া উঠে, তখন কে ভাবিয়াছিল যে আবার তাহাকে ঠিক সেই সব পরিত্যক্ত কাজই তুলিয়া লইতে হইবে, এবং যে-কাজ সে একান্ত শ্রদ্ধায়,

মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাই একদিন পথের ধূলায় ফেলিয়া দিতে হইবে ?

কিন্তু কেন এমন হইল ? বোধ হয় আর কোন পথ ছিল না বলিয়াই। যে বাড়ীতে আর কোনদিন ফিরিবে না বলিয়া ধীরেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিল, যে দিন ঠিক সেই বাড়ীটিতেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল, সেদিন এ-ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথই তাহার খোলা ছিল না। প্রতিজ্ঞা করা হয় ত' ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ভুল হ'ক বা ঠিক হ'ক, যাহার জন্য সে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে-ই তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিল। যে বন্ধুকে লইয়া সে নানা কাজের কল্পনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল, যাহাকে আশ্রয় করিয়া শত বিপর্য্যয়কেও ভয় করিবে না ভাবিয়াছিল, এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যে সে আশ্রয়ও তাহার চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাহার আর কোন্ উপায় ছিল ? পুরাতন পথে ফিরিয়া আসা ছাড়া আর কোন্ পথই বা ছিল ?

পুরাতন পথ সে পাইল বটে, কিন্তু পুরাতন জগৎ সে ফিরিয়া পাইল না। বন্ধুদের সহিত মেলা-মেশা বন্ধ করিল। কাহাকেও বা চিনিলই না। নরেশ তাহাকে এক পত্র দিল, সে পত্রেরও কোন উত্তর সে দিল না।

এইরূপে চিরপরিচিত ও একান্ত বাঞ্ছিত জগৎ হইতে ধীরেন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া লইল। এখন যেখানে সে বাস করিতে লাগিল, সেখানে দুঃখ করিবার কিছু রহিল না। যে

আশা-নিরাশা মানুষকে সতত কর্ম্মপথে ঠেলিয়া দেয়, তাহার স্বাদ ধীরেনের মন হইতে যেন মুছিয়া গেল। তাহার জীবনে প্রবাহ রহিল না, বদ্ধ-স্রোত জলরাশির মত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

এমনি করিয়াই এতগুলো দিন কাটিল এবং জীবনের সুদীর্ঘ বাকী দিনগুলোও এমনিই কাটিবে বলিয়া ধীরেন ভাবিয়া রাখিল।

দিন তিনেক পরে অম্বিকাবাবু ধীরেনকে বলিলেন, নরেশ তোমাকে ডাকছিলো কেন?

ধীরেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল; বলিল, নরেশ আমাকে ডাকছিলো? সে কি কলকাতা থেকে এসেছে?

অম্বিকাবাবু বুঝিলেন ধীরেনের সহিত নরেশের সাক্ষাৎ হয় নাই। বলিলেন, হ্যাঁ, সে কলকাতা থেকে এসেছে। তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে তোমাকে যেন মিশতে না দেখি, ও সব আমি পছন্দ করি না। বুঝলে?

ধীরেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

ক্ষণকাল পরে অম্বিকাবাবু পুনরায় কহিলেন, ওরই সঙ্গে মিশে তোমার একটা বছর গেছে। ও দেখবে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে, শুধু হুজুকে মাতাবার সময় অন্যের মাথা খাবে।

ধীরেন নরেশকে সত্যই ভালবাসে। বন্ধুর অকপটতা সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতার এই মন্তব্য তাহাকে আঘাত করিল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অম্বিকাবাবু কি ভাবিতে ভাবিতে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

একসময়ে বলিলেন, তোমার মা তোমায় নিজেকে একবার গৌরীপুরে যেতে বলেছিলেন। আমিও ভাবছি, তুমি নিজেই গিয়ে একবার দেখে-শুনে এসো।

ইহার চেয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কোন পিতাই পুত্রকে দেয় না। কি হেতু গৌরীপুরে যাইতে হইবে, ধীরেনের নিকট তাহা অজ্ঞাত নয়। কয়েকদিন যাবত লোকজনের যাতায়াত ও পরম্পরাগতভাবে ধীরেন বুঝিয়াছিল, পিতা তাহার বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তারপরে, গৌরীপুরে কথাটা যে এক প্রকার পাকাপাকি হইয়া আসিতেছিল, তাহাও সে শুনিয়াছিল। তাহার বিবাহ-প্রস্তাবে বিমাতা খুব সন্তুষ্ট না হইলেও, বোধ হয় চক্ষু-লজ্জার খাতিরেই নেহাৎ আপত্তিও করেন নাই। অতএব আর কোন বাধা না ঘটিলে এইখানেই তাহার বিবাহ, ইহাও একপ্রকার স্থির।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এ সকল জানিয়া-শুনিয়াও পিতার প্রস্তাবে ধীরেন কিছুমাত্র লজ্জা পাইল না, বলিল, আচ্ছা, যাবো।

তাহার এই সঙ্কোচহীন উক্তিতে অম্বিকাবাবুও একটু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব নয়। বলিলেন, তা হ'লে আজ বিকালেই চলো। কয়েকটা কথাবার্ত্তা আমাকে পাকাপাকি ক'রে নিতে হবে, আমার সঙ্গেই চলো।

আর কোন কথা হইল না। ধীরেন ফিরিয়া আসিয়া শুধু নরেশের কথাই ভাবিতে লাগিল। পিতার সহিত অন্যান্য যা কথা হইল, তাহার ছায়াও তাহার মনে রহিল না। সমস্ত কথা-

বার্ত্তার মধ্যে যেটুকু সে গ্রহণ করিল, তাহা এই যে, নরেশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সন্ধান করিতে আসিয়াছিল। কবে সে কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, কখনই বা ডাকিতে আসিয়াছিল, কিছুই সে জানে না। কিন্তু সে যে এই দেশেই, তাহারই গৃহের নাতিদূরে রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় তাহার মন সহসা উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। পিতার নিষেধাজ্ঞা মনে রহিল না। এতদিনের সৃষ্ট ব্যবধানের কথাও মনে রহিল না। শুধু একটি বন্ধুর কথা মনে রহিল, যাহার সহিত তাহাকে দেখা করিতেই হইবে।

কিন্তু পরক্ষণেই সে সমস্ত শক্তি দিয়া এই ঐকান্তিক ইচ্ছাকে দমন করিয়া লইল। ভাবিল, বহুদিন ইহার সব সংস্রব সে ত্যাগ করিয়াছে। এই ভগ্ন-সম্বন্ধ জোড়া দিবার চেষ্টা করিয়া কি লাভ হইবে? সবকে ত্যাগ করিয়া সে পিতার আশ্রয়েই ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার সে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। ইহাতে কোনই উপকার হইবে না। তাহার অপমানের বোঝা ইহাতে বাড়িবে বই কমিবে না।

এই বাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্য রামলোচন কর্ত্তার প্র[illegible] পক্ষের সন্তানটিকে একটু বেশী করিয়াই ভালবাসিত। সে একসময়ে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, একি, তুমি এখনও চুপ ক'রে ব'সে আছো?

ধীরেন মুখ তুলিয়া বলিল, কেন?

বৃদ্ধের মুখ ভরিয়া হাসির ছটা বহিয়া গেল। বলিল,

বলে যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। নাও, শীগ্‌গীর ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। কর্ত্তাবাবু বললেন, দুপুরেই তোমাকে নিয়ে বেরুবেন, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসবেন। তা ভালই হবে। দিনের আলোয় ভালোটি ক'রে দেখে নিও বাপু! লজ্জা ক'রো নি যেন! ব্যাটাছেলের আবার লজ্জা কি? নাও, আর দেরী ক'রো না, নেয়ে-খেয়ে ঠিক হ'য়ে থাকো। বাবুও চানের ঘরে গেছেন।

তাহাকে স্নানাহারের দরুণ আর একপ্রস্ত তাগাদা দিয়া রামলোচন চলিয়া গেল। তাহার পরও ধীরেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এক সময়ে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, বিয়ে যখন করতেই হবে, এই ভাল। দরকার কি—তারপর সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

এ বাড়ীর বংশ পরম্পরাগত প্রথা, পাত্র কোনদিন নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করে নাই। কিন্তু অম্বিকাবাবু কেন সহসা এতদিনের প্রথা ভাঙ্গিতে চলিলেন, এতখানি আধুনিকতা হঠাৎ কেন তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তিনিই জানেন, ধীরেন কিন্তু এতটুকু কৌতূহল দেখাইল না। আহারাদির পর পিতার সহিত সে মেয়ে দেখিতে চলিল।

ফিরিবার পথে অম্বিকাবাবু ধীরেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, মেয়েটি সুন্দরী নয়?

ধীরেন মনে মনে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বলিল, হ্যাঁ বেশ সুন্দরী।

বেশ বোঝা গেল, পুত্রের কথায় অম্বিকাবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। কিন্তু স্বভাব অতিক্রম করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, অন্য এক দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু মনে মনে বোধ হয় ইহাই আলোচনা করিতেছিলেন; কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ওদের ঘরও খুব উঁচু। প্রাচীন বংশ, এককালে এ-বংশের নাম-ডাক ছিল। একটু থামিয়া বলিলেন, ওই একটি মেয়ে, আর ছেলে-পুলে কিছুই নেই। তাঁদের খুবই ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেন। আর আমারও মনে হয়, হ্যাঁ কুটুম্ব করবার মত লোক বটে ওঁরা! বলিয়া তিনি যেন আপন চিন্তায় আপনিই ডুবিয়া গেলেন।

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। প্রচুর ভোজন ও যাতায়াতের পরিশ্রমে অম্বিকাবাবু আর বসিতে পারিলেন না, একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

ধীরেনও পরিশ্রান্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, রামলোচন আসিয়া বলিল, নরেশবাবু যে তোমাকে ডাকতে এসেছিল?

ধীরেন যেন সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল, কখন এসেছিল? বসতে ব'লেছিলি ত'?

রামলোচন বলিল, না, বসতে বলি নি। বলেছি, তুমি এলেই খবর দেবো। কাল সকালে একবার যেও, অনেক ক'রে ব'লে গেছে।

ধীরেন রাগিয়া উঠিল, বলিল, দু'দিন এলো, একদিনও তাকে বসতে বলতে পারলি না? কেন, ওকি কখনও আমাদের বাড়ী আসতো না? তা ছাড়া একটা ভদ্রতাও ত' আছে?

রামলোচন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কর্ত্তাবাবুর হুকুম জানো ত'? তোমার যে কোন বন্ধুই হ'ক, এলে দেখা করতে দেওয়া হবে না। বিশেষ ক'রে তেনার দৃষ্টি ওই নরেশবাবুর ওপরে। তাই আর বসতে-টসতে বলি নি। যাক গে, কাল গিয়ে দেখা করে এসো, তা হ'লেই মিটে যাবে।

পিতার এই আদেশের বিরুদ্ধে ধীরেনের মন জ্বলিয়া উঠিল। নিঃশব্দে সে আলনা হইতে জামাটা তুলিয়া লইল।

রামলোচন বলিল, জামা পরছো কেন? কোথায় যাবে?

ধীরেন উত্তর করিল, নরেশের কাছে।

রামলোচন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, রাত্তিরে বেরুচ্ছো, কর্ত্তাবাবু কিছু বলবেন না তো?

ধীরেন কোন জবাব দিল না।

৩৪

ধীরেন বাহির হইতে ডাকিল, নরেশ !

নরেশ কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চিনিল, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, এসো ভাই, ভেতরে এসো। ভেবেছিলুম কালই আসবে।

ধীরেন কহিল, আসতে পারি নি। না না ভেতরে নয়, বরং চলো একটু বাইরে যাই।

নরেশ বলিল, বেশ, তাই চলো। বলিয়া একটা জামা গা'য়ে চাপাইয়া ধীরেনের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

আকাশের প্রান্তে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহারই স্বল্পালোকে রাস্তার দু'পাশের প্রান্তর আলোকিত হইয়াছিল। নরেশ বলিল, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, না ধীরেন ?

ধীরেন একটু হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তুমি নতুন কলকাতা থেকে এসেছো, তোমার ভাল লাগবারই কথা ; চলো মাঠে গিয়ে বসি, বোধ হয় আরও ভাল লাগবে।

মাঠে একটা স্থান বাছিয়া বসিলে নরেশ বলিল, এখানে বড্ড সাপের ভয় জানো ত ?

ধীরেন তৎক্ষণাৎ বলিল, যদি আমাকে কামড়ায় তা হ'লে মরবার আগে সাপটাকে আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবো।

নরেশ হাসিয়া বলিল, তা হ'লে তোমার নাম অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। কোন দেশের কোন অবতারই এমন কীর্ত্তি রেখে যেতে পারেন নি।

ধীরেন হাসিল না, শুধু বলিল, না তা পারেন নি।

এতদিনের পর দেখা-শুনার প্রথম কথা-বার্ত্তা ও গল্প-পরিহাস এই পর্য্যন্তই। দু'জনেই মাঠের বিভিন্ন দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ইহার পর কি কথা কহিবে নরেশ বোধ হয় তাহাই ভাবিয়া লইল, বলিল, এখন কি করবে ব'লে ঠিক ক'রেছো, ধীরেন ?

ধীরেন ক্ষণকাল ধরিয়া নরেশের প্রশ্নের অর্থ অনুমান করিয়া কহিল, এখন মানে এর পরে ত ? না, নতুন কিছু করবো ব'লে ঠিক করি নি।

নরেশ বলিল, কিন্তু এমনি চুপ ক'রে ব'সেও ত থাকবে না ?

ধীরেন বলিল, না, তাও থাকবো না। একটু থামিয়া বলিল, আমাকে আবার কলেজে ফিরে যেতে হবে, নরেশ। আবার সেই আগেকার মতনই হ'তে হবে।

ধীরেন বোধ হয় নরেশের নিকট হইতে অতি প্রচ্ছন্ন বিস্ময় আশা করিয়াছিল। কিন্তু নরেশ মোটেই বিস্মিত হইল না,

বরং খুসী হইয়াই বলিল, হ্যাঁ ধীরেন, এখন কলেজে ফিরে যাওয়াটাই কর্ত্তব্য। চিরকালের জন্যে আমরা লেখা-পড়া ছাড়ি নি, আর ছাড়াটাও গৌরবের কথা নয়। তুমি আবার কলেজে ফিরে যাচ্ছো শুনে সত্যিই আমি আনন্দিত হলুম। আবার নতুন ক'রে এ্যাটেণ্ড করবে ত'?

ধীরেন বলিল, হ্যাঁ। তুমিও কি কলেজে ফিরে যাচ্ছো?

নরেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, না।

ধীরেনের মুখের প্রদীপ্ত আশা মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। নরেশ কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিল না, ক্ষণকাল পরে কহিল, আমি যদি এখানে থাকতুম তবে আমিও আবার কলেজে ভর্ত্তি হতুম। কিন্তু আমি ত' এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ধীরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় যাচ্ছো?

নরেশ বলিল, তোমার সঙ্গে আর কোনদিন দেখাশুনা হয় নি বলে জানাতে পারি নি। আমি আমেরিকা যাচ্ছি।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বড় সংবাদটা শুনিয়া ধীরেন কোন কৌতূহলই দেখাইল না, নীরস-কণ্ঠে বলিল, সেখানে গিয়ে পড়বে বুঝি?

নরেশ বলিল, না, ঠিক পড়বো না, চাষের কাজ শিখতে যাবো। চারু-বাবুর কথা তোমার মনে আছে?

ধীরেন বলিল, আছে।

নরেশ বলিল, তিনিই বাবাকে ব'লে-ক'য়ে এই বন্দোবস্ত করেছেন। নইলে আমিও ভেবেছিলুম এবার এম্-এ'টা পাশ

দেবো। কিন্তু এম্-এ সম্মান পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই, বলিয়া নরেশ হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আর একজনের নিকট হইতে সেরূপ কোন সাড়া না পাইয়া থামিয়া গেল।

কিছুক্ষণের জন্য দু'জনে আবার নীরব হইয়া রহিল। এই একান্ত নীরবতার মধ্যে নরেশের অস্বস্তির অন্ত রহিল না। কিন্তু কথা কি করিয়া পূর্ব্বের প্রণালীতে ফিরাইয়া আনিবে, কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না।

ইহার পর ধীরেনই প্রথম কথা কহিল। সহসা বলিল, তোমাকে আর একটা খবর দিই নরেশ। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে,—হচ্ছে কেন, একরকম ঠিকই হ'য়ে গেছে।

নরেশ সত্যই বিস্মিত হইল। কিন্তু হাসিয়া কহিল, সত্যি নাকি? তা হ'লে সু-খবরই বলতে হবে। দিন স্থির হ'য়েছে?

ধীরেন বলিল, না, তা এখনও হয় নি। তবে শীগগীরই হ'য়ে যাবে। তুমি কবে আমেরিকা যাবে?

নরেশ বলিল, এখনও মাস-দেড়েক দেরী আছে।

ধীরেন বলিল, তবে আমার বিয়ের নেমতন্নটাও খেয়ে যেতে পারবে। আজ আমি নিজেই মেয়ে দেখতে গিছলুম। বেশ সুন্দরী এবং তার চেয়েও বড় জিনিষ, জমীদারের একমাত্র মেয়ে। খুব দাঁও কসছি, না? বলিয়া ধীরেন যেন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, চলো বাড়ী যাই, রাত্তির হ'য়ে যাচ্ছে।

নরেশের সহসা মনে পড়িল, চন্দ্রাকে ধীরেন বিবাহ করিতে

চাহিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কি প্রশ্ন করিতে গিয়া চট্ করিয়া চাপিয়া গেল, বলিল, হ্যাঁ চলো, অনেক রাত্রি হ'য়েছে।

ফিরিবার পথে ধীরেন বলিল, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তোমার বিয়ের কতদূর কি হ'ল, নরেশ? আশা কেমন আছে? বেলাই বা কেমন আছে? কোথায় আছে সব?

এতগুলো প্রশ্নের উত্তর নরেশ খুব ধীরে ধীরে দিল, বলিল, আমার বিয়ে একদিন হ'য়ে যাবে। আমার বিদেশ যাওয়ার কথা শুনে মহেশবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। বোধ হয় যাওয়ার আগেই বিয়েটা হবে। বেলা এখন কলকাতায়, ভালই আছে।

ধীরেন বলিল, আর আশা?

নরেশ একটু থামিয়া বলিল, আশা এখানেই আছে। উভয়ে নরেশের বাড়ীর কাছাকাছি অসিয়া পড়িয়াছিল। এইটুকু পথ নীরবে কাটিলে বাড়ীর কাছে আসিয়া নরেশ সহসা ধীরেনের একটা হাত ধরিয়া বলিল, একটা সত্যি কথা বলবে?

ধীরেন সবিস্ময়ে বলিল, কি?

নরেশ বলিল, আমার প্রতি তোমার কোন ক্ষোভ আছে কি, ধীরেন?

ধীরেন বলিল, তোমার প্রতি ক্ষোভ? পাগল! তোমার মাথায় হঠাৎ এ-কথা খেললো কেন? তোমার চিঠির উত্তর দিই নি বলে?

নরেশ ধীরে স্বচ্ছে বলিল, না, সে-কারণে নয়। আমার প্রতি

তোমার ক্ষোভ-অভিমান না থাক, না থাকাই ভাল, কিন্তু তোমার মনে এমন কিছু ঘটেছে, যা আমার কাছে গোপন করছো।

ধীরেন বলিল, আমার মনে এমন কি ঘটতে পারে, নরেশ, যা তোমার কাছেও গোপন রাখতে হবে? মনে কিছুই ঘটে নি। তবে হয় ত' বাড়ীর খুঁটি-নাটি নিয়ে মন খারাপ থাকতে পারে।

এ সম্বন্ধে নরেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। বলিল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই?

ধীরেন যেন ব্যস্ত হইয়াই বলিল, না না, তার কোনই প্রয়োজন নেই। রাত্তির অনেক' হ'য়েছে, বাড়ী যাও, গুড-নাইট্। বলিয়া সে বড় বড় পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

৩৫

সিদ্ধেশ্বর এ-যাত্রা একেবারে সারিয়া উঠিল। চন্দ্রার সর্ব্ব মন ব্যাপিয়া যে মেঘটি বিরাজ করিতেছিল, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম ও চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়া কখন সেটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া আলোক প্রবেশের পথ করিয়া দিল। স্বামীর রোগের কথা সে ভুলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার অবশ্যম্ভাবী নিদারুণ পরিণামের কথাটা প্রায় ভুলিয়া আসিল। কতকটা যেন অভ্যস্ত হইয়া ভয়টা কাটাইয়া উঠিল।

সিদ্ধেশ্বর আগেকার মত দৈনন্দিন কাজের সন্ধানে ছুটিতে না পারিলেও মোটামুটি একরূপ কাজ চালাইতে লাগিল। তাহাতে এই সংসারটি হয় ত কোনরূপে চলিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের প্রস্তাবিত বিদেশ-যাত্রার খরচ কুলায় না। অথচ চন্দ্রার শরীর তেমন সারিতেছে না দেখিয়া সিদ্ধেশ্বর এই জিনিষ-টার কথাই কেবল ভাবিতে লাগিল।

এ লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে আর বিশেষ আলোচনা হইত না। কিন্তু আজ আহারের পর সিদ্ধেশ্বর ভাবিয়া চিন্তিয়াই কথাটা পাড়িল। বলিল, দেখো, তোমার শরীরটা মোটেই সারছে না। ভাবছি আর দেরী করবো না, কোথাও যাবার বন্দোবস্ত করবো। গোপালপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে, আজ খবর পেলুম সেটা খালি আছে, সেইখানে গিয়ে উঠবো। বন্ধুকে বলেছি, [illegible]র মত আছে। মাস-দু'য়েকের মত নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারবো। কিন্তু চন্দ্রার নিকট হইতে তেমন কোন উৎসাহ না পাইয়া আসল ব্যাপারটা অনুমান করিয়া কহিল, বাড়ী পাই আর যাই পাই, টাকা বাদে অবশ্য কিছুই হবে না। যাতায়াত, নতুন সংসার পাতা, এ-সমস্তর খরচ বড় কম হবে না। আমি একটা কাজ করবো ভাবছি। বলিয়া সে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিল।

চন্দ্রাও একটু কৌতূহলী হইয়া বলিল, কি করবে?

সিদ্ধেশ্বর একটু ভাবিল, তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আমার অসুখের আগে তোমার বাবা আমায় কিছু টাকা ধার দিতে চেয়েছিলেন। তখন আমি নিই নি। এখন দরকার পড়েছে, ভাবছি এখন সেটা চেয়ে নেবো। এখান থেকে দু'একটা কাজ-কর্ম্ম নিয়ে যাবো, যদি সুবিধে হয়, সেখান থেকেই টাকাটা শোধ দিয়ে দেবো। না হয় ত এখানে এসে শোধ দিলেই চলবে। কি বল'?

চন্দ্রা সহসা ইহাতে সম্মতি দিল না। বলিল, তা ছাড়া আর কি কোন উপায় নেই?

তাহার এই প্রকারান্তর অসম্মতিতে সিদ্ধেশ্বর সন্তুষ্টই হইল। কিন্তু এ-ছাড়া সত্যই তাহার আর কোন উপায় ছিল না। বলিল, উপায় থাকবে না কেন, আছে। কিন্তু এখনই সেটা হ'য়ে উঠবে না। আগেকার মত এখন আর অত ঘোরাঘুরি ক'রে কাজ করতে পারছি না, কাজেই খরচের মত টাকাটা জোগাড় ক'রে উঠতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। কিন্তু তোমার শরীর সারছে না। তারপর একটু কুন্ঠিত হইয়া বলিল, আমার শরীরের জন্যেও বটে—একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারলেই ভাল হয়।

সে-বিষয়ে চন্দ্রার মোটেই সন্দেহ ছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এ-ছাড়া যে আর একটা উপায় সে করিয়া রাখিয়াছে, লজ্জায় সে-কথাটা কোন মতেই সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। স্বামীকে চেঞ্জে লইয়া যাইবার জন্য সে গোপনে যে টাকা সংগ্রহ করিতেছিল, রাজেনবাবুর সাহায্যে তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাজেনবাবু কন্যার ভবিষ্যতের টাকায় হাত পড়ার জন্য একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও বিশেষ আপত্তি করেন নাই। চন্দ্রা নূতন করিয়া তাঁহার কাছে টাকা লইবে না, ইহা তাঁহার জানা ছিল। কাজেই নিজের টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন না। কিন্তু কন্যার মঙ্গলের জন্য অন্য দিক দিয়া নিজেকে জড়াইয়া রাখিলেন। এই চুক্তি করিয়া কন্যাকে সাহায্য করিলেন যে, তাহারা যেখানে যাইবে সঙ্গে তিনিও যাইবেন। বিদেশে বিপদ-আপদের সম্ভাবনায় চন্দ্রা তাঁহার প্রস্তাবে আনন্দিতই হইল।

কোন্ সময় নাগাদ যাওয়া হইবে, কোথায় যাওয়া হইবে, তাহাও একপ্রকার মোট-মাট স্থির হইয়া আছে। এ সকলের বিন্দু-বিসর্গও সিদ্ধেশ্বর জানিত না, এখনও জানিল না। চন্দ্রার মৌনতাকে সে স্বপক্ষে ধরিয়া লইয়া এখনকার মত নিশ্চিন্ত হইয়া শুইতে গেল।

পরদিন সকালে সিদ্ধেশ্বর কাজে বাহির হইল না। কাগজ-পত্র লইয়া খানিক লেখা-লেখি করিল। আহারের পর জামা-জুতা পরিয়া চন্দ্রার নিকট আসিয়া বলিল, আমি একবার বেরুচ্ছি, সকাল-সকালই ফিরবো। যদি দেরী হ'য়ে যায়, ভেবো না।

অসুখ হইতে উঠিয়া অবধি সিদ্ধেশ্বর কোনদিন দুপুরে বাহির হয় নাই। চিকিৎসকেরও নিষেধ ছিল। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া চন্দ্রা একটু বিস্মিত হইয়াই বলিল, কোথায় যাচ্ছো?

সিদ্ধেশ্বর মিথ্যা কহিতে পারিল না। বলিল, একবার রাজেনবাবুর কাছেই যাচ্ছি। টাকার কথাটা ব'লে আসি।

চন্দ্রা একেবারে অবাক হইয়া গেল। বলিল, এত তাড়া-তাড়ির কি দরকার? তা ছাড়া দুপুর রোদে নাই গেলে! তোমার যাবারই বা দরকার কি? বাবা ত' আজ-কালের মধ্যেই একবার না একবার আসবেনই!

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর কাল হইতেই সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বলিল, না না, তাড়াতাড়ির দরকার আছে বৈকি। তা ছাড়া আগে থেকে না জানিয়ে রাখলে উনিই বা জোগাড় করবেন কি ক'রে? টাকা ত আর লোকে ঘরে জমিয়ে রাখে না? এই ছাতা নিয়ে

যাচ্ছি, কতটুকুই বা পথ! দোরটা দিয়ে দিতে বলো। বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বর উঠান পার হইয়া চলিয়া গেল।

তখন আর চন্দ্রার তাহাকে ফিরাইয়া সমস্ত কথা জানাইবার অবকাশ রহিল না। সিদ্ধেশ্বর চলিয়া গেলে সে কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া এই সম্বন্ধেই ভাবিল। রাজেনবাবুর নিকট টাকা না চাহিতে গেলেই ভাল হইত। কিন্তু চাহিলেও কোন ক্ষতি নাই। রাজেনবাবু হয় ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন, নয় প্রার্থিত অর্থ দিয়া দিবেন। যদি টাকা দেন, কোন প্রকারে ফিরাইয়া দিলেই চলিবে। চন্দ্রা তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ঝীকে দোরটা বন্ধ করিতে আদেশ দিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

শীঘ্র ফিরিবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, সিদ্ধেশ্বর ফিরিল না। শরীর খারাপ বলিয়া চন্দ্রা কোনদিন দুপুরে ঘুমাইত না, সেলাই নয় অন্য কোন কাজ লইয়া বসিত, কোনদিন বা সিদ্ধেশ্বরের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইত। আজও সেলাই-এর কাজ হাতে লইয়া বসিয়াছিল। সেলাই অবশ্য চলিতে-ছিল। কিন্তু দুপুরের অর্দ্ধেকখানি অতীত হইয়া যাওয়ায় তাহার মন কেমন এক অনিশ্চিত দুর্ভাবনায় ক্রমেই যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নিজের নিকটই নিজের লজ্জা হইতে লগিল। যে স্বামীকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, বরং হয় ত এক সময়ে অপ্রার্থিতের মতই দেখিয়াছিল, আজ তাহারই জন্ত সে অকারণে অদর্শন-কাতর হইয়া পড়িতেছে! এ যেন ছেলে-মানুষীকেও হার মানাইয়া দেয়! কাজ-কর্ম্ম কোন্ পুরুষ-মানুষের

না আছে? কাহারই বা স্ত্রী স্বামীকে কর্ম্মে পাঠাইয়া ভাবিয়া মরে? চন্দ্রা নিজের মনে একটু হাসিল। হাতের কাজ দ্বিগুণ বেগে চলিল। কিন্তু যে দুর্ভাবনা তাহার মনকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহা হইতে সে কোনমতেই রেহাই পাইল না। এক সময়ে তাহার হাতের গতি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল, তাহার মনের গতি দুর্ভাবনা ছাড়িয়া এক সুনির্দ্দিষ্ট কল্পনার পথ ধরিল। চন্দ্রা ক্রমে ইহার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল।

স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা-রত তাহার মন কখন স্বামীকে লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল। এ-চিন্তা সে পূর্ব্বেও করিয়াছে, আজও করিল। সে দেখিল, স্বামীকে লইয়া সমুদ্র-তীরে কোন একটি অনাড়ম্বর গৃহে বস-বাস করিতেছে। সেখানে তাহার কর্ম্মের অন্ত নাই। ঘর-দোর গুছানো হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন রান্নার কাজ পর্য্যন্ত লইয়া তাহার আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। স্বামীর রুগ্ন শরীর, তাঁহার সেবা ত আছেই, সঙ্গে রাজেনবাবু থাকিবেন, তাঁহার প্রতিও আতিথ্যের সমস্ত অনুষ্ঠান তাহার স্কন্ধে পড়িবে। সকল কাজ-কর্ম্ম সারিয়া একটুখানি অবসর করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য হয় ত সম্মুখের অসীম-বিস্তৃত নীল জলরাশির প্রতি চাহিয়া সে একান্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িবে। হয় ত ক্ষণকালের জন্য অতীত-জীবনের কথা ভাবিবে। পুরাতন পরিচিতদের কথা হয় ত একবার তাহার মনে পড়িবে, একবার একটি নিশ্বাস হয় ত ধ্বনিয়া উঠিবে, তারপর আবার সেই সংসারের নিরন্তর কাজ-কর্ম্ম!

কল্পনা আরম্ভ-পথ ছাড়িয়া আরও উর্দ্ধে উঠিবার উপক্রম করিল। চন্দ্রা অনাগত আরও কি ভাবিতে গেল ; কিন্তু বাহিরে মোটরের কর্কশ-শব্দে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সচকিত হইয়া প্রথমে কেমন হতভম্ব হইয়া গেল, তারপর সিদ্ধেশ্বর ফিরিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। নীচে আসিয়া দেখিল, ঝীএর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে দোর খুলি দিতেছে।

দোর খুলিতে চন্দ্রা দেখিল যে আসিয়াছে, সে তাহার স্বামী নন, রাজেনবাবু। সে মনে-মনে একটু অপ্রস্তুত হইল এবং টাকা চাওয়ার ব্যাপার লইয়া একটু লজ্জিতও হইল।

রাজেনবাবু কিন্তু দোর খোলা পাইয়াই ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, একবার শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে চলো ত' মা!

চন্দ্রা বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন, কি হ'য়েছে?

রাজেনবাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন, সে কথা এখানে বলবার নয়, তুমি চলো, স্বচক্ষেই সব দেখবে।

ভয়ে চন্দ্রার চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। কহিল, বলুন না আপনি, কি হ'য়েছে?

বলা উচিত কিনা ভাবিবার অবসর রাজেনবাবুর হইল না, তাড়াতাড়ি বলিলেন, সিদ্ধেশ্বর অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গিছলো। পড়েই মুখ দিয়ে ভল্‌-ভল্‌ ক'রে রক্ত,—না মা, আর দেরী ক'রো না—ঝী, ধরো ধরো, পড়লো যে!

ঝীএর বাহুবেষ্টনের মধ্যে চন্দ্রা নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, কোথায় আছেন?

চন্দ্রার অবস্থা দেখিয়া রাজেনবাবুর বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পাইয়াছিল। ভগ্নকণ্ঠে তিনি কহিলেন, হাসপাতালে।

চন্দ্রা শুধু বলিল, হাসপাতালে?

রাজেনবাবু বলিলেন, হ্যাঁ মা, যে রকম অবস্থা হ'য়েছিল, জ্ঞান ত' আর হয়ই না, ভয়ে ভয়ে সেখানেই নিয়ে গেলুম। ওরা ত' বললে, ভালই করেছি, নইলে তখনি—রাজেনবাবু থামিয়া গেলেন। পুনশ্চ কহিলেন, আর দেরী নয়, চলো।

বিধাতা বোধ হয় এই মেয়েটির সহ্যের সীমা রাখেন নাই। বজ্রপাতের এই প্রচণ্ড আঘাত সে নিঃশব্দে সহিয়া লইল। অবিকৃত কণ্ঠে কহিল, চলুন।

সন্ধ্যার পর সিদ্ধেশ্বরের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

অল্প একটু চাহিতেই চারিদিক হইতে আলোর অজস্র রশ্মি আসিয়া তাহার চোখে পড়িল। ইহার তীব্রতায় সে তৎক্ষণাৎ আবার চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু মুদিত চক্ষু-পাতের উপরও সে আলোক অনুভব করিতে লাগিল; মনে হইল কাহারা যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া চুপি চুপি কথাও কহিতেছে। তাহার কি হইয়াছে, কোথায়ই বা সে আছে, আচ্ছন্ন বুদ্ধি লইয়া প্রথমটা সে কিছুই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। শুধু এক-একবার মনে হইল, কোথায় কি একটা ঘটিয়াছে, মনে আসিতেছে না।

এমনি নিঃশব্দে শুইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে সব কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। প্রথমেই মনে পড়িল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার সূত্রে অন্য সব কথাও তাহার স্মরণ হইল। রাজেনবাবুর কথা মনে পড়িল। ইঁহারই নিকট সে টাকা ধার চাহিতে গিয়াছিল। টাকা তিনি দিতে চাহিয়াছিলেন, এতটুকুও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে যে লোভ দেখাইয়াছিলেন, সেই অপমানকর প্রস্তাব সে কোনমতেই সহ্য করিতে পারে নাই। তাহার রোগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, সে যদি তাঁহার মেয়ের সংশ্রব ত্যাগ করে, তবে দু'চার শ' টাকা ধার কেন, প্রতিমাসে তাহাকে ওই ধরণের মোটা টাকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; কিম্বা যদি পছন্দ না হয়, এককালীন বন্দোবস্তও করিয়া দিতে পারেন। সেই টাকায় কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া সে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে, কোন কষ্টই হইবে না; উপরন্তু রুগ্ন শরীরে উপার্জ্জনের পরিশ্রম ও সংসারের ভাবনা হইতে রেহাই পাইবে। সামান্য প্রস্তাব মাত্র। হয় ত স্বপক্ষে অনেক যুক্তিই ছিল। কিন্তু সে ইহাতে রাগিয়া উঠে। সে উঠিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু রাজেনবাবু জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন, বলিলেন, সকলের হিতার্থে সে যদি ইহাতে সম্মত না হয়, তবে তিনি পুলিশের আশ্রয় লইবেন।

এই লইয়াই তুমুলভাবে তর্ক বাধিয়া উঠে। একান্ত বিরুদ্ধতায় সৃষ্ট তর্ক উপরের দিকেই উঠিতে থাকে, নীচে নামে না। এক সময়ে সে ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া রাজেনবাবুকে মারিতে

ছুটিয়া যায়। কিন্তু তাহার দূর্ব্বল শরীরে এই আকস্মিক উত্তেজনা সহিল না। মাথা ঘুরিয়া সম্মুখের প্রকাণ্ড টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাসির বেগ আসিল। তারপরই ঝলকে ঝলকে রক্ত। দুই হাতে সে মুখ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু দশ অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িল। সমস্ত শরীর সহসা এক তীব্র বেদনায় ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, চক্ষে এক উজ্জ্বল আলো জ্বলিয়াই সব অন্ধকার করিয়া নিবিয়া গেল।

এইবার তাহার মনে প্রথম প্রশ্ন জাগিল, সে এখন কোথায় আছে? চোখ খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কতকটা ভয়ে, এবং কতকটা একপ্রকার অবসাদে সে চোখ তুলিতে পারিল না। কে একজন তাহার হাতটা তুলিয়া ধরিতেই অন্যমনস্ক হইয়া সে তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র দিক হইতে আলো আসিয়া আবার চোখে পড়িল। কিন্তু এবার সে চোখ বন্ধ করিল না, চাহিয়াই রহিল। যিনি হাত ধরিয়াছিলেন তিনি বোধ হয় ডাক্তার, তাহাকে চাহিতে দেখিয়া কাহাকে মৃদুস্বরে কি বলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে দেখিল, দুইজন ধাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। তারপর নিজের শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বুঝিল, তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

লোকটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই কি যেন বলিলেন। সিদ্ধেশ্বর তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না, কিন্তু তাঁহার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিল, চন্দ্রা তাহার শিয়রের এক প্রান্তে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। বহুক্ষণ অদর্শনের পর শিশু মাকে দেখিয়া যেমন

ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া যায়, সিদ্ধেশ্বরের মন তেমনি আকুল আগ্রহে তোল-পাড় করিয়া উঠিল। কিন্তু চিত্তের এতখানি চঞ্চলতা সে বেশীক্ষণ সহিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়া নিঃসাড় হইয়া রহিল।

৩৬

সমুদ্র-পারে যাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নরেশ যে আবেদন করিয়াছিল, সেই উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কতিপয় অতি আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তাহার তলব পড়িল। চিঠি পাইয়া নরেশ একটু উদ্বিগ্ন হইল। ইতিপূর্ব্বেও একাধিকবার তাহাকে দেখা-শুনা এবং তাগিদ-তদ্বির করিতে হইয়াছে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলা হইয়াছিল, দেখা-শুনার পালা শেষ হইয়াছে, এবার তাহাকে ছাড়-পত্র দেওয়া হইবে। ছাড়-পত্রের আশাতেই সে বসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যে আদেশ আসিল, তাহা তাহার পক্ষে মোটেই আশা-প্রদ ঠেকিল না। কি হেতু তাহার আবার ডাক পড়িতে পারে, নরেশ অনেক ভাবিয়াও আন্দাজ করিতে পারিল না। একমাত্র কারণ হইতে পারে, সে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। এ কারণে তাহাকে বেগও কম পাইতে হয়

নাই। কেন সে বিদেশ যাইতে চায়, ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, রাজনৈতিক আন্দোলনে আবার যোগ দিবে কিনা, ইত্যাদি অজস্র প্রশ্নের বহুবার করিয়া উত্তর দিয়াও সে কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। শেষে সুশীলবাবু চেষ্টা করায় কাজটা সফলতার দিকে গিয়াছিল। এ সময়ে হঠাৎ আবার দেখা করার আদেশ পাইয়া তাহার মনে হইল, এ আর কিছুই নয়, তাহাকে যাইতে না দিবারই আদেশ!

এক নিষ্ফল আক্রোশে তাহার অন্তর সহসা জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহার তুলনা কোথায়? সে আপত্তি-জনক কোন কিছু করিতে যাইতেছে না, ভাল করিয়াই সে বুঝাইয়াছে, সে শুধু পড়িতেই যাইতেছে। তবু এত বাধা কেন? আন্দোলনে সে যোগ দিয়াছিল সত্য; কিন্তু সেইটা এত বড় কোন অপরাধ হইতে পারে না, যাহাতে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতাকে এমনি করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে!

সুশীলবাবু সে সময় বাড়ী ছিলেন না। বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হইলেন না, বলিলেন, কাল একবার কলকাতায় যাও, দেখো কি বলে!

নরেশ বলিল, যাবো, কিন্তু ওদের বলবার আর কি আছে?

সুশীলবাবু কিছু বলিলেন না, একটুখানি হাসিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তোমাকে পাশপোর্ট যদি না দেয়?

নরেশ পূর্ব্ব হইতেই এ-সম্বন্ধে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বলিল, তা হ'লে এ-বারে এম্-এ টা দেবো।

সুশীলবাবু বলিলেন, সেই ভাল। কিন্তু তোমাকে যে পাশপোর্ট দেবে না, তাও ত ঠিক ক'রে বলা যায় না! কাল কলকাতা যাও, দেখা-শুনো ক'রে ব্যাপারটা জানো কি হ'য়েছে! কিশোরীকে একটা চিঠি দিয়ে দেবো, সে তোমাকে কি করতে হবে না করতে হবে, বলে দেবে। একটু থামিয়া বলিলেন, চারুর সঙ্গে দেখা ক'রো, ও-ছেলেটি অনেক জানে-শোনে। বুঝলে?

নরেশ বলিল, আচ্ছা।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সুশীলবাবু এইবার সম্পূর্ণ অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার মাসীমার এখন শরীর কেমন?

সহসা প্রসঙ্গান্তরে আসার দরুণ প্রথমটা কয়েক মুহূর্ত্ত নরেশ তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, তারপর একরূপ লজ্জা-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, এখন ত' ভালই আছেন!

সুশীলবাবু বলিলেন, কাল যাবার আগে, কিম্বা আজই একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এসো। সকালে মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, বলছিলেন, তুমি অনেকদিন ও-দিকে যাও নি।

কথাবার্ত্তা এইখানেই শেষ হইল। সুশীলবাবু উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলন।

নরেশ সেইখানেই অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। আশা-ভঙ্গের সূচনায় তাহার মনে যে দুশ্চিন্তা জমিয়াছিল, পিতার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া তাহা অনেকখানি কাটিয়া গেল।

বিদেশ হইতে উন্নত প্রণালীর কৃষি-বিদ্যা শিখিয়া দেশে আসিয়া এই কাজ করিবার বাসনা সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে চিন্তাকৃত তাহার নিজস্ব একটা ধারণাও ছিল। এই ধারণা এবং কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না ভাবিয়া সে মনে-মনে উদ্বিগ্ন কম হয় নাই। এখন ভাবিল, এক দিক দিয়া বাধা পাইলেও অন্য দিক দিয়া সফল হইবার উপায় আছে। যদি ইহারা আমেরিকা না যাইতে দেয়, তবে অন্য কোথাও যাইবে। যদি তাহাও না হয়, তবে যে কোনমতে হ'ক কার্য্যোদ্ধার করিবেই। যদি সত্যই ইহারা ছাড়-পত্র না দেয়, তবে সে কি করিবে, এ সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করিবার জন্য একবার চারুর সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। কলিকাতা পৌঁছিয়াই সে প্রথমে আফিসে দেখা করিবে, তারপর চারুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সহসা তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সবই যেন ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোনখানে কোন বাধা-বিপত্তি নাই। সে বিদেশে যাইয়া সেখানকার কৃষি-প্রণালী শিখিয়া আসিয়া দেশের জমিতে সেই প্রণালীতে চাষ আরম্ভ করিবে। যেটুকু সফল হইবে চাষীদের সেইটুকুই শিখাইবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

তাহার কল্পনা এমনি উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে চকিতে স্তব্ধ হইয়া গেল। নিতান্ত অনানুষঙ্গিকভাবে অতি অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল, যাইবার আগে একবার মহেশবাবুর বাড়ীতে দেখা করিয়া আসিতে হইবে। ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। দেখা করিতে হইবে,

মহেশবাবুর সঙ্গে নয়, হয় ত করুণাময়ীর সঙ্গেও নয়; যাহার সহিত দেখা করিতে হইবে, সে আশা। কিন্তু যে একান্ত কারণ-হীন সন্দেহে সম্পূর্ণরূপে বিরূপ হইয়া আছে, তাহার সহিত সে কি করিয়া দেখা করিবে? আর তাহাতে লাভই বা কি? কিন্তু ইহাও মনে পড়িল, এ-সত্ত্বেও তাহাকে যাইতে হইবে। মহেশ-বাবু ও তাঁহার স্ত্রী বোধ হয় আজও ইহা টের পান নাই। ইঁহাদের জন্যই তাহাকে যাইতে হইবে। নরেশ আর কিছু ভাবিল না। স্থির করিল, কল্যকার জন্য ফেলিয়া না রাখিয়া এখনই একবার দেখা করিয়া আসা ভাল।

নরেশ যখন মহেশবাবুর বাড়ীতে পৌছিল, তখন অল্পক্ষণমাত্র সন্ধ্যা পার হইয়াছে। বাহির পার হইয়া ভিতরে পা দিতেই দেখিল উঠানের অপর প্রান্ত দিয়া আশা একটা প্রদীপ হাতে করিয়া তুলসীমঞ্চের দিকে চলিয়াছে। সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। এ ধরণের চিত্র সে ছবিতে দেখিয়াছে, বইএও পড়িয়াছে। চিত্রিত সৌন্দর্য্য সে প্রাণ ভরিয়া অনুভবও করিয়াছে। কিন্তু আশার এরূপ মূর্ত্তি সে কোনদিন দেখে নাই। আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা এই সুন্দরী মেয়েটিকে বহু দিন বহু রূপে সে দেখিয়াছে। কিন্তু বৈশাখের এই সন্ধ্যায় অনাড়ম্বরা এই মেয়েটি যেন এক সম্পূর্ণ অন্য জন। মৃদু বাতাস হইতে প্রদীপ-শিখাটিকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া প্রতি পদক্ষেপে একটি লীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলোকের মৃদু রশ্মি মুখে পড়িয়া তাহার যে রূপ খুলিয়াছে, নরেশের মনে হইল, তাহা একান্তই অপরূপ। কোন এক মুহূর্ত্তে মানুষের

মনে সহসা কোন ভাব জাগিলে তাহার মুখে ক্ষণেকের জন্য যে আকাশের ছায়া ফুটিয়া উঠে, নরেশের মনে হইল, আশার দেহ-মনে তেমনি একটি আকাশের বাণী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আশা তুলসীমঞ্চের তলায় প্রদীপটি অতি সন্তর্পণে রাখিয়া গলায় আঁচল চাপিয়া ততোধিক সন্তর্পণে প্রণাম করিল। কোন প্রার্থনা জানাইল কিনা সেই জানে। তারপর উঠিয়া উঠানটা কোণাকোণি পার হইতে গিয়া রকের পাশে কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কে দাঁড়িয়ে ?

নরেশ বলিল, আমি নরেশ। তারপর গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল, মাসীমা কোন্ ঘরে আছেন ?

আশা তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তরও করিল না।

নরেশ হঠাৎ যেন একটু থতমত খাইল, তারপর আর কোন প্রশ্ন না করিয়া যে ঘরে করুণাময়ী থাকিতেন, সেইদিকে চলিয়া গেল।

করুণাময়ী ঘরেই ছিলেন। রোগ হইতে তিনি সারিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বলতার দরুণ সন্ধ্যা হইতেই নিজের ঘরে আশ্রয় লইতেন। নরেশকে দেখিয়া তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন, এসো বাবা এসো, ওখানে [illegible]ন, এইখানে কাছে ব'স।

নরেশ বসিলে তিনি অনেক প্রশ্ন করিলেন। বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা উঠিল। এ-ব্যাপারে করুণাময়ীর তেমন মত ছিল না, কিন্তু মহেশবাবু তাঁহাকে মোটমাট একরূপ বুঝাইয়া

রাখিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, শুধু চাষ করিয়া কেহ বড়লোক হইতে পারে না, ইত্যাদি আলোচনায় রাত্রি হইয়াছিল, নরেশ বলিল, আজ আসি মাসীমা, কলকাতা থেকে এসে আবার দেখা করবো।

করুণাময়ী এ-দিক ও-দিক চাহিয়া কন্যাকে খুঁজিতেছিলেন, এতক্ষণেও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নরেশকে বলিলেন, কাল একটিবার এসো, বাবা। আজ কিচ্ছু খেলে না, কাল সকালে এখানেই খেয়ো। আসবে ত' বাবা?

আসিবার আগ্রহ নরেশের মোটেই ছিল না। কিন্তু মিথ্যা অজুহাত সে দেখাইতে পারিল না। বলিল, আচ্ছা, আসবো।

করুণাময়ীর ঘর হইতে বিদায় লইয়া যখন সে বাহিরে আসিল, তখন তাহার চিত্ত দুর্ভারে পীড়িত। ইহার ভারে তাহার দৃষ্টি পর্য্যন্ত নত হইয়া সুমুখের একটুখানি পথ ছাড়া আর কিছুই তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না। আশা পাশেই অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল, সে মোটেই লক্ষ্য করিল না।

আশা হঠাৎ বলিল, একটু দাঁড়ান।

নরেশ যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল, আশা নয়? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

অপর পক্ষ হইতে উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় নরেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বলিল, কি হ'য়েছে আশা, বল' না?

অন্ধকারে নরেশ আশার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না।

সে ইহার পরও কেন চুপ করিয়া রহিল, তাহাও সে বুঝিল না। শুধু অনিশ্চিত ভাবনা ও বিস্ময়ে অন্ধকারে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আশা এক সময়ে অকস্মাৎ নরেশের অতিশয় সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া যেন মাটির সহিত মিশিয়া গেল, কোনমতে বলিল, আমায় ক্ষমা করো।

বিস্মিত নরেশের কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল, কেন, কি হ'য়েছে?

আশা সঙ্কোচে লজ্জায় হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আমি ভুল বুঝেছিলুম।

নরেশ চুপ করিয়া রহিল।

কি বলিবে আশা বোধ হয় একবার ভাবিয়া লইল। বলিল, ক'দিন হ'ল বেলাদি'র চিঠি পেয়েছি। আমি যে কি ভুল ভেবেছিলুম, বলবার নয়। একটু থামিয়া বলিল, রোজ তোমার পথ চেয়ে থাকতুম, কিন্তু কোন দিন তুমি আসো নি। আজ এসেছো, যদি ক্ষমা না ক'রে যাও, তবে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়বো। বলিয়া সে বোধ হয় কাঁদিয়াই ফেলিল।

নরেশ একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। এই স্বল্পভাষী মেয়েটির এত উচ্ছ্বাস সে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারি[illegible] না। অনাবিল আনন্দে সহসা তাহার হৃদয়ের দুই কূল প্লাবিত হইয়া গেল। প্রগাঢ় স্বরে কহিল, ক্ষমা করাই আছে, আশা। তুমিও যে আমায় এতখানি ভুল বুঝতে পারো,—এইটেই আমার বড্ড লেগেছিল। যাক্,—তুমি এখুনই ভেতরে যাও, মাসীমা দেখতে পাবেন।

৩৭

গৃহে ফিরিবার পথে নরেশের অন্তর এক অকৃত্রিম আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া রহিল। পথ একটুখানি, শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু নরেশের মনে হইতেছিল, এই পথ যেন আর না ফুরায়! পথ কিন্তু বাড়িল। যে-পথে সোজা বাড়ী যাওয়া যায়, সে পথে না গিয়া নরেশ এ-দিক ও-দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিল। সন্ধ্যার সময় আজ সে আশার যে অপূর্ব্ব রূপটি দেখিয়াছিল, চলিতে চলিতে ইহারই ধ্যানে সে যেন তন্ময় হইয়া গেল। আকাশের জ্যোৎস্নালোকের সহিত এই রূপের কোথায় যেন মিল আছে। জিজ্ঞাসা করিলে কোনটাকেই ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা যায় না, কি যে আছে ঠিক করিয়া নিজেও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু দুইটার মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে, যাহা অন্তরকে সুকোমল আনন্দে সিক্তিত করিয়া তোলে,— যাহাকে সমস্ত দেহ-মন দিয়া অনুভব করিতে হয়।

নরেশ যখন বাড়ী পৌছিল, কোলাহল-হীন ছোট সহরটির পক্ষে তখন মন্দ রাত্রি হয় নাই। পিসী তাহার আহার লইয়া নীচেই বসিয়াছিলেন, বলিলেন, এত রাত্তির হ'ল ?

নরেশ হাসি-মুখে বলিল, মহেশবাবুর বাড়ী গিছলুম।

সে জানিত, এই কথার উপর পিসীমা কিছু বলিবেন না। সত্যই তিনি কিছু বলিলেন না। নরেশের সম্মুখে আহার্য্য সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন, ওদের সব ভাল ?

নরেশ বলিল, হঁ্যা, সব ভাল।

তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আশা পড়তে আর কলকাতা যাবে না ?

নরেশ বলিল, ঠিক জানি না। বোধ হয় আর ও পড়বে না।

পিসী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হঁ্যা, সেই ভাল। আজ বাদে কাল যার বিয়ে সে আবার ধ্যাঙ্ ধ্যাঙ্ ক'রে ইস্কুলে যাবে কি ?

পিসী স্ত্রী-শিক্ষার একটু বিপক্ষে। বিশেষ বড় মেয়ে পড়িতে যায়, এটা তিনি মোটেই চান না। এজন্য বেলার পড়াশুনার ব্যাপারটাও তিনি সুচক্ষে দেখেন নাই।

কথাটা এইখানেই শেষ হইল। পিসী এক সময়ে বলিলেন, ওরে, বলতে ভুলে গেছি, তোর একটা চিঠি এসেছে।

নরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, কই ?

নিয়ে আসচি, বলিয়া পিসী উঠিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চিঠি-হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তুইও বেরুলি আর এটাও এলো। ছাখ্ তো, বোধ হয় বেলা লিখেছে।

নরেশ দেখিল সত্যই তাই, বেলাই লিখিয়াছে। আহার শেষ হইলে পড়িবে বলিয়া চিঠিটা পাশে রাখিয়া দিল। তাহার চিত্ত এই বোনটির প্রতি স্নেহে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। মনে পড়িল, তাহার আনন্দ ও মঙ্গল কামনায় এই মেয়েটি সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে। তাহার অন্যকার আনন্দের পথ সে-ই কবে হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। এ-পথে এতটুকু কুটা পড়িলে সে-ই সর্ব্বাগ্রে তুলিয়া ফেলিতে আসে।

ঠিক এই ভাব লইয়াই আহারান্তে সে চিঠিটা পড়িতে আরম্ভ করিল। বেলা বেশী লেখে নাই। কিন্তু এইটুকু পড়িতেই তাহার সর্ব্ব-দেহ ব্যাপিয়া বার বার একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। চিঠি পড়া যখন শেষ করিল, তখন তাহার যে অবস্থা, তাহাকে ঠিক উত্তেজিত অবস্থা বলা চলে না, কিন্তু তাহার বিপরীত ঠিক বিমূঢ় অবস্থাও বলা যায় না। এ অবস্থায় নরেশ খুব সুনির্দ্দিষ্ট কিছু ভাবিতে না পারিলেও, এলোমেলো অনেক কথা ভাবিল। তাও বেশীক্ষণ নয়। একটা জামা গায়ে দিয়া নীচে আসিয়া পিসীকে বলিল, আমি একবার ধীরেনের বাড়ী যাচ্ছি, পিসীমা।

পিসী বলিলেন, এত রাত্তিরে?

নরেশ কোনমতে বলিল, বিশেষ দরকার। বলিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল। পিসী একটু বিস্মিত ও ততোধিক ভাবিত হইলেন। নরেশের কণ্ঠস্বর, বেলার চিঠি পড়িয়াই এত রাত্রে ধীরেনের সহিত দেখা করিতে ছোটা, কোনটাই তাঁহার ভাল ঠেকিল না।

নরেশ রাস্তায় পড়িয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল। আজ তাহার স্বভাবের যেন আমূল বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

নরেশ যখন ধীরেনকে ডাকিল তখনও তাহার খাওয়া হয় নাই, খাইতে যাইবে বলিয়া উঠি উঠি করিতেছিল। নরেশের ব্যস্ত ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল, বলিল, কি হ'য়েছে, নরেশ?

নরেশ একটুও ভূমিকা করিল না, বলিল, চন্দ্রার স্বামী মারা গেছে। সে এখন বিধবা!

ধীরেনের যেন একটি গোপন ক্ষত ছিল। তাহার ক্ষতে কে যেন অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ অস্ত্র বসাইয়া দিল। ধীরেন বেদনায় চীৎকার না করিলেও একবার চমকাইয়া উঠিল। নরেশের কথা বোধ হয় সে সহসা বুঝিল না, তবু সে তাহার কথাগুলো আর একবার আবৃত্তি করিয়া সম্ভবতঃ ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিল। তারপর যখন ভাল করিয়া কথা কহিল, তাহা নরেশের তুলনায় অতি শান্ত ও ধীর বলিয়া বোধ হইল। কহিল, চন্দ্রার বিয়ে হ'য়েছিল, আমি জানতুম না তো!

নরেশ তাহা স্মরণ করিয়া কহিল, হ্যাঁ, তোমার না জানবারই কথা। কবে যে বিয়ে হ'য়েছে, আমরাও জানতুম না। তবে আগে একবার শুনেছিলুম বটে। এইমাত্র বেলার চিঠি পেলুম, লিখেছে, যার সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে হ'য়েছিল, তার যক্ষ্মা-রোগ ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে হাসপাতালে মারা গেছে।

ধীরেন বলিল, যক্ষ্মা-রোগীর সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল? হাসপাতালে মারা গেছে?

নরেশ বলিল, হ্যাঁ। যখন মারা যায়, তখন বেলা সেখানে ছিল। চন্দ্রা বিয়ের সময় কাউকে খবর দেয় নি। কিন্তু বিধবা হবার সময়ে বেলাকে খবর দিয়ে গাড়ী পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল। বেলাই সব লিখেছে। তার চিঠি পেয়েই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। সহসা জলে নরেশের দুই চক্ষু আচ্ছাদিত হইয়া গেল। জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, চিঠি পড়বে ?

ধীরেন হাত নাড়িয়া জানাইল, সে পড়িবে না। দু'জনে বাড়ীর বাহিরে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, এখন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমনি করিয়া কিছুক্ষণ কাটিল। নরেশ বোধ হয় কি ভাবিতেছিল। ধীরেন মুখ তুলিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল। আকাশে একখানা চাঁদ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা তারকা ও জ্যোৎস্নালোক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ধীরেন বলিল, আমাকে এই খবরটাই দিতে এসেছিলে, নরেশ ?

নরেশ বলিল, না, ঠিক খবর দিতে আসি নি, কি জন্যে যে এসেছিলুম তাও ঠিক ক'রে বলতে পারি না। চিঠিটা পেয়ে কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে গিছলুম। এমনটা কখনও আশা করি নি, বিশেষ চন্দ্রার ভাগ্যে। আচ্ছা ধীরেন, তোমার সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ের কথা হয়েছিল না ?

ধীরেনের মুখের রক্ত আর একবার সরিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল, বলিল, হ্যাঁ, কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু হ'লো না।

নরেশ একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্কভাবে বলিল, হ'লে তুমি

সুখী হ'তে, ধীরেন। চন্দ্রাকে তুমি ঠিক-মতো বুঝতে পারোনি বোধ হয়।

এত বড় দুঃসংবাদের পরও ধীরেন হাসিল, কহিল, ঠিক মে কেন, কোন-মতেই আমি চন্দ্রাকে চিনতে পারি নি। কো দিনই না।

নরেশ আপনার চিন্তাতেই মগ্ন ছিল, ধীরেনের হাসি সে লক্ষ করিল না, তাহার কথাও বোধ হয় শুনিল না। বলিল, কা আমার কলকাতায় যাবার কথা। কিন্তু কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ন করে ভাবছি আজই বেরিয়ে পড়ি।

ধীরেন বলিল, আজ কখন যাবে?

নরেশ বলিল, রাত্রি দেড়টার গাড়ীতে। তবু একটা দি হাতে পাবো। আমার মনে হচ্ছে, ধীরেন, আজ সে একেবারে নিরাশ্রয়া। তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। একটু পরে কহিল, সেই ঠিক, দেড়টার গাড়ীতেই যাবো। অত রাত্রে তুমি বোধ হয় ষ্টেশনে যেতে পারবে না?

ধীরেন সংক্ষেপে বলিল, না।

আচ্ছা, তবে থাক্। বেশী সময় নেই, আমি চল্লুম, ভাই। বলিয়া নরেশ ধীরেনের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীর পথে ফিরিল।

ধীরেন কিন্তু তখনই বাড়ী ঢুকিল না। সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে নরেশের বিলীয়মান দেহ-গতির দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী ষ্টেশনে মিনিট দু'য়েকের জন্য থামে। এত রাত্রে লোকজন বড় একটা থাকে না। দু'চারজন যাহারা উঠা-নামা

করিবার, তাহারা নিঃশব্দেই উঠা-নামা করে। কিছুমাত্র গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় না।

নরেশ একা আসিয়াছিল। পথে মাথায় দিবার জন্য একটি বালিশ ও একটি চাদর ছাড়া আর কোন মোটও সঙ্গে ছিল না। এই ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি লইয়া সে গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। আজ গাড়ী পৌছিতে সম্ভবতঃ বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই কে একজন নরেশের কামরার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, নরেশ!

নরেশ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, একি, ধীরেন এসেছো?

ধীরেন বলিল, হ্যাঁ, দেখা করতে এলুম। বলিয়া সে কামরার মধ্যে হাতটা বাড়াইয়া দিল।

নরেশ সেই হাতটা একবার চাপিয়া ধরিল, কিন্তু গাড়ীর গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় তখনই তাহা ছাড়িয়া দিল।

ধীরেন গাড়ীর সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল, বিদায়, বন্ধু।

নরেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, বিদায়।

গাড়ী ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার গতির দূরাগত শব্দও নিস্তব্ধ হইল। ষ্টেশনে যে দু-একজন লোক নামিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেছে, যাহারা ঘুমাইতে ছিল, তাহারা আবার নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে। একটা কুলি আসিয়া কিছু সময়ের জন্য যে আলো ক'টা জ্বালা হইয়াছিল, সে-কয়টা নিবাইয়া চলিয়া গেল। ধীরেন একা দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রীষ্মের মধ্যরাত্রে হু হু করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতে লাগিল।

৩৮

কলিকাতায় আসিয়াই নরেশ চন্দ্রার সহিত দেখা করিবার জ
ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার বাসস্থানের সন্ধান করাটা এ
সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বেলা তাহার জানিত ঠিকানা নরেশবে
বলিয়া কহিল, আমি দু'দিন গিয়ে ফিরে এসেছি। আশে-পাশের
কেউ ওদের কথা জানে না।

নরেশ চিন্তিত হইল। বলিল, চন্দ্রা আর কোন খবর দেয় নি
বা আসেও নি?

বেলা বলিল, না। হাসপাতালে ওই কাণ্ড হবার পরদিন
আমি চন্দ্রার বাড়ীতে গেলুম, দেখলুম তালাবন্ধ। তারপর
কয়েকবার লোক পাঠিয়েছি, আর একবার নিজেও গেছি। কি
তালাবন্ধ দেখে ফিরে এসেছি।

নরেশ দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, পরে বলিল, আচ্ছা দেখি
বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রার কথা মনে পড়িলেই বেলার বড় মন খারাপ হয়; সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের হাসপাতালের শোচনীয় ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। সে দৃশ্য তাহার দেহ-মনের সমস্ত উৎসাহ হরণ করিয়া এক নিমেষে তাহার মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সেদিন তাহাকে চন্দ্রা কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, সে-ই জানে। একদিন সে চন্দ্রাকে তাহার দাদার পক্ষ হইয়া কথা শুনাইতে গিয়াছিল। যদি সে সেদিন তাহারই প্রতিশোধ লইতে তাহাকে ডাকিয়া থাকে, তবে সে ভাল প্রতিশোধ লইয়াছে বলিতে হইবে। এ-দৃশ্য তাহার মন হইতে কিছুতেই মুছিতে চায় না! যতই সে ভুলিতে চায়, ততই তাহার মনে পড়িয়া যায়। অন্তিমকালের যাত্রী একটি মুমূর্ষু ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া আছে। হাসপাতালের আব্‌ছায়া আলোয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, লোকটির মুখ আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় ও নিরতিশয় যাতনায় বিকৃত-বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বেলার বুকের রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠে। আর সে পারে না, অস্ফুটে বলিয়া ফেলে, উঃ!

কিন্তু চন্দ্রা যে প্রতিশোধ লইবার জন্যই সেদিন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। অমন অবস্থায় এ-কথা মানুষের মনে উঠে না। কিন্তু অমন অবস্থায় অকারণে ডাকিবার কথাও কেহ মনে করিতে পারে না। কেন যে সেদিন স্বামীর শেষ-মূহূর্ত্তে চন্দ্রা তাহাকে ডাকিয়াছিল, আজও সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু বুঝিবার

চেষ্টা করিতেও সে চায় না। সে ভুলিতে চায়, চন্দ্রাকে নয় তাহার বৈধব্য-ঘটনাকে।

আজ নরেশের সহিত তাহাকে ঠিক এই সকল কথারই আলোচনা করিতে হইয়াছে। নরেশের আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখিয়া তাহাকে এই সব বলিতে গিয়া আর একবার এই দৃশ্যটি উন্মোচন করিতে হইয়াছে। চন্দ্রার স্বামীকে সে কি অবস্থায় হাসপাতালে দেখে, মৃত্যুর পূর্ব্বে কথা কহিবার সে কি প্রাণান্তকর চেষ্টা, তারপর মৃত্যু, কোনটাই বাদ পড়ে নাই। চন্দ্রার সে সময়ের একান্ত স্তব্ধ ভাব, তাহাও বলিতে ভুলে নাই।

গ্রীষ্মের ছুটীর দরুণ কলেজ বন্ধ। আহারাদির পর সে যখন বসিয়া রহিল, তখন ঠিক এই সকল কথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে আসিতে লাগিল। কাকীর চিরকালের অভ্যাস, খাইয়া-দাইয়া একবার না ঘুমাইয়া পারেন না। তাঁহার সহিত গল্প করিয়া যে কিছুকালের জন্য অন্যমনস্ক থাকিবে, সে-উপায়ও নাই। কিছুক্ষণ একা থাকিবার পর সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। যখন ভাবিতেছে, কাকীকে ডাকিয়া তুলিবে, কিম্বা খানিকটা ঘুরিয়া আসিবে এমনি সময়ে নীচে ভারী গলায় কে বলিল, কখন বেরিয়েছেন ?

উত্তরটা স্পষ্ট শোনা গেল না, কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন আসিল, আর কে আছেন ?

এবারের উত্তর শোনা গেল, দিদিমণি আছেন।

বেলা দুর্ দুর্ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে আসিয়া আগন্তুকের নিকট একপ্রকার ছুটিয়া গিয়া বলিল, আসুন, চারুবাবু!

চারুকে লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বেলা বলিতে লাগিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, চারুবাবু, বলবার নয়। একা ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। আপনি এলেন, তবু একটু গল্প ক'রে বাঁচবো।

চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, নরেশ-বাবু ত' নেই শুনলুম। তাঁর আমেরিকা যাওয়া কতদূর?

বেলা বলিল, পাশ-পোর্ট অফিস থেকে দাদাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে। বাইরে যেতে অনুমতি দেবে না বোধ হয়।

চারু তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, ও কিছু নয়, ইংরাজীতে যাকে বলে রেড-টেপিজিম্,—তাই। অনুমতি দেবে। যাক্, ভালই হ'ল। নরেশবাবুর মারফৎ আমার কয়েকটি প্রবাসী বন্ধুর খবরাখবর পাবো। তারা বহুদিন প্রবাসী, কোনদিন আসবে কিনা তাও জানি না। বেলাকে সহসা একটু অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিল, কি ভাবছো, বেলা?

বেলা অন্যমনস্কভাবেই উত্তর করিল, আপনার কথাই ভাবছি, চারুবাবু।

আমার কথা?

বেলা নিজেকে সংশোধন করিয়া কহিল, আপনার মানে আপনাদের—আপনাদের কথাই ভাবছি।

চারু সকৌতুকে কহিল, কি ভাবছো?

বেলা কিন্তু তেমনই চিন্তিত ভাবেই বলিল, না চারুবাবু, আমি মোটেই কৌতুক ক'রে বলছি না। আপনাদের বিষয়ে

আমি অনেক ভেবেছি, ভাবছিও। আপনাদের মতবাদ বা পথবাদ
নিয়ে কোনদিন আপনার সঙ্গে কথা হয় নি, তবু বই পড়ে এবং
নিজের বুদ্ধির দ্বারা যা বুঝেছি, সত্যি চারুবাবু, আমার কেবলই
মনে হয়, এ আপনাদের ভুল-পথ। যা ভুল ব'লে ধারণা হচ্ছে
সে কাজে মন থেকে কি কোন সহানুভূতি আসে, চারুবাবু?

চারু সহসা বলিল, এই কি তোমার মনের কথা, বেলা?

বেলা বলিল, এর চেয়ে স্পষ্ট মনের কথা আমার কাছে আছে
কিনা সন্দেহ।

চারু কি ভাবিল। বলিল, সকলেরই সহানুভূতি আমরা চাই
তা না হ'লেও হয় ত' চলে, কিন্তু আমার পক্ষে তোমার সহানুভূতি
না হ'লে চলবে না, বেলা। এ আমার চাই-ই। বলিয়া সে একটু
থামিল। বেলার মুখ এক অপূর্ব্ব উত্তেজনায় সহসা আরক্তিম
হইয়া উঠিল। কিন্তু চারু তাহা লক্ষ্য করিল না, নিজের কথা
ধরিয়াই কহিল, মতবাদের কথা থাক, আমাদের যা পথ, কেমন
ক'রে জানলে এ পথ ভুল?

বেলা বলিল, তর্কে হয় ত' আমি পরাজিত হবো। কিন্তু
আমার অন্তর দিয়ে সর্ব্বদাই অনুভব করি, আপনারা অতি ভুল
পথে যাচ্ছেন। জোর ক'রে উপকার করার কথা নিয়ে
একদিন আপনি ঠাট্টা করেছিলেন। কিন্তু আপনারা দেশের
উপকার করতে যা জোর করছেন, তার তুলনাই হয় না।

চারু এইবার হাসিল। হাসিয়া কহিল, এ জোর ক'রে উপকার
করা নয়, জোর ক'রে চোখ খুলে দেওয়া মাত্র।

বেলা বলিল, না চারুবাবু, একটা হুমকি দিয়ে দেশের লোকের চমক ভাঙ্গিয়ে দেওয়া মাত্র। চমকে উঠে তারা ছুটোছুটি ক'রে আত্মহত্যাই করবে, দেশের কোন উপকার করতে পারবে না। চমক লাগানো আর ঘুম ভাঙ্গানো এক জিনিষ নয়।

চারু ক্ষণকাল এই মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, দেখ বেলা, মতবাদ বাদ দিয়ে শুধু পথবাদ নিয়ে আলোচনা করা চলে না। কিন্তু মতবাদের আলোচনা একদিনে শেষ হবার নয়। আমার মতবাদের মূলসূত্রটা বলি। আমি মানুষ হবার অধিকার চাই। জগতের আর পাঁচজনের মত মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাকতে চাই। একমাত্র সেই কারণেই আমি স্বাধিকার চাই। অনেক গ্রাম এবং মজুরদের বাসস্থান ঘুরে আমি দেখেছি। তুমি ধারণা করতে পারবে না, এরা কত বড় অ-মানুষ। এদের কিছু নেই। বল ত' বেলা, এদের কি ক'রে বোঝাবে, এ তোমাদের প্রকৃত অবস্থা নয়, তোমাদের মনুষ্যত্বের দাবী করতে হবে?

বেলা চারুর প্রতি কথাটি মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। কহিল, এদের এই জিনিষটি বোঝানই হচ্ছে দেশের প্রকৃত কাজ। আপনারা তার কি করেছেন? কি ক'রে এদের প্রাণে সাড়া আনিবেন? একাজ করতে বহু সময় এবং বহু ত্যাগের প্রয়োজন। কিন্তু আপনারা অসহিষ্ণু হ'য়ে সংক্ষেপে কাজ সারতে চান। তাই নয় কি?

এত বড় ভয়ঙ্কর অভিযোগেও চারুর মুখ দিয়া কোন কথা

বাহির হইল না। মাটীর দিকে চাহিয়া কত কি যেন সে ভাবি
লাগিল।

বেলা কিন্তু থামিল না। উৎসাহিত হইয়া পুনরায় কহি
লাগিল, আপনাদের ত্যাগ করার ক্ষমতা যদি থাকে, মি
উন্মাদনায় তা নষ্ট করছেন কেন? এ-ক্ষমতা নিয়ে তৈরী কর
না কেন? শুধু ভাঙ্গবার এত আগ্রহ কেন? ভাঙ্গতে ত যে
পারে। তাতে কি পৌরুষ আছে, চারুবাবু? আপনারা
করছেন, লোকের মনে তা আতঙ্ক আনে। শিক্ষিত লোক
হয় ত এতে চমৎকৃত হবে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ এতে ভ
হবে। ভয় দেখিয়ে মানুষ করা যায় না, আরও ভয়ঙ্কর রক
অমানুষ ক'রে তোলা হয়।

বেলার একান্ত বিশ্বাসের সম্মুখে চারু মনে-মনে অ
অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। দৃঢ়মূল প্রস্তরকে খুব জে
নাড়াইলে, মৃত্তিকা-নিম্নেই যেমন প্রথম তাহার আকর্ষণ অনুভূত
চারুর মনের ভিতরটা তেমনি বার-বার কাঁপিয়া উঠিতে লাগি
কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না। সম্মুখে যে খেই পা
তাহাই ধরিয়া সে কহিল, চোখের সুমুখে দৈনন্দিন যা অ
সংঘটিত হচ্ছে, তাই মানুষকে বিদ্রোহী ক'রে তোলে, বেলা,
জন্যে চেষ্টা করতে হয় না, সাধনাও করতে হয় না। এই অন
রোধ করতেই হয় ত' অন্য অন্যায়ের প্রয়োজন হয়।

বেলা তৎক্ষণাৎ কহিল, কিন্তু অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিব
হয় না, চারুবাবু। অন্যায় বেড়েই চলে।

চারু বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই কোন কথা কহিল না, কিন্তু নীরবে থাকিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। বেলাও চুপ করিয়া রহিল এবং একান্ত মনোযোগের সহিত চারুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর বেলা এক সময়ে বলিল, আমার একটা কথা রাখবেন, চারুবাবু?

চারু বলিল, কি কথা?

বেলা কথাটা না ভাঙ্গিয়া কহিল, আমার একটা অনুরোধ বা একটা প্রার্থনা ব'লেই এটাকে মনে করবেন।

চারু পুনরায় পরিহাসমুখর হইয়া উঠিল। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কথা থেকে অনুরোধ, অনুরোধ থেকে প্রার্থনা,—কি জিনিষটা বল' ত?

বেলাও হাসিল, কিন্তু যেন অতি ম্লান হাসি। কহিল, যদি কোন উপায়ে কোনদিন আপনাকে বোঝাতে পারি, আপনি ভুল-পথে যাচ্ছেন, তবে এ-পথ আপনি ছেড়ে দেবেন?

সামান্য কথা এবং যুক্তিও আছে। কিন্তু এই সামান্য কথাটি বেলা যেন সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া নিবেদন করিল। ইহাকে হাস্য-পরিহাসে চাপা দিবার কোন উপায় নাই। চারু তাহা পারিলও না। অন্য একদিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে সে বলিল, এখনি তোমায় উত্তর দিতে পারছি না, বেলা। এই পথে চলা যেন আমার সংস্কারবদ্ধ হ'য়ে গেছে। তাই আজই উত্তর দিতে বেদনা

লাগে। নিজেকে একটুকু ভাল ক'রে দেখে নিই, তারপর তোম
প্রশ্ন বল, প্রার্থনা বল, তার উত্তর দেবো।

বেলা চট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, আপ
বসুন, চারুবাবু, আমি এখুনি আসছি।

উপরে বারান্দার ধারে দাঁড়াইলে নীচেকার উঠানটা স
দেখা যায়। সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিল, চারুবাবু, শীগ্‌গি
দেখবেন আসুন।

এ বাড়ীর এক পুরাতন ভৃত্য পূর্ব্বতন পুরুষ হইতে কাজ করি
আসিতেছে। এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, কাজ-কর্ম্ম কিছুই করি
পারে না, তথাপি সে রহিয়া গিয়াছে। কথা-বার্ত্তায় খুব সর
প্রায়ই হাসি-তামাসা করিয়া থাকে। সে উঠানের মাঝখানে চার
ফুলের টব বসাইয়া তাহার চারিপাশে খুব মোটা নারিকেলে
দড়ি জড়াইয়াছে এবং নিজে তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া অভিনয় সু
করিয়াছে। ঝী-চাকরেরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল।

উপরে চাহিয়া বেলা ও চারুকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া
বলিল, খোকাবাবুর বিয়ে এমনি ক'রেই হবে গো, এমনি ক'রে
হবে। এইখানে খোকা বসবে, ওই সুমুখে ক'নে বসবে, ও-পা
ভট্‌চায্‌ মন্তর পড়বে, আর পেছন থেকে শালীরা এই এমনি ক'
কাণ মলবে।

তাহার কথা কওয়া এবং হাত নাড়ার ভঙ্গীতে বেলা হাসি
লুটিয়া পড়িল। হাসি থামিলে চারুর দিকে চাহিয়া বলিল, এমনি
হবে নাকি, চারুবাবু?

চারু বলিল, কি ক'রে হবে? নরেশবাবুর শালী ত' নেই! আশার কোন বোন আছে নাকি?

বেলা উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল। দেখিল, নরেশ কখন উপরে উঠিয়া শুষ্ক ম্লান মুখে তাহাদের দিকেই আসিতেছে। বেলার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চারুও মুখ ফিরাইয়া নরেশকে দেখিয়া বলিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, নরেশবাবু?

নরেশ নিকটে আসিয়া বেলাকে লক্ষ্য করিয়াই কহিল, চন্দ্রাকে পেলুম না, বেলা। অনেক খোঁজ করলুম, কিন্তু কোনই সন্ধান পেলুম না।

৩৯

তাহার কণ্ঠস্বরে বেলা যেন চকিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, ঘরে চলো, দাদা। আসুন চারুবাবু।

ঘরে আসিয়া তিনজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়া রহিল। পরে প্রথম কথা কহিল চারু। বলিল, আপনি চন্দ্রার খোঁজ করতে গিছলেন, নরেশবাবু?

নরেশ মুখ তুলিল না, কোন কথাও কহিল না। শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে ওই কার্য্যেই গিয়াছিল।

চারু পুনরায় প্রশ্ন করিল, চন্দ্রার খোঁজ করছেন কেন?

এবার নরেশ মুখ তুলিল, কিন্তু ঠিক চারুর প্রশ্নের জবাব দিল না, কহিল, চন্দ্রার বিয়ের কথা আপনি জানেন। এই সে-দিন তার স্বামী মারা গেছে। চন্দ্রা এখন বিধবা।

চারু বলিল, হ্যাঁ, সে আমি জানি।

নরেশ ও বেলা উভয়েই একটু বিস্মিত হইল। নরেশ বলিল, এ আপনি জানেন?

চারু সামান্য একটু হাসিয়া কহিল, জানি বেকি! চন্দ্রার স্বামীকেও আমি চিনতুম।

নরেশ কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না, তারপর বলিল, চন্দ্রার স্বামীর সঙ্গে আমার কোনদিন চাক্ষুষ দেখা হয় নি। এমন কি চন্দ্রার বিয়ের সংবাদও আমি জানতুম না। আমি এখন শুধু ভাবছি, চন্দ্রার মত মেয়ের ভাগ্যে এত বড় দুঃখ ছিল, কে জানতো! চন্দ্রার সঙ্গে আমার ক দিনেরই বা পরিচয়! তবু যেন মনে হচ্ছে, ওর এই দারুণ দুর্ভাগ্যের সময়ে আমার একবার যাওয়াটা কর্ত্তব্যবিশেষ। অবহেলা করা চলে না।

চারু কোন কথা কহিল না।

বেলা কিন্তু মনে মনে কেমন অশান্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, চন্দ্রার সম্বন্ধে তাহার দাদার মনোভাবটা কেমন বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। চন্দ্রার দুঃখে ব্যথা সে-ও পাইয়াছে, কিন্তু তাহার দাদার সহানুভূতির তুলনায় সে-ব্যথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাহার দাদা কোন ঘটনা চক্ষে দেখে নাই, শুনিয়াছে মাত্র। তা ছাড়া নরেশ স্বল্পভাষী লোক, কৌতূহল হইলেও চাপিয়া রাখা তাহার স্বভাব। কিন্তু চন্দ্রার সম্পর্কে তাহার কৌতূহলেরও যেন কোন সংযম নাই।

আর একজনের সম্মুখে তাহার দাদার এই কাতর মনোভাবের বহিঃ-প্রকাশ তাহার চক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকিল।

সহসা সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আপনারা বস্থন, আমি চা ক'রে আনি। দাদা, তুমি হাত-মুখ ধোবে না?

নরেশ সত্যই ক্লান্ত হইয়াছিল, বলিল, থাক, এখন আর উঠতে পারছি না।

বেলা চলিয়া গেল।

ষ্টোভে চা'য়ের জল চড়াইয়া বেলা যাহা ভাবিতে লাগিল, তাহাতে চন্দ্রাও রহিল না, নরেশ রহিল না। ষ্টোভের ঘর্ ঘর্ শব্দের মধ্যে মুহূর্ত্তে সে যেন নিজেকে ডুবাইয়া ফেলিল এবং সম্মুখের জলন্ত আঁচের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, অনতিপূর্ব্বে চারুর সহিত তাহার যে কথার আলোচনা হইতেছিল, মনে মনে কেবল সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। এক স্থানে আসিয়া তাহার চিন্তা যেন নিদারুণ লজ্জা ও আনন্দে স্তব্ধ হইয়া গেল। চারু বলিয়াছিল, সাধারণের সহানুভূতি তাহাদের দরকার। তাহা না পাইলেও হয় ত চলিয়া যায়, কিন্তু বেলার সহানুভূতি না পাইলে চারুর চলিতেই পারে না। কথাটার মধ্যে খুব গুরুত্ব কিছু না থাকিতে পারে। কিন্তু যেন মাধুর্য্যের অন্ত নাই। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বেলা এই কথাটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, এবং যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার অন্তর ততই খুসীতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তার মন কিছুকালের জন্য শুধু এই প্রশ্নেই বিদ্ধ হইয়া রহিল, এত নরনারীকে বাদ দিয়া শুধু তাহারই সহানুভূতিকে চারু পাথেয় বলিয়া গ্রহণ করিল কেন? কিন্তু উত্তর দিবার সুগোপন বাসনাকে সে সুগোপন

করিয়াই রাখিল, কোনমতেই বাহিরের আলোয় আসিতে দিল না।

তাহার মন পুনরায় যখন নির্দ্দিষ্ট পথে ফিরিয়া আসিল, তখন সে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াই কহিতে লাগিল, চারুকে যেমন করিয়া পারে সে দেখাইবে, যে পথে সে চলিয়াছে, তাহা একান্তই ভুল পথ। সত্যের পথ এ কখনই নয়।

বেলার মন ভয়ে, আশায়, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং ইহাদের চেয়ে ঢের বেশী যেন গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। ভাবিল, চারুকে এ ভয়ঙ্কর পথ হইতে সে-ই ফিরাইবে। যতদিনই সে এ পথে থাকুক, এ-পথকে সে যতই প্রাণ দিয়া ভালবাসুক, তবু সে তাহাকে এ-পথ হইতে ফিরাইবে। সে বুঝাইবে, তাহার দেশ-প্রীতি, ঐকান্তিকতা, সাহস, শৌর্য্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা, এত জিনিষ ভগবান তাহাকে দিয়াছেন শুধু আগুন জ্বালিয়া সব ভস্ম করিতে নয়, যেখানে ভাঙ্গিয়াছে, যেখানে পুড়িয়াছে, সেখানে সৃষ্টি করিতে। সৃষ্টি করার এই ক্ষমতাকে অবহেলা করা কি সত্যের অপলাপ নয়? বেলার মন বলিল, চারু অবুঝ নয়, সে ঠিক বুঝিবে। সত্যের প্রেরণা চারুর মধ্যে আছে, সত্যের সন্ধান সে পাইবেই।

এক সময়ে তাহার হুঁস হইলে, চায়ের জল বহুকাল ফুটিতে আরম্ভ করিয়া প্রবলবেগে বাষ্প উদ্গীরণ করিতেছে। জলটা নামাইবার পূর্ব্বে বেলা একবার সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে নরেশ ও চারু পূর্ব্ব প্রসঙ্গ ধরিয়াই কথা কহিতেছিল।

বেলা চলিয়া গেলে চারু পুনরায় প্রশ্ন করিল, চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করা কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন, নরেশবাবু?

নরেশ বলিল, প্রয়োজন কিছুই নয়। তবু অমন দুর্ঘটনা শুনে একবার দেখা করা উচিত নয় কি?

চারু বলিল, উচিৎ বৈকি! এ দুর্ঘটনা এ-দেশের যেন একটা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি অল্প বয়সে বৈধব্যের কথাই বলছি। কিন্তু চন্দ্রার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল ব'লেই বোধ হয় আপনার এতটা লাগছে।

নরেশ বলিল, ঠিক তাই। তবে এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? এ ত শুধু চন্দ্রাদেবী নয়, কত শত মেয়ে এই দুর্ঘটনা মাথা পেতে বইছে।

চারু সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, আমিও তাই ভেবেছি, নরেশবাবু। পরের বেলা একটিবারও ভেবে দেখবো না, আর নিজের লোকের বেলাই দুঃখে ফেটে মরবো, সেটা কি ঠিক? নিজের লোক দশজনের একজন হ'য়ে চোখ ফুটিয়ে দেয়। এই চোখ ফোটার পরও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকা পাপ, নরেশবাবু। এর মূলে আঘাত করতে হবে। ব'সে শোক করলে কিছুই হবে না।

ইহার পর কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া রহিল। তারপর নরেশ বলিল, আপনার সঙ্গে চন্দ্রার স্বামীর পরিচয় ছিল, না?

চারু বলিল, ছিল।

নরেশ বলিল, বিধবা হ'য়ে চন্দ্রা বোধ হয় শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকবে?

চারু বলিল, না, শ্বশুর-বাড়ী ব'লে কোন স্থান চন্দ্রার নেই। বাপের কাছে আছে।

নরেশের সহসা সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন চন্দ্রা নিজেকে সত্যই ভুলিয়া পাগল হইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, এই অপ্রীতিকর বিবাহের সঙ্গে সেদিনের ঘটনার নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ ছিল। তাহার মনের মধ্যে বহু চিন্তা সহসা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে কহিল, বা[illegible]জনবাবুর অর্থাৎ চন্দ্রার বাবার ঠিকানা আমি সংগ্রহ করেছিলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, বাইরে থেকে প্রকাণ্ড তালা বন্ধ। তিনি যে কোথায় আছেন, আশে-পাশের কেউ বলতে পারলে না।

চারু বলিল, ওঁরা ত কলকাতায় নেই। পুরী গেছেন।

নরেশ বলিল, চন্দ্রাও গেছে?

চারু বলিল, গেছে বৈকি! ওর জন্যেই ত পুরী যাওয়া।

নরেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, চন্দ্রার এত খবর আপনি কি ক'রে জানলেন?

চারু আর একবার মৃদু হাসিয়া কহিল, চন্দ্রার সঙ্গে যে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে। কিন্তু নরেশ তাহা পরিহাস ভাবে গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া পুনরায় কহিল, বিশ্বাস করুন, নরেশবাবু, চন্দ্রা সত্যই আমার আত্মীয়া হয়। আর আমি তাকে

বিশেষ ভালবাসি। এমনটি আর দেখি নি ব'লেই এত ভালবাসি। নইলে আমি চন্দ্রার এত খবর রাখতে যাবো কেন?

নরেশ চারুর দিকে চাহিয়া সহসা এক নূতন আলোক দেখিতে পাইল। সে আলোকে চন্দ্রা নিবিয়া গেল, উদ্ভাসিত হইল অন্য একজন। সে কহিল, আপনি চন্দ্রার আত্মীয় জেনে আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হচ্ছি।

চারু বলিল, হবারই কথা। এ ত' আর আপনি জানতেন না। আমি কোনদিনই আপনাকে বলি নি।

নরেশ বলিল, না, বলেন নি। চন্দ্রাও কোনদিন বলে নি। সে যাক্। চারুবাবু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

চারু বলিল, কি কথা?

নরেশ বলিল, আজ আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করছি। এটা অকারণ কৌতূহল মনে ক'রে কোন অপরাধ নেবেন না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চারু ক্ষণকাল ভাবিল, কহিল, অপরাধ কিছু নিই নি, নরেশবাবু, আর একে অকারণ ব'লেও ভাবছি না। কিন্তু আজ পরিচয়ের কথা থাক, আর একদিন বলবো। অনেকক্ষণ এসেছি, আজ উঠি।

বেলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, উঠ্‌বেন কি রকম? আমি চা ক'রে আনছি, মনে নেই বুঝি?

চারু বেলার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিল, সত্যিই মনে নেই।

বেলা দুইজনকে চা দিয়া কহিল, মনে থাকবে কি ক'রে? নরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, চারুবাবুর পরিচয়ে তোমার কি দরকার, দাদা?

নরেশ ও চারু উভয়েই বুঝিল, বেলা পরিচয় সংক্রান্ত কথাটা শুনিয়াছে। প্রথমে উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। পরে চারু বলিল, তুমি বুঝি আমাদের সব কথা শুন্‌ছিলে?

বেলা হাসি চাপিয়া বলিল, আমি ইচ্ছে ক'রে শুনি নি, আপনাদের কথা আমার কাণে এলো।

বেলার আজ উৎসাহ ও আনন্দের যেন অন্ত নাই। পুনরায় সে কহিল, পরিচয় আপনি দাদাকে দিন, আমার তা শুনতে একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু আমার প্রশ্নের কথা ভুলবেন না, চারুবাবু, এর পরে যেদিন আসবেন, উত্তর নিয়ে আসবেন।

নরেশ ভগিনীর প্রতি চাহিয়া কহিল, কি প্রশ্ন?

বেলা চারুর প্রতি চাহিয়া অপ্রচ্ছন্ন দুষ্টকণ্ঠে কহিল, বলি, চারুবাবু?

চারু চা পান করিতে করিতে মৃদু হাসিয়া বলিল, বলো।

বেলা কিন্তু বলিল না। দাদার প্রতি চাহিয়া কহিল, না দাদা, আজ বলবো না। এ অতি ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। এতে চারুবাবুর সমস্ত জীবনের ধারা বদলে যেতে পারে। কিম্বা—একটু থামিয়া বলিল, কিম্বা নাও যেতে পারে। তাই নয় চারুবাবু?

চারুর চা পান শেষ হইয়াছিল, কাপটা রাখিয়া বলিল, তাই, হতেও পারে, না'ও হতে পারে।

নরেশ কোন কথা কহিল না, কিন্তু কি ভাবিতে লাগিল।

চারু উঠিয়া বলিল, অনেকটা সময় কাটালুম, এবার গুড্-বাই। নরেশবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কাজ ছিল, কিন্তু সে আপনি পাশ-পোর্ট না পেলে তা হবার নয়। পাশ-পোর্ট বোধ হয় হপ্তা'খানেকের ভেতরই পাবেন, তখন আবার আসবো। বেলা, তোমার প্রশ্নের উত্তর সেইদিনই দেবো।

চারু চলিয়া গেল।

বেলা'র একটা আমোদ ছিল, চারু যখন সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামে তখন তাহার পদশব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কতদিন সে শুনিয়াছে, কিন্তু এ-পদক্ষেপের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। রোজই চারুর পা সিঁড়ির উপর যেন ঠিক এক রকমেই, একই জোরে পড়ে। এ লইয়া আশার সহিত সে কত হাসিই হাসিয়াছে!

কিন্তু আজ সে অন্তরের আনন্দে এদিকে কাণ দিল না। শুনিলে বুঝিত, অদ্যকার প্রতি পদচালনায় কত ত্রুটী, কত ভুল, কত বিচ্যুতি রহিয়াছে। মনে হইত, এ যেন সে লোকই নয়, অন্য কোন ব্যক্তি স্খলিতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়াছে।

৪০

ইহার পরে চারু যেদিন নরেশের সহিত দেখা করিতে গেল, ইতিমধ্যে দিন পনের কাটিয়া গিয়াছে। নরেশ বিদেশে যাইবার ছাড়-পত্র পাইয়াছে। আশার সহিত তাহার বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেছে।

পুরাতন ভৃত্যটীর সহিত চারুর প্রথম দেখা হইল। চারু বলিল, নরেশবাবু আছেন, গোপেন?

গোপেন নিকটে আসিয়া চারুকে চিনিয়া কহিল, এতদিন কোথা' ছিলেন বাবু?

চারু বলিল, এতদিন ত' এখানে ছিলুম না, গোপেন, পুরীতে গিয়েছিলুম। খোকাবাবু আছেন?

গোপেন বলিল, না, খোকাবাবু ত' বাপের কাছে গেছে। তার বিয়ের আশীর্বাদ হবে কিনা!

চারু একটু হতাশ হইল, বলিল, [illegible]?

গোপেন বলিল, সোমবার। আজ শুক্কুরবার, আজই আশীর্ব্বাদ, দু'দিন পরে আসবে। তা আপনি বসবেন চলুন না, দিদিমণি ত' যায় নি, একটু পরেই আসবে।

চারু বলিল, আশীর্ব্বাদে বেলা যায় নি?

গোপেন বলিল, না, তার নাকি ইস্কুল কামাই হবে। মেয়েমানুষের আবার ইস্কুল! আপনি ভেতরে বসবেন চলুন না, বাবু, দিদিমণি রোজ সন্ধ্যের পরেই ফেরে। এইবারে আসবার সময় হ'ল।

চারু একটু ভাবিয়া বলিল, না বসবো না। দিদিমণি এলে ব'লো,—কে? আগন্তুককে সন্ধ্যার আব্ছায়ায় ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া কহিল, ধীরেনবাবু যে! ভাল আছেন?

ধীরেন কিন্তু চারুকে চিনিতে পারিল না। চারু বলিল, না চেনবারই কথা। একদিন অল্পক্ষণের জন্যে মাত্র দেখা, তাও বোধ হয় আপনি আমাকে লক্ষ্য করেন নি। যেদিন আপনি আর চন্দ্রা আসেন, সেদিন ঘরের ভেতর আমিও ছিলুম।

এইবার ধীরেন চিনিল, নমস্কার করিয়া কহিল, নরেশের কাছে গিছলেন বুঝি?

চারু বলিল, না যাচ্ছিলুম। নরেশবাবু ত' এখানে নেই, আপনাদেরই দেশে গেছেন। বেলা এদেশে আছে শুনলুম, কিন্তু সেও বাড়ী নেই। কেন, আপনি এ সব জানেন না?

ধীরেন বলিল, না, আমি ত' দেশে ছিলুম না। পশ্চিমে

চেঞ্জে গিছলুম। মাত্র কাল কলকাতায় এসেছি। পরে গোপনের দিকে ফিরিয়া বলিল, নরেশ কবে আসবে?

চারু উত্তর দিল, বলিল, সোমবার। দেরী হওয়াও অসম্ভব নয়, কি বলো, গোপেন? আপনি কি ভেতরে যাবেন, না অন্য সময়ে আসবেন?

ধীরেন বলিল, অন্য সময়ে আসবো। একেবারে নরেশ এলে আসবো।

চারু বলিল, চলুন তবে এক সঙ্গে যাই।

গোপেন দাঁড়াইয়াই ছিল, চারুকে স্মরণ করাইয়া দিল, বলিল, আপনি দিদিমণিকে কি বলতে বলছিলেন?

চারু বলিল, থাক, তোমায় কিছু বলতে হবে না। ধীরেন-বাবুই বলবেন।

রাস্তায় চলিতে চলিতে ধীরেন বলিল, নরেশ এখন দেশে গেল কেন, জানেন চারুবাবু?

চারু বলিল, বিয়ের আশীর্ব্বাদ হবে, তাই গেছেন।

ধীরেন সকৌতুকে ও সানন্দে বলিয়া উঠিল, তাই নাকি? বিয়ে কবে?

চারু বলিল, তা ত' জানি না।

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটিবার পর ধীরেন বলিল, আশাকে ত' আপনি দেখেছেন, চারুবাবু।

চারু বলিল, হাঁ, দেখেছি।

ধীরেন [illegible]ন মনেই বলিল, এই আশাকে নরেশ যে কত

ভালবাসে, তা বলবার নয়। আশাও বোধ হয় কম ভালবাসে না। বিয়ে হ'লে উভয়েই সুখী হবে।

চারু মৃদু হাসিয়া কহিল, সেই প্রার্থনাই করি। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, ধীরেনবাবু, এই সব ক্ষেত্রে ভালবাসার সঙ্গে দুঃখই আসে, সুখী কেউ হয় না।

ধীরেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তার মানে? এই নরেশের সঙ্গে যদি, যদি কেন, নিশ্চয়ই আশার বিয়ে হবে। আপনি কি বলতে চান, এতে তারা অসুখী হ'তে পারে?

চারু বলিল, নরেশবাবুর সঙ্গে আশার সম্বন্ধের কথা কিছু বলতে পারি না। ওঁদের ভালবাসার রূপ আমি কোনদিন চোখে দেখি নি। হয় ত' ওঁরা সুখী হবেন। কিন্তু ধীরেনবাবু, ভালবাসার যে আদর্শটা মনের মধ্যে থাকে, সংসারের পাঁচটা ব্যাপারের মধ্যে তাকে টেনে আনলে, সে-আদর্শ কি তেমনি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে?

ধীরেন যেন নিজের মনের মধ্যে তলাইয়া গেল। বলিল, যাকে আদর্শ রেখে আমার মনে ভালবাসা জন্মালো, অঙ্কুর থেকে এককালে বৃহৎ হ'ল, যদি তাকেই হারাই, তবে আমার ভালবাসারই বা কি সার্থকতা থাকে, চারুবাবু?

চারু কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর হাসিয়া কহিল, গত ক'দিন এই সব বিষয় নিয়ে অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছি। হয় ত' ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপার। সমাজ, তথা দেশের জন্যে এর